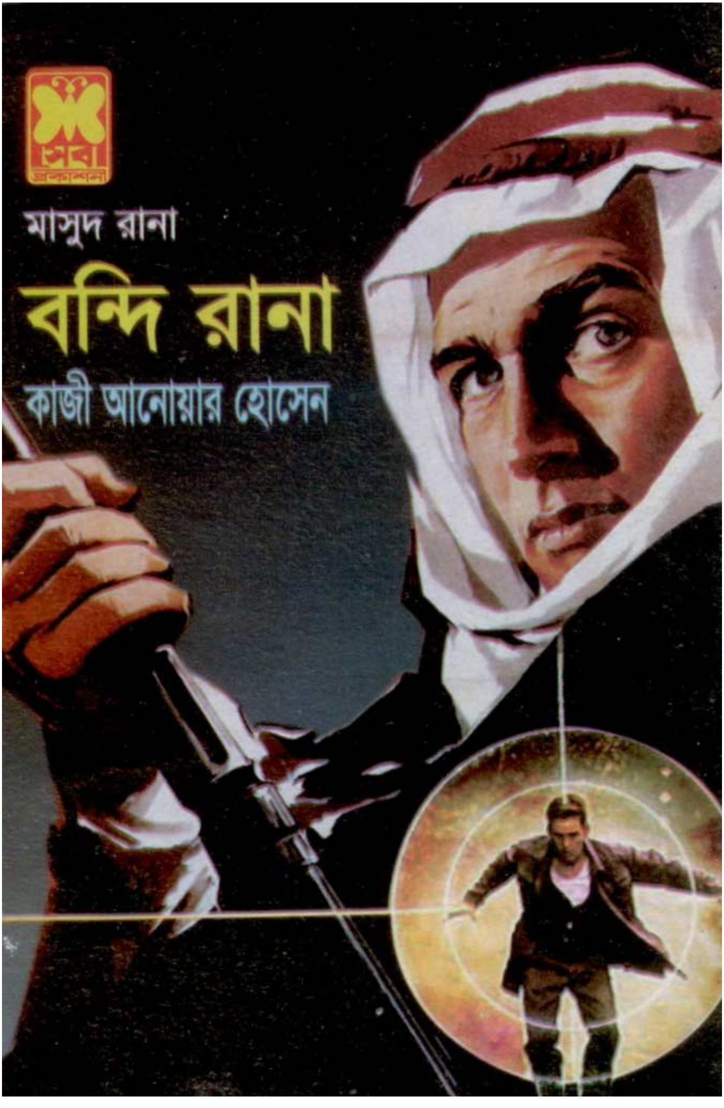

সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
বন্দি রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

বন্দি রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

এখন আর পালাবার পথ নেই।

অকস্মাৎ ফ্লাড ও সার্চলাইট জ্বলে ওঠায় রাতের অন্ধকার রাস্তা আলোর বন্যায় ভেসে গেল, সেই সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল ড্রাইভারদের চোখ। সীমান্তের ওপার থেকে আনা সার বোঝাই ট্রাক বহরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ইজরায়েলি সীমান্তরক্ষী ও অ্যান্টি-ড্রাগ স্কোয়াড-এর সশস্ত্র লোকজন।

অগত্যা এক সময় সামনের ট্রাকের ক্যাব থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলো আবিল আহুদ। ইহুদি সে, জন্মসূত্রে জর্দানী, অথচ বেশভূষায় ঠিক যেন একজন আরব বেদুইন।

চোখে মায়া আছে, চোখের তারায় আছে বুদ্ধির দীপ্তি। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, সুদর্শন চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা, রোদে পুড়ে খানিকটা তামাটে। ভরাট মুখ আধ ইঞ্চি লম্বা কালো দাড়িতে ঢাকা। উন্নত ললাট। সুরমা লাগানোয় চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় সম্মোহিত করে ফেলবে। বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ – কি আটাশ।

পরনে সাদা ও ঢোলা জোব্বা, মাথায় পাগড়ির মত করে একটা কাপড় জড়ানো, দুইপ্রান্ত বুকের দুপাশে ঝুলে আছে;

জোব্বার নীচে বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে কালো সালোয়ার। হাতে সরু একটা সবুজ লাঠি, গলায় পরে আছে পশু ও মাছের খুদে হাড় দিয়ে তৈরি অনেকগুলো মালা। হঠাৎ তাকালে মনে হতে পারে হাতের লাঠিটা বোধহয় সবুজ সাপ, কিন্তু তা সত্যি নয়, ওটা স্রেফ একটা লাঠিই।

কিছু একটা ঠিক মিলছে না। বিশেষ করে তার বেশভূষা যেন অন্য কোনও গল্প বলতে চায়।

জর্দানের রাজধানী সেই আম্মান থেকে আসছে এই পাকা রাস্তা। জর্দানী শহর সুমাইয়া ও আল মাযার হয়ে জর্দান নদী ও যুদ্ধবিরতি-রেখা পার হয়ে ইজরায়েলে ঢুকেছে। এই রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিমে গেলে জেরুজালেম পড়বে। ডানদিকে পড়বে কমকরেও এগারো হাজার বছরের প্রাচীন ফিলিস্তিনি শহর জেরিকো। বামে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে এগোলে ডেড সি আর ইজরায়েলি বন্দর নাহাল কালিয়া।

শুক্রবার বিকেল। মেইন রোডের মোড়ে মোড়ে পুলিশকে টাকা দিয়ে ইজরায়েলি সীমান্তের দিকে ছুটছে সার বোঝাই ট্রাক বহর। এক সময় রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকেছে, কাঁচা পথ ধরে ঘণ্টাখানেক এগিয়েছে শম্বুকগতিতে। এরপর সামনে পড়ল নদী ও ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে আবার পাকা রাস্তা, তবে এটা খুব সরু আর ভাঙাচোরা। এবার রাস্তা ছেড়ে জলাভূমিতে নামল ট্রাকগুলো। সবশেষে যুদ্ধবিরতি-রেখা পার হয়ে জর্দানকে পিছনে ফেলে নিরাপদেই পৌঁছে গেল ইজরায়েলে।

সূর্য ডোবার পর দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। সামনে ধু-ধু

জলাভূমি, নির্জন ও পরিত্যক্ত, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে উঁচু মেঠো পথ।

সবাই জানে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদিদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে, তবে জর্দান-ইজরায়েল সীমান্ত এলাকায় কথাটা একদমই সত্যি নয়। এখানে যেটা ঘটছে সেটাকে চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। যতই অবিশ্বাস্য শোনাক, জর্দানী কিছু মুসলমান তাদের এলাকার ইহুদিদের রীতিমত জামাই আদর করে, কড়া পাহারা দিয়ে রাখে কেউ যাতে তাদের গায়ে টোকাটিও মারতে না পারে। একইভাবে ইজরায়েলি সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলোর কিছু ফিলিস্তিনি মুসলমানও ওখানকার একদল ইহুদির কাছ থেকে জামাই আদর পেয়ে আসছে।

ব্যাপারটা কী?

আসলে এর কারণ দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের পক্ষপাতিত্ব। জর্দানের মাটিতে কোনও ফিলিস্তিনি মুসলমান স্মাগলার ধরা পড়লে যেমন জর্দানী সীমান্তরক্ষীরা দু'চারদিন আটকে রেখে ছেড়ে দেয়; ঠিক তেমনি ইজরায়েলের মাটিতে জর্দানী কোনও ইহুদি স্মাগলার ধরা পড়লে ওদের রক্ষীবাহিনীও ছেড়ে দেয় তাকে।

দীর্ঘদিন এরকম চলে আসছে, ফলে দু'দেশের চোরা-কারবারীরা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতেও ছাড়ছে না।

জর্দানে ইহুদি না থাকারই মত। যে-কজন আছে তাদের প্রায় সবাইকে স্মাগলিঙে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের সময় সীমান্তের ওপার থেকে দরিদ্র কিছু ইহুদিকে ভাড়া করেও আনা হয়, ট্রাক ড্রাইভার ও ইনফর্মার হিসাবে কাজে লাগাবার জন্য। এবার

যেমনটি হয়েছে।

আহুদ পরিবারের কথা ধরা যাক। এই ইহুদি পরিবারের সবাই জন্মসূত্রে জর্দানী। এদেরকে কাজে লাগাচ্ছে ক্রিমিনালদের একটি সিন্ডিকেট।

আহুদ অ্যান্ড ব্রাদার্স নামে একটা ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানির মালিক করে দেওয়া হয়েছে পরিবারটিকে। বহু বছর ধরে চোরাইপথে ইজরায়েলে সার পাচার করছে তারা, আর ঠিক একই ভাবে ইজরায়েল থেকে আনছে সিল্ক, কেমিকেল ও ওষুধ।

দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা টাকার বিনিময়ে বেশিরভাগ সময় দেখেও না দেখার ভান করে। ঊর্ধ্বতন মহলের মৌন সমর্থনও থাকতে পারে, হয়তো তালিকা পাঠিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে কী কী পণ্য আটক করবার দরকার নেই।

তবে মাঝে-মধ্যে ঘেরাও দিয়ে স্মাগলারদের ধরাও হয়। সীমান্তে হয়তো নতুন কোনও কমান্ডার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, কিছু কাজ দেখিয়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করা দরকার। কিংবা খবর আছে বিপজ্জনক কোনও সন্ত্রাসী বর্ডার ক্রস করবে, অথবা ড্রাগের চালান আসবে। তখন সামারি কোর্ট বসে; হাতে-নাতে ধরা পড়া অপরাধীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তৎক্ষণাৎ আমলে এনে বিচার করা হয়, অপরাধের ধরন অনুসারে এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত জেল হয়ে যায় তাদের।

তবে বলাই বাহুল্য যে কখনোই রাঘব-বোয়ালরা ধরা পড়ে না। জর্দানে ধরা পড়ে ফিলিস্তিনি মুসলমান ট্রাক ড্রাইভাররা, ইজরায়েলে ধরা পড়ে জর্দানী ইহুদি ড্রাইভাররা। নেহাতই হতভাগ্য চুনোপুটি তারা। কার পণ্য, কী জিনিস, কে পাঠাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, এ-সবের কিছুই তারা জানে না।

জর্দানের সীমান্তরক্ষীরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে পুরাকালের কোনও কিছু অমূল্য সম্পদ পাচার হচ্ছে কি না, ইজরায়েলিরা দেখে জর্দান থেকে ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র বা গোলাবারুদ আসছে কি না।

আহুদরা পাঁচ ভাই। তারা সবাই অত্যন্ত ধূর্ত ও সাবধানী। সবার ছোট আবিল। ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও এর আগে কখনও ইজরায়েলে ঢোকেনি সে, এবারই প্রথম। তার ভাইরা তাকে অভয় দিয়ে বলেছে, সাতদিনের এই অভিযানে কোনও রকম বিপদের ভয় নেই। জর্দানী সীমান্ত-রক্ষীরা অনেক আগে থেকেই জানে যে আহুদ অ্যান্ড ব্রাদার্স আর্টিফ্যাক্টস কিংবা পুরাকীর্তি পাচার করে না। প্রতিটি পয়েন্টে টাকার বান্ডিলও সময়মত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েলি স্মাগলাররা, হোক সে ফিলিস্তিনি মুসলমান কিংবা ইজরায়েলি ইহুদি, নিজেদের বাড়িতে সমাদৃত মেহমান হিসেবে সযত্নেই রাখবে তাকে, নিজেদের স্বার্থেই তার কোনও রকম বিপদ হতে দেবে না। আর যদি দৈবাৎ কোনও কারণে ইজরায়েলি সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যায়, ওরা খুব বেশি হলে দু'চারদিন আটকে রেখে ছেড়ে দেবে। এটাই নিয়ম, গত পাঁচ-সাত বছরে যত ইহুদি ধরা পড়েছে তাদের প্রায় সবাইকে এভাবে ছেড়ে দিয়েছে ইজরায়েলিরা। ছাড়েনি শুধু একজনকে। ওই বোকাটা জেনেই হোক বা না জেনে, ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছিল। আবিল সে-ধরনের কিছু নিয়ে যাচ্ছে না, কাজেই তার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

চারদিকে নল-খাগড়ার ঝোপ, মাইল তিনেক এগোবার পর নির্দিষ্ট একটা ফাঁকা জায়গায় থামল ট্রাকগুলো। ঘড়ির কাঁটা ধরে

সবকিছু চললে ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে দুজন ইজরায়েলি ইহুদি স্কাউট পৌঁছে যাবে এখানে। প্রথমে টর্চ জ্বেলে সংকেত দেবে তারা। সেটা নির্ভুল হলে এদিক থেকে পাল্টা সংকেত দিয়ে কাছে আসতে বলা হবে তাদেরকে।

তারা এসে রিপোর্ট করবে, নাহাল কালিয়া পর্যন্ত রাস্তাটা আজ রাতে জর্দানী ট্রাক বহরের জন্য নিরাপদ কি না। রিপোর্ট ইতিবাচক হলে ড্রাইভারদের প্রথম কাজ হবে ট্রাকগুলোর নাম্বার প্লেট বদলে ফেলা, আরবীর বদলে ব্যবহার করা হবে হিব্রু। রঙ শুকাবার জন্য সময় দেওয়া হবে ঘণ্টাখানেক, তারপর ইজরায়েলি স্কাউট দুজনকে সামনের ট্রাকের পিছনে তুলে নিয়ে আবার শুরু হবে যাত্রা।

ডেড সি খুব বেশি দূরে নয়, ট্রাক বহর নিয়ে ইজরায়েলি বন্দর সংলগ্ন একটা ওয়্যারহাউসে পৌঁছাবে তারা। ইজরায়েলি স্মাগলিং কোম্পানি তৈয়বিয়া অ্যান্ড ব্রাদার্স-এর ওয়্যারহাউস ওটা, মালিকরা ফিলিস্তিনি, প্রধান অংশীদারের নাম তৈয়ব মাহমুদজান।

ওয়্যারহাউসের ভিতরই জর্দানী ড্রাইভারদের থাকা-খাওয়া ও চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হবে। পৌঁছাবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রাক থেকে সারের বস্তা নামিয়ে কিছু তোলা হবে ওয়্যারহাউসে, কিছু মালবাহী জাহাজে। পরদিন দুপুরে খালি ট্রাকে তোলা হবে সিল্ক, কেমিকেল ও ওষুধ। সন্ধ্যায় স্কাউটরা সবুজসংকেত দিলে রাত আটটার মধ্যে ফিরতি পথ ধরবে তারা।

এই আয়োজনের মেয়াদ একমাস। পরের মাসে ইজরায়েলি মুসলমান ড্রাইভাররা পণ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করবে।

প্রতি মাসে পাঁচ থেকে সাতটা ট্রিপ হয়। মাসের শেষদিকে একবারই লেখাপড়া জানা কর্তা গোছের কাউকে পাঠানো হয় ট্রাক

বহরের সঙ্গে, পণ্যের বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করে দেনা-পাওনার হিসাব হালনাগাদ করার জন্য। এবার পাঠানো হচ্ছে নতুন একজনকে।

নতুন মেহমান জর্দানী ইহুদি আবিল আহুদকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ফিলিস্তিনি তৈয়ব মাহমুদজান।

কিন্তু বিধি বাম, তা হওয়ার নয়!

সব ঠিকমতই চলছিল, ভাড়া করা স্কাউটরা সংকেত দিয়ে ট্রাক বহরের কাছে পৌঁছাল। মেইন রোড বিপদ-মুক্ত দেখে এসেছে তারা। এক ঘণ্টা পর তাদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ট্রাক বহর। ওদের কারও জানার কথা নয়, এই এক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

জলাভূমি পিছনে ফেলে এসে মেইন রোডে উঠল কনভয়। বন্দর নাহাল কালিয়ার দিকে যেতে হলে খানিক পর দক্ষিণে বাঁক নিতে হবে।

ওই বাঁকের সামনেই দেখা গেল রোড ব্লকটা। যখন দেখা গেল তখন আর পিছু হটার পথ থাকল না, কারণ ততক্ষণে ট্রাক বহরের পিছনে মেশিন গান ফিট করা সামরিক আর্মার্ড কার চলে এসেছে। রোড ব্লকের চারপাশে পজিশন নিয়ে থাকা সশস্ত্র লোকগুলোর ইউনিফর্মই বলে দিল সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে অ্যান্টি-ড্রাগ স্কোয়াড-এর সদস্যরাও রয়েছে।

অ্যান্টি-ড্রাগ স্কোয়াড-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন কর্নেল। ওদের কাছে খবর আছে, এ-পথে আজ হেরোইন ও আফিম আসবে। তবে জানা যায়নি স্মাগলারদের কোন্ দল ঠিক কখন নিয়ে আসবে ওগুলো। ট্রাক বহর থামানো হলো। দুই বাহিনীর

লোকজন ট্রাকগুলোর নাম্বার প্লেট পরীক্ষা করে রায় দিল মাত্র দু'তিন ঘণ্টা আগে এগুলো লেখা হয়েছে। কাগজ-পত্রে চোখ বুলিয়ে বলা হলো, সব জাল। এরপর ড্রাগ স্কোয়াডের কর্নেল জানতে চাইলেন, 'কনভয় ও সার-এর মালিক কে?'

ড্রাইভাররা পরস্পরের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। মালিক বা তার প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে ইজরায়েলে ঢুকেছে ঠিকই, কিন্তু তার সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা। শুধু কার মুখে যেন নামটা শুনেছে।

কেউ একজন জবাব দিল, 'আবিল আহুদ।'

হুকুম হলো, 'ডাকো তাকে, সামনে আসতে বলো।'

ডাকতে হলো না, ওদের কথা শুনতে পেয়ে নিজেই সামনের ট্রাকের ক্যাব থেকে নেমে এসে অফিসারের সামনে শান্ত ও নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল আবিল আহুদ।

'তুমি আবিল আহুদ? এই ট্রাক বহরের মালিক?' প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল আবিল। তাকে বলা হয়েছে যে- কোনও জর্দানী ইহুদিকে ধরতে পারলেও ছেড়ে দেয় ইজরায়েলি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তবে এখানে শুধু ওরা নয়, ওদের সঙ্গে ড্রাগ স্কোয়াডও রয়েছে। তাতে কী, ওর সঙ্গে তো ও-সব কিছু নেই। 'হ্যাঁ,' জবাব দিল সে।

'ব্লাডি স্মাগলার! এত সাহস তোমার, জর্দান থেকে হেরোইন, আফিম, গাঁজা, কোকেন নিয়ে ঢুকেছ ইজরায়েলে?' ঘৃণার সঙ্গে জানতে চাইলেন কর্নেল।

প্রথমবার এরকম বিপদে পড়লেও, এতটুকু বিচলিত হলো না আবিল। শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল সে, 'আপনি ভুল করছেন,

অফিসার। আমি একজন সৎ ব্যবসায়ী, ক্ষতিকর পণ্য বেচাকেনা করি না।'

'সেটা এখনই জানা যাবে,' বললেন কর্নেল। 'এই, তোমরা সার্চ শুরু করো।'

প্রচুর সময় নিয়ে প্রতিটি ট্রাক ও সবার বডি সার্চ করা হলো। তবে কোনও ড্রাগ পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে অ্যান্টি-ড্রাগ স্কোয়াডের কর্নেল ঘাড় ফিরিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মেজরের দিকে তাকালেন। 'এটা আমাদের কেস নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচার করে এই ঝামেলা এখান থেকে বিদায় করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেওয়া মাত্র ট্রাক ও স্মাগলারদের এখান থেকে সরিয়ে ফেলবেন আপনি। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবরটা পেয়েছি আমরা, ড্রাগ পার্টি এই পথ ধরেই আসবে। আলো নিভিয়ে দিয়ে এখানে আমরা সারারাত অপেক্ষা করব।'

ইজরায়েলি মেজরের দৃষ্টি অনুসরণ করে এতক্ষণে দেখতে পেল আবিল রাস্তা থেকে খানিক দূরে, গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ের আংশিক আড়ালে একটা টেবিল ও তিনটে চেয়ার ফেলা হয়েছে। একটা চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে কালো আলখেল্লা পরা একজন সরকারী উকিল। টেবিলের পিছনের চেয়ারে বসা মাঝবয়েসী ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ম্যাজিস্ট্রেট হবেন। রাইফেলধারী কয়েকজন বডিগার্ড, একজন আরদালি, একজন ক্লার্ককেও দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, সবাই তারা সামারি ট্রায়াল-এর সদস্য।

মনে মনে প্রমাদ গুণল আবিল। সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে? বছরের পর বছর ইজরায়েলি জেলে পচতে হবে তাকে?

তারপর আবিল ভাবল, এরকম মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে

জানলে নিজের অন্য পরিচয়টা দিতে পারত, স্বীকারই করত না এই ট্রাক বহরের মালিক সে।

কর্নেলের কথা মন দিয়ে শুনল মেজর, তারপর গম্ভীরমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আদালতের কাজ। লেখালেখি পরে হবে, মৌখিক অভিযোগ শোনানো হলো আবিলকে। তারপর জানতে চাওয়া হলো, আত্মপক্ষ-সমর্থনে তার কিছু বলবার আছে কি না।

রাস্তা পার হয়ে কর্নেল বা মেজর কেউই আদালতে আসেনি। কাজেই সুযোগটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল আবিল। ম্যাজিস্ট্রেটকে সে জানাল, সে আবিল আহুদ নয়। তার নাম আল শাহরিয়ার, একজন বেদুইন। ইজরায়েলে কাজ করার ওয়ার্ক পারমিট আছে তার কাছে।

তার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলো না। ওঅর্ক পারমিটের উপর চোখ বুলিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করলেন, 'এতে কোনও ফটো নেই। দেখা যাচ্ছে এটার মেয়াদও কয়েক বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া, স্মাগল করা মালসহ ধরা পড়েছ তুমি, পরিচয় বদলালে সাজা কমবেশি হবে না। তোমাকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো।'

আবিলের ট্রাক বহর এখন আর বামে মোড় নিয়ে নাহাল কালিয়ার দিকে যাচ্ছে না। আবিলকে অ্যারেস্ট করে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে একজন ক্যাপটেনের জিপে। ক্যাপটেন ও ড্রাইভার ছাড়াও জিপটায় তিনজন সিপাই রয়েছে, তাদের হাতের অস্ত্র আবিলের দিকে ধরা।

ট্রাকগুলো জর্দানী ড্রাইভাররাই চালাচ্ছে, তবে প্রতিটি ট্রাকের ক্যাবে একজন করে সশস্ত্র ইজরায়েলি বসে আছে। সংক্ষিপ্ত বিচারে তাদেরও জেল হয়েছে, তবে মাত্র এক বছর করে।

সীমান্তরক্ষীদের প্রহরায় মাইল দশেক সোজা এগোবার পর বাঁক নিয়ে উত্তরমুখো হলো কনভয়, যাচ্ছে আরও সাত মাইল দূরের প্রাচীন শহর জেরিকো-য়।

শহরে পৌঁছে আবিলকে সরাসরি জেরিকো-র সদর থানায় নিয়ে এল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাপটেন। থানার দারোগাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হলো – সার সহ ট্রাক বহর পাঠিয়ে দিতে হবে কৃষি দফতরের গুদামে, ড্রাইভাররা জেল খাটবে জেরিকোর জেলখানায়, তবে আবিল আহ্‌দকে পাঠাতে হবে খান আল আসকার কারাগারে।

ওখান থেকে কেউ নাকি আজ পর্যন্ত পালাতে পারেনি।

দুই

পরদিন শনিবার।

খান আল আসকার কারাগার নিঃসঙ্গ নয়, আশপাশে কয়েকটা কয়লাখনি আছে। জায়গাটা অসম্ভব দুর্গম। কারাগার ও খনির চারপাশে দুর্গন্ধময় পচা জলাভূমি, পরিত্যক্ত বিল, নল খাগড়ার ঘন জঙ্গল, খানিক পরপর মৃত্যুফাঁদের মত আগাছায় ঢাকা গভীর কুয়া,

বুনো শুয়োর, বিষাক্ত সাপ ও চোরাকাদা ছাড়া আর কিছু নেই।

প্রকৃতির এই সব বাধা-বিঘ্নই সম্ভবত খান আল আসকার জেলখানাকে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সবাই জানে এখান থেকে কেউ পালাতে পারে না। বলা হয় কেউ যদি জাদু দেখিয়ে জেলখানা থেকে বেরুতে পারেও, কোনওক্রমেই তার পক্ষে এলাকা ত্যাগ করা সম্ভব হবে না।

আবিলকে সকাল দশটায় নিয়ে আসা হলো কারাগারে। এখনও সে তার নিজের পোশাক পরেই আছে – সাদা ও ঢোলা জোব্বা, মাথায় পাগড়ির মত করে একটা কাপড় জড়ানো, দুইপ্রান্ত বুকের দুপাশে ঝুলে আছে; জোব্বার নীচে বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে কালো সালোয়ার। হাতের সরু, সবুজ লাঠিটা অবশ্য নেই। তবে গলার মালাগুলো আছে, পশু ও মাছের খুদে হাড় দিয়ে তৈরি।

কী ভাগ্য তার, ঠিক ওই সময় অফিস কামরায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বখতিয়ার খিলজি।

বখতিয়ার খিলজি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অফিসার। সাহস ও সততার জন্য স্বদেশ ও ইন্টারপোল একাধিক বার তাঁকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে স্পেশাল ট্রেনিং শেষ করবার পর বিভিন্ন দেশে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাতিসংঘ থেকে পেয়েছেন বিশেষ সম্মাননা ও প্রশংসাপত্র।

মুসলমানদের যেখানে কোণঠাসা অবস্থা, সেই ইজরায়েলেও বখতিয়ার খিলজির নাম অত্যন্ত সমীহের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সবাই জানে তিনি মানুষ হিসেবে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় ভেদাভেদ মানেন না, এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন। তাঁর মত সৎ ও নির্ভীক

পুলিশ অফিসার ইজরায়েলে দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ।

আবিলকে দেখেই কেমন যেন সতর্ক হয়ে গেলেন পুলিশ সুপার খিলজি। আদালত থেকে পাঠানো কাগজ-পত্রে চোখ বুলালেন তিনি। তারপর আরেকবার ভাল করে দেখলেন নতুন কয়েদীকে। নামের সঙ্গে বেশভূষা বেমানান লাগছে তাঁর চোখে। শুধু বেমানান লাগলেও কথা ছিল, মনে হলো এই পোশাক ও অলঙ্কার তাঁর খুব পরিচিত। শুধু এগুলো নয়, নতুন কয়েদীর চেহারাও চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু তা কী করে হয়? কোথায় দেখবেন? নাহ্, সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়!

ঠিক তিন দিন, অর্থাৎ বাহাত্তর ঘণ্টা পর: মঙ্গলবার সকাল দশটা দশ মিনিটে আবিল আহুদের কপাল আরেকটু পুড়ল। তবে তার কপালটা পুড়ছে ষাট কিলোমিটার পুবে, জর্দানের রাজধানী আম্মানে, কাজেই এখনই কোনও আঁচ লাগছে না ওর গায়ে।

সেদিনই বিকেল চারটের দিকে, খান আল আসকার থেকে সত্তর কিলোমিটার পশ্চিমে, তেল আবিবে, তাকে নিয়ে শুরু হলো অন্যরকম একটা আলোড়ন।

ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদ হেডকোয়ার্টার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মেনাচিম আয়াম প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এজেন্টদের ফ্যাক্সযোগে পাঠানো রিপোর্ট নিয়ে বসেছেন।

সার বোঝাই ট্রাক বহর নিয়ে ইজরায়েলের ভিতরে ধরা পড়েছে জর্দানী স্মাগলার আবিল আহুদ, সেদিনই সামারি ট্রায়ালে তার জেল হয়েছে পাঁচ বছরের, এ খবর এরইমধ্যে বাসি হয়ে গেছে মেনাচিম আয়ামের কাছে। সেজন্যই জর্দানের রাজধানী আম্মান থেকে মোসাদ এজেন্টের পাঠানো নতুন খবরটা ভয়ানক

চমকে দিল তাঁকে। খবরের সঙ্গে একটা লাশের ফটোও রয়েছে।

খবরটা হলো: **আম্মানে খুন হয়েছে আবিল আহুদ।**

রিপোর্টে বলা হয়েছে: যতদূর ধারণা করা হচ্ছে, জর্দানী ইন্টেলিজেন্স-এর একটা সেফ হাউসে আটকে রাখা হয়েছিল আবিলকে। নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করছিল সে, গার্ডের গুলি খেয়ে বাড়িটার বাইরে রাস্তায় মারা গেছে।

গুলির আওয়াজই ফাঁস করে দিয়েছে সব। রাস্তার লোকজন ভিড় করেছে, খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলেছে লাশের, পুলিশ এসেছে। তারপর যথারীতি গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়েছে।

মেনাচিম আয়াম ভাবলেন, একই আবিল আহুদ দু'জায়গায় থাকতে পারে না। স্মাগলার হিসাবে যাকে ইজরায়েলে ধরা হয়েছে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিপজ্জনক কোনও জঙ্গি হবে। তবে চিন্তার কিছু নেই, লোকটা জেলে আছে। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে ইন্টারকমের রিসিভার তুললেন তিনি। 'লেভি? এখনই একবার আমার চেম্বারে চলে এসো। ইন্টারেস্টিং কেস পাওয়া গেছে।'

'ইয়েস, সার!' অপরপ্রান্ত থেকে তরুণ মোসাদ এজেন্ট লেভি মুভিনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে আবিলের, কাজেই রোববার ভোর থেকেই তাকে জেলখানার বাইরে কয়লাখনিতে কাজ করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কয়লাখনি থেকে কাজ করে জেলখানায় ফেরার সময় আবার তাকে দ্বিতীয়বারের মত দেখলেন পুলিশ সুপার খিলজি। আজ কয়েদীর ড্রেস, ডোরাকাটা কাপড়ের ঢোলা

প্যান্ট ও হাফহাতা শার্ট পরে আছে আবিল। তারপরেও আবার সেই অনুভূতিটা হলো খিলজির – এই কয়েদীকে যেন অনেক আগে চিনতেন তিনি। তবে আজও মনে করতে পারলেন না কবে কোথায় দেখেছেন।

আল আসকার কারাগারের ভিতরেই, তবে পাঁচিল ঘেরা আলাদা দালানে ইজরায়েলি পুলিশের অফিসার্স কোয়ার্টার। রাতে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর ড্রইংরুমে বসে টেলিভিশন দেখতে দেখতে স্ত্রী তাওহিদাকে কথাটা বললেন খিলজি। 'নতুন একজন কয়েদী এসেছে, বুঝলে। নাম আবিল আহুদ। জর্দানী ইহুদি, স্মাগলার।'

স্বামীর ও নিজের জন্য দুটো গাসে ছাগলের দুধ ঢেলে এনেছে উম্মে তাওহিদা। বেদুইন জীবনের এই একটা অভ্যাস এখনও তার যায়নি। নিজে তো খায়ই, স্বামীকেও ছাগলের দুধ খেতে অভ্যস্ত করিয়েছে। 'জর্দানে ইহুদি আছে জানতাম না তো।'

'আছে কিছু,' বললেন খিলজি। 'সেটা বিষয় নয়।'

গ্লাস সহ বাড়ানো হাতটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, স্বামীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল তাওহিদা। 'তোমাকে কেমন পেরেশান লাগছে। কী ব্যাপার, বখতিয়ার?'

'তাকে দেখলেই কেন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে আমার,' বললেন খিলজি। 'কিন্তু ঠিক কোথায় যে দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

স্বামীর পাশে, সোফায় বসল তাওহিদা। মৃদু শব্দে হেসে উঠে বলল, 'নিশ্চয়ই আমার কোনও প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তোমার।'

তার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে ছোট্ট করে চুমুক দিলেন

খিলজি। ‘উফ্, গরম, জিভটা পুড়ে গেল! না, ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়, তাওহিদা।’

‘বলো শুনি, কেমন দেখতে সে, কী পরেছিল?’ জানতে চাইল তাওহিদা।

‘ঠিক আছে,’ বলে শুরু করলেন খিলজি।

দু’মিনিটও হয়নি, হাতটা কেঁপে যাওয়ায় গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা দুধ, স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বেদুইনকন্যা তাওহিদা সবিস্ময়ে বলল, ‘বখতিয়ার! মনে হচ্ছে ইনিই তো সেই!’

পুলিশ সুপার খিলজি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন স্ত্রীর দিকে। ‘ইনিই তো সেই – মানে?’

‘ফুলশয্যার রাতে ওঁর কথা বলেছিলাম তোমাকে আমি। মনে নেই তোমার?’ নিজের অজান্তেই গলার আওয়াজ খাদে নেমে এল তাওহিদার। ‘তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, বিয়ের আগে আমি কাউকে ভালবেসেছিলাম কি না। জবাবে আমি বলেছিলাম, ভুল করে একজনকে ভালবাসতে ইচ্ছে করেছিল। ভুল করে বলেছিলাম এই জন্য যে আমার ভালবাসা কিংবা আমার রূপ-যৌবন টলাতে পারে, এমন মানুষ নন তিনি।’

‘হ্যাঁ, মনে পড়ছে,’ অকারণেই ফিসফিস করে কথা বলছেন খিলজি। ‘সব শুনে আমি বলেছিলাম – আশ্চর্য! ভদ্রলোক মস্ত বড় মনের মানুষ ছিলেন।’

‘তাঁর দুটো চেহারা দেখেছি আমি, একটাও আসল নয়।’ দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল তাওহিদা। ‘কে জানে, তুমি যে চেহারাটা দেখে এসেছ সেটা তাঁর আসল চেহারা কি না।’ হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। ‘বখতিয়ার, তাঁর তো তা হলে সাংঘাতিক বিপদ!’

হঠাৎ বিষণ্ন দেখাল পুলিশ সুপার খিলজিকে। ‘এসো,

তাওহিদা, আল্লাহ্‌র কাছে আমরা কামনা করি, ইনি যেন তিনি না হন।’

‘কেন? কী বলতে চাইছ?’

‘ভেবে দেখো, তাওহিদা। তিনি একজন বীর যোদ্ধা, বিদেশী হয়েও প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবন বাজি রেখে যখনই প্রয়োজন লড়াই করছেন। নিশ্চয়ই আবার কোনও সাহায্য করতে এসে ধরা পড়ে গেছেন তিনি। আমরা দুজনেই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার তো হাত-পা বাঁধা, তাওহিদা। তুমি জানো, আমি তাঁকে কোন রকম সাহায্য করতে পারব না।’

কিছু বলবার সুযোগ হলো না তাওহিদার, তার আগেই নিচু টেবিলে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল।

‘এত রাতে কার ফোন?’ বিড়বিড় করে রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন খিলজি।

রিমোট কন্ট্রোল-এর বোতামে চাপ দিয়ে টেলিভিশনের আওয়াজ আরও কমিয়ে দিল তাওহিদা। সতর্ক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

‘হ্যালো?’ রিসিভার কানে তুললেন খিলজি।

অপরপ্রান্ত থেকে জেলার-এর গলা ভেসে এল। ‘মিস্টার খিলজি? কর্নেল রিউভিন তাসরুক। হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে, আপনাকে আজ রাতে জেল গেটে মোসাদের একজন এজেন্টকে রিসিভ করতে হবে।’

‘কী ব্যাপার বলুন তো, মিস্টার তাসরুক?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন খিলজি। ‘হঠাৎ এখানে মোসাদ কেন?’

‘সিরিয়াস ব্যাপার, মিস্টার খিলজি। সামারি ট্রায়ালে সাজা দিয়ে আবিল আহুদ নামে একজন স্মাগলারকে শনিবার সকালে

এখানে পাঠানো হয়েছে, জানেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মোসাদ জানতে পেরেছে, মঙ্গলবার সকালে আম্মানে খুন হয়েছে আবিল আহুদ,' বললেন জেলার।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পুলিশ সুপার খিলজি জানতে চাইলেন, 'এই লোকটা তা হলে কে?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। মোসাদ সন্দেহ করছে, লোকটা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক কোনও জঙ্গি হবে।'

'হুম।'

'ওরা লেভি মুভিন নামে একজন এজেন্টকে পাঠাচ্ছে। তেল আবিব থেকে জিপ নিয়ে রওনা হয়েছেন তিনি, যে-কোনও মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন।'

কথা না বলে কান পেতে অপেক্ষা করছেন খিলজি।

'কেসটা বেশ জটিল ও সিরিয়াস মনে হওয়ায় ভাবলাম মোসাদ এজেন্ট যখন আবিল আহুদকে ইন্টারোগেট করবে তখন সেখানে আপনি উপস্থিত থাকলে ভাল হয়। আবিল যে-ই হোক, এখন সে আমাদের কয়েদি, কাজেই তার নিরাপত্তার দিকটা আমাদেরকেই দেখতে হবে। আপনাকে ছাড়া আর কারও ওপর আমার ততটা আস্থা নেই। জানি আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে...'

'না, ঠিক আছে। দশ মিনিটের মধ্যে জেলখানায় আসছি আমি,' বললেন খিলজি। 'মোসাদ এজেন্ট পৌঁছাবার আগেই লোকটাকে আমি আর একবার দেখে রাখি।'

'ভেরি গুড। থ্যাঙ্ক ইউ, সুপারিনটেনডেন্ট,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন জেলার রিউভিন তাসরুক।

উৎকণ্ঠিত তাওহিদা একটা ঢোক গিলে জানতে চাইল, 'কী

ব্যাপার, বখতিয়ার?'

'এসো, বলছি।' সোফা ছাড়লেন খিলজি। পাশের রুমে এসে ওয়ার্ড্রোব থেকে ট্রাউজার ও শার্ট বের করে পরছেন, সেই সঙ্গে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করছেন স্ত্রীকে।

দুই কামরার মাঝখানের দরজায় অটল দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনল তাওহিদা। খিলজি থামতে বলল, 'আমি তাঁকে দেখতে যাব।' অনুরোধ নয়, নয় আবেদন, তার কণ্ঠস্বরে শুধুই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেল।

স্থির হয়ে গেলেন পুলিশ সুপার। 'কিন্তু, তাওহিদা…'

'তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে,' আশ্চর্য একটা জেদের সঙ্গে বলল তাওহিদা।

'কী কথা?'

'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব নিজের জীবনটাকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলার মানে কী?'

'কিন্তু…' শুরু করলেও, স্ত্রীর চোখে এমন কিছু দেখতে পেলেন খিলজি, সিদ্ধান্ত পাল্টে তাড়াতাড়ি আবার বললেন, 'ঠিক আছে, চলো।'

'আরেকটা কথা – আমি তাঁর সঙ্গে একা কথা বলব।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন খিলজি। 'বেশ, তাই হবে। চলো।'

'না, এক সঙ্গে যাব না,' মাথা নেড়ে বলল তাওহিদা। 'আমি চাই না লোকে তোমাকে নিয়ে কানাঘুষা করুক। তুমি একা যাও। কিছুক্ষণ পর আমি যাব। ডিউটি অফিসারকে বলা যাবে, তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে খোঁজ নিতে এসেছি। এভাবে আগেও গেছি আমি।'

'ঠিক আছে,' বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়লেন খিলজি।

স্বামীকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়ে ড্রেসিংটেবিলের সামনে সাজতে বসল উম্মে তাওহিদা। বাক্স খুলে বিয়ের সমস্ত সোনার গহনা বের করেছে সে, এক এক করে পরছে সব – দুই হাতে চারটে আঙটি, ছ'টা করে এক ডজন চুড়ি, একজোড়া চূড়, ললাটের টিকলি, একজোড়া বাজুবন্ধ, ঢাউস আকৃতির ঝুমকো ও সবুজ পান্না বসানো চওড়া নেকলেস। আরও আছে রুপোর তৈরি কোমরের বিছা ও নূপুর, তবে এগুলো তাওহিদা পরল না।

এ-সব গহনা আল শাহরিয়ার তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। কে এই আল শাহরিয়ার, আজও জানার সুযোগ হয়নি তার। তবে মনে আছে কীভাবে দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে বিদায়ের মুহূর্তটিও কোনওদিন ভুলবে না তাওহিদা।

তারা আরব বেদুইন, যাযাবর; বরাবরের মত কাফেলা নিয়ে মাস্কাট থেকে রওনা হয়েছিল, তারপর বিশাল সৌদি মরু পার হয়ে ঘুরে এসেছে বাগদাদ ও ইস্পাহান, তারপর দিক বদলে ঢুকেছে ইজরায়েল, লেবানন ও সিরিয়ায়। এরই মাঝখানে কোথাও হঠাৎ এক সকালে তাঁবুতে দেখা গেল সুদর্শন এক তরুণকে। বেদুইন সর্দার সাবরি জানালেন, ওর নাম আল শাহরিয়ার, আল খায়রুলের বিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলে।

সেই সঙ্গে কীভাবে যেন রটে গেল আল শাহরিয়ারের সঙ্গে তার, উম্মে তাওহিদার বিয়ে হবে। কিন্তু রামালায় তাঁবু ফেলার পর পরিস্থিতি দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। তাওহিদাকে ডেকে সর্দার সাবরি বললেন – গোষ্ঠির স্বার্থে গোটা ব্যাপারটা ছিল সাজানো, শাহরিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে হবে না। শাহরিয়ার একজন বিদেশী যোদ্ধা, প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধে ইয়াসির আরাফতকে সাহায্য

করতে যাচ্ছেন।

সেই রাতে সর্দারের অনুমতি নিয়ে শাহরিয়ারের অন্ধকার তাঁবুতে একা ঢুকেছিল তাওহিদা। সেদিন তার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, সব পরিষ্কার মনে আছে ওর [দ্রষ্টব্যঃ মাসুদ রানা-৩২৮, **অপারেশন ইজরায়েল**]।

ওর পায়ের শব্দ অকস্মাৎ থেমে যেতে শাহরিয়ার খুক করে কেশে বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ডান পাশে একটা চামড়ার বড় সুটকেস আছে, ওটার ওপর বসতে পারো।'

'শাহরিয়ার, আপনি আলো জ্বালবেন না?' ফিসফিস করে কথা বলল তাওহিদা। 'আমি আপনার এই নতুন চেহারাটাও দেখতে চাই।'

শাহরিয়ার বলল, 'ও, তুমি তা হলে সব জানো?'

'সব?' অন্ধকারে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'নাহ্।' বোঝা গেল, গলায় উঠে আসা কান্নাটাকে আটকে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

'আমার সম্পর্কে সবটুকু জানা বিপজ্জনক, তাই কাউকেই জানানো হয়নি,' ব্যাখ্যা দেওয়ার সুরে বলল শাহরিয়ার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই চেহারাটাও আমার নয়, তারপরও দেখতে চাইছ কেন?'

'দুটো নকল চেহারার ভেতর যদি আসল চেহারার খানিকটা আভাস পাই, এই আশায়,' তাওহিদার কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর।

'সত্যি কথা বলো। সরাসরি বলো। তুমি কি আমাকে এতটা ভালবেসে ফেলেছ যে মনে হচ্ছে ভুলতে পারবে না?'

'তা যদি বেসেও থাকি, তাতে আপনার কোন দায় বা কৃতিত্ব, কোনওটাই নেই,' তাওহিদা সরাসরি জবাব দিচ্ছে না, তবে সত্যি

কথা বলছে। 'আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারি, আপনি সাড়া দিচ্ছেন না। ফল হয়েছে উল্টো, আমি আরও বেশি—' নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে গেল সে।

চুড়ির ঘন ঘন শব্দ শুনে শাহরিয়ার বলল, 'তুমি চোখের পানি মুছছ, তাওহিদা।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না মেয়েটা। কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিল। 'হ্যাঁ, কিন্তু বলতে পারছি না: এই পানি আপনি আমার চোখ থেকে মুছিয়ে দিন। সে অধিকার আপনি আমাকে দেননি।'

শাহরিয়ার এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমার যাবার সময় হয়েছে। যদি কোনও অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা চাই।'

'এটা কোনও প্রসঙ্গ নয়। আমরা কেউ কোনও অপরাধ করিনি।' নিজেকে ইতোমধ্যে অনেকটাই সামলে নিতে পেরেছে তাওহিদা। 'আপনার কথা জানি না, তবে আমার একটা দুঃখ সারা জীবন থাকবে – কোনও দিন জানা হবে না কে আপনি, কোত্থেকে এসেছিলেন, কোথায়ই বা চলে গেলেন। কিংবা কে জানে, সময় তো সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক, একদিন হয়তো সন্দেহ জাগবে মনে, সত্যি কি কোনওদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল?'

'আমি তা হলে যাই?'

'আপনাকে আমি দেখতে এসেছিলাম,' বলল তাওহিদা। 'এও আশা করেছিলাম, আপনি হয়তো এমন কিছু দিতে চাইবেন আমাকে যার কথা চিরকাল মনে থাকবে আমার – ইচ্ছে করলেও অনুভূতিটা মুছে ফেলতে পারব না।'

'দুঃখিত। তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

হেসে উঠে তাওহিদা বলল, 'আমি বেদুইনকন্যা, সাহস করলে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি, পছন্দ হলে কাউকে অনেক

কিছু দিতেও পারি। কিন্তু আপনি না পারেন কিছু দিতে, না পারেন কিছু নিতে – কারণ আপনি একজন ভদ্রলোক।' একটু থামল সে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বিদায়। ভাল থাকুন, এই দোয়া করি। তবে, চেহারাটা একবার দেখব, হোক নকল,' বলে হাতের টর্চটা জ্বালল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে নিজের মুখ চেপে ধরল তাওহিদা, আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

শাহরিয়ারের গোটা শরীর কালো চাদর দিয়ে মোড়া। এমনকী তার মাথাতেও পরানো হয়েছে কালো কাপড়ের মুখোশ – শুধু নাক, চোখ ও ঠোঁটের কাছে খুদে ফুটো দেখা যাচ্ছে।

টর্চ নিভে গেল। থরথর করে কাঁপছে তাওহিদা। আশপাশের মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসছে।

স্মৃতি রোমন্থন ও গহনা পরা একসঙ্গে শেষ করল তাওহিদা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে, তারপর ড্রেসিং রুমের সামনে থেকে উঠে পুলিশ সুপারের স্টাডিরুমে চলে এল। স্টিল কেবিনেট-এর তালা খুলে পুরানো একটা ফাইল বের করল সে। স্বামীকে না বলে তার জিনিসে হাত দিচ্ছে, সেজন্য তাওহিদার মনে কোনও ভীতি নেই, নেই কোনও অপরাধবোধও।

শাহরিয়ারকে বিদায় দেওয়ার ঠিক দু'বছর পর তেল আবিবের কাছাকাছি বখতিয়ার খিলজির সঙ্গে তার পরিচয়। প্রথমদর্শনেই পরস্পরকে পাগলের মত ভালবেসে ফেলে ওরা। ওখানকার একটা থানার ওসি ছিলেন তখন তিনি। কিছুদিন মেলামেশা করবার পর দুজনেই বুঝতে পারল তাদের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদি অনেক কিছুই মেলে। বিয়ের প্রস্তাব দিলেন খিলজি। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক সর্দার সাবরি মত দিলেন না। অগত্যা

পালিয়ে গিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করল ওরা।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিল তাওহিদা। শুধু মুখ বাদে তার গোটা শরীর কালো বোরকায় ঢাকা। আগে কখনও এই জিনিস পরেনি সে, ভবিষ্যতেও কখনও পরবে বলে মনে হয় না, আজ অনেকটা বাধ্য হয়েই পরতে হয়েছে – তা না হলে সোনার গহনাগুলো ঢাকা যেত না। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে, এই সময় জেলখানা থেকে ঘণ্টা পড়ার আওয়াজ ভেসে এল। রাত ন'টা বাজে।

কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা ও কারাগারের মাঝখানে উঁচু একটা পাঁচিল আছে, মাথায় কাঁটাতারের বেড়া। গেটে চার-পাঁচজন সশস্ত্র সিপাই পাহারা দিচ্ছে। তাওহিদাকে আসতে দেখে হাত তুলে সালাম দিল তারা, তারপর গেট খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াল।

জেলখানার কমপাউন্ডে ঢুকে সোজা অফিস কামরার দিকে এগোল তাওহিদা। চারপাশে টহল দিচ্ছে গার্ডরা। সবাই চেনে তাকে। সালাম দিচ্ছে। ডিউটি অফিসার জানাল, পুলিশ সুপার ডি ব্লকের তিনতলায় আছেন, জানতে চাইল, 'ম্যাডাম, সারকে খবর দেব আপনি এসেছেন? নাকি পথ দেখাতে কাউকে আপনার সঙ্গে দেব?'

হেসে ফেলল তাওহিদা। 'পথ দেখাবার জন্যে লোক লাগবে কেন? আপনাদের জেলখানার প্রতি ইঞ্চিই তো আমি চিনি। মনে হচ্ছে কোনও কাজে ব্যস্ত তিনি,' বলল সে। 'যাই, আমিই দেখা করে আসি।'

খসখস করে একটা গেটপাস লিখে দিল ডিউটি অফিসার।

কারা সংস্কার আইন পাস হওয়ার পর ইজরায়েলে নতুন কিছু

জেলখানা তৈরি করা হয়েছে, খান আল আসকার সেগুলোর একটা। এখানে কয়েদিদেরকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়।

তাওহিদাকে সালাম দিয়ে সেন্ট্রাল হলে ঢোকার গেট খুলল হেড কনস্টেবল, তারপর ডি ব্লকের গেট খুলে দিল। ভিতরে ঢুকল তাওহিদা। ও জানে, সিঁড়ির মুখে প্রতিটা ফ্লোরে লোহার গেট ও প্রহরী আছে। প্রতিটা ফ্লোরেই ওকে গেটপাস দেখাতে হবে। পিছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই এগোল করিডর ধরে।

করিডরে আলো জ্বললেও, দু'পাশের সেলগুলো অন্ধকার। এদিকের কিছু সেলে দরজা আছে, কিছুতে আছে গরাদ। গরাদ লাগানো সেলগুলো বেশিরভাগই খালি বলে মনে হলো তাওহিদার। করিডরের মাঝামাঝি পৌঁছে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। ওখানেও সিঁড়ির মাথায় গার্ড। তেতলায় উঠে কিছুদূর গিয়ে ডানদিকের একটা প্যাসেজের প্রায় শেষ মাথায় স্বামীকে দেখতে পেল সে, একটা সেলের বাইরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি।

ধীর পায়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল তাওহিদা।

সেলের ভিতরে দুজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। একজন দেয়াল ঘেঁষে ফেলা লোহার বেডে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দ্বিতীয়জন সেলের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গেই কথা বলছেন পুলিশ সুপার খিলজি। কিন্তু আল শাহরিয়ারের যে চেহারা তাওহিদার মনে গেঁথে আছে তার সঙ্গে এই দ্বিতীয় কয়েদির মিল খুব সামান্যই। কয়েদির ড্রেস পরে থাকায় আরও অচেনা লাগছে।

'তোমরা কথা বলো, আমি একটা রাউন্ড দিয়ে আসি,' বলে

ঘুরলেন খিলজি, পাঁচ-সাত পা এগিয়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কয়েদির দিকে তাকাল তাওহিদা। কপালের কাছে হাত তুলে বলল, 'সালাম। আপনি কি আল শাহরিয়ার?'

নিঃশব্দে হাসল কয়েদি। 'জানার কি আদৌ কোনও দরকার আছে, তাওহিদা?'

'আছে,' ক্ষোভ মেশানো চাপা গলায় বলল তাওহিদা। 'আল শাহরিয়ারকে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'কী প্রশ্ন?'

মাথা নাড়ল তাওহিদা। 'আগে আমাকে জানতে হবে কার সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

'আমিই শাহরিয়ার।'

'কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন?'

'প্রমাণ চাও? তোমাকে যে চিনতে পারলাম, এটা যথেষ্ট প্রমাণ নয়? তা হলে শোনো, অন্ধকার একটা তাঁবুতে তুমি আমাকে বলেছিলেঃ আমি বেদুইনকন্যা, সাহস করলে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি, পছন্দ হলে কাউকে অনেক কিছু দিতেও পারি।'

'ওই কথাগুলো আজ আর আমি স্মরণ করতে চাই না। আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি,' বলল তাওহিদা। 'যাই হোক, জানা গেল যে আপনিই সেই আল শাহরিয়ার। আমার প্রশ্ন হলো, নিজের জীবনটাকে নিয়ে এভাবে আপনি ছিনিমিনি খেলছেন কেন?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন কোন্ অধিকারে করছ তুমি?'

টান দিয়ে বোরকার চেইন খুলল তাওহিদা, কালো সিল্ক

সরিয়ে পরে থাকা গহনাগুলো দেখাল। 'যে অধিকারে এগুলো আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।'

'ওগুলো ছিল আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা।'

'তা হলে আমার তরফ থেকে শুভকামনা থাকতে পারবে না কেন?'

'হুম। তা হলে আমাকেও বলতে হয়, আমি যে বেদুইনকন্যা উম্মে তাওহিদাকে চিনতাম, এখানে, এই পরিবেশে তাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। বাতাসে ফুলে ওঠা সেই রঙচঙে সিল্কের ঘাঘরা, আগুনের চারপাশে ঝুন-ঝুন করা পায়ের নূপুর, চঞ্চল ঝর্ণার মত খিলখিল হাসি – কোথায় সে-সব?'

শাহরিয়ারের দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তাওহিদা, তবে তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। 'কাউকে কোনওদিন ভালবেসেছেন? যদি বেসে থাকেন, তবেই আমার জবাবটা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক; লাগামহীন, বন্য স্বাধীনতা হারিয়েছি আমি; কিন্তু হারিয়েছি বেহেশতের বিনিময়ে।'

'তোমার স্বামীকে নিয়ে দেখছি তুমি সত্যিই গর্বিত...'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল তাওহিদা। 'তিনি একজন সৎ মানুষ, এটা ছাড়া তাঁকে নিয়ে গর্ব করার আর বিশেষ কিছু নেই – অন্তত তৃতীয় কাউকে বলার মত কিছু নেই। আমি একজন এতিমকে বিয়ে করেছি।'

'আচ্ছা?' ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'যেন একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছি?'

মাথা ঝাঁকাল তাওহিদা। 'বড় মর্মান্তিক গল্প। জঙ্গি হামাস গেরিলাদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় তেল আবিবে সেবার নিরীহ ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা প্রায় সমান সংখ্যায় মারা পড়েছিল।

একজন পুলিশ সুপার-এর নেতৃত্বে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। বিস্ফোরণে পাঁচ বছরের একটা মুসলমান শিশুর বাবা ও মা, দুজনেই মারা যান। ওই পুলিশ সুপার রক্তাক্ত লাশের স্তূপে পড়ে থাকতে দেখে বাচ্চাটিকে বুকে তুলে নেন। তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছে সে। সেদিনের সেই শিশুটির সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে।'

'ভেরি স্যাড,' মৃদুকণ্ঠে বলল শাহরিয়ার, 'শোনো, বোকা মেয়ে, আমি জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি না, স্রেফ দায়িত্ব পালন করছি।'

'এ কেমন দায়িত্ব যে...'

'যা জানো না তা নিয়ে কথা বললে শুধুই সময় নষ্ট হবে। তারচেয়ে বলো, কেন এসেছ।'

'আপনার খুব বিপদ,' বলল তাওহিদা। 'আমার স্বামী, পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি আপনাকে কিছু বলেননি?'

'না। কী বিপদ?'

'আবিল আহুদ আম্মানে খুন হয়েছে,' ধীরে ধীরে বলল তাওহিদা। 'মোসাদ থেকে একজন এজেন্ট আসছে আপনাকে ইন্টারোগেট করতে।'

কয়েদির চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। বোঝা গেল, বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছে। কী যেন চিন্তা করল সে, তারপর মুখ তুলে তাওহিদার দিকে তাকাল।

'আমার স্বামীর কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাবার কথা ভুলেও ভাববেন না,' তাড়াতাড়ি বলল তাওহিদা। 'মুসলমান হলেও, ইজরায়েল সরকারের চাকরি করেন তিনি। নীতিবান, সৎ মানুষ।'

কয়েদির ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। 'তার মানে শুধু

বিপদের খবরটা জানাতে এসেছ? ওটা তো এমনিতেই জানতে পারতাম আমি, এত কষ্ট না করলেও পারতে, তাওহিদা।'

'এতদিন পর দেখা, অথচ আমরা শুধু ঝগড়া করছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাওহিদা। 'কত কথা জানার ছিল – এতদিন কোথায় ছিলেন, বিয়ে করেছেন কি না, আপনি আসলে কেমন দেখতে...'

এই সময় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতে স্বামীকে দেখতে পেল তাওহিদা। বাঁক ঘুরে হনহন করে ফিরে আসছেন খিলজি, হাতে মোবাইল ফোন। 'ভদ্রলোক আর দশ মিনিটের মধ্যে গেটে পৌঁছে যাবেন, তাওহিদা। তার আগেই কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়া দরকার তোমার।'

'হ্যাঁ,' শান্ত, নরম সুরে বলল তাওহিদা। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে কয়েদির দিকে তাকাল। 'বিদায়। আপনার জন্যে আমরা প্রার্থনা করব, খোদা যেন আপনার মঙ্গল করেন।'

'বিদায়,' বিড়বিড় করল কয়েদি। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, পুলিশ সুপার খিলজির চোখ ফাঁকি দিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে সেলের ভিতরে কী যেন ফেলল তাওহিদা।

ওরা চলে যাওয়ার পর ঝুঁকল কয়েদি, সেলের আধো অন্ধকার মেঝে থেকে গোল কিছু একটা তুলল। চোখের সামনে এনে দেখা গেল, পাকানো একটা কাগজ।

ধীরে ধীরে কাগজটার ভাঁজ খুলল কয়েদি। একবার চোখ বুলাতেই বুঝতে পারল জিনিসটা কী।

করিডরের আলোয় কাগজটা ধরে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে, ওটার সমস্ত বৈশিষ্ট্য গেঁথে নিচ্ছে মগজে। ওকে ইন্টারোগেট করতে আসছে মোসাদ এজেন্ট, এখানে এমন

কিছু রাখা চলবে না যেটা ওর বিরুদ্ধে কিংবা ওর শুভানুধ্যায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। কাজটা শেষ হতে কাগজটা মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল।

তিন

'দেখি তোমার মনে আছে কি না,' বললেন বস্। 'দাদু কে?'

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার, ঢাকা। সকাল ন'টা বেজে দশ। বিসিআই-এর ডিরেক্টর মেজর জেনারেল [অবসরপ্রাপ্ত] রাহাত খানের চেম্বার।

কাঁচা-পাকা ভ্রূর ভিতর তীক্ষ্ণ হয়ে আছে ঝকঝকে উজ্জ্বল প্রাচীন চোখ দুটো, তাঁর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানার প্রতিক্রিয়া দেখছেন বিসিআই চিফ।

এক সেকেন্ডের জন্য বিব্রত বোধ করল রানা। হোমওঅর্কে কাঁচা স্কুলছাত্র মনে হলো নিজেকে, হেডসারের রক্তচক্ষুর সামনে পড়ে গুলিয়ে ফেলছে সব। তারপর মনে পড়ল। 'জী, সার, কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন ভদ্রলোক, দেখা হলেই বুকে জড়িয়ে...'

হাত তুলে বাধা দিলেন রাহাত খান, স্পষ্ট বোঝা গেল বিরক্ত হয়েছেন। 'আমি শুধু জানতে চেয়েছি, তোমার মনে আছে কি না তিনি কে।'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেল রানা। ‘প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সার। রাশিয়ার একটা ভার্সিটি থেকে দর্শন ও ইতিহাসে মাস্টার্স করেছেন। পিএলও-র সেন্ট্রাল কমিটির স্থায়ী সদস্য। ইয়াসির আরাফাতের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। খাদেমুল দাউদ – ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধারা সবাই তাঁকে আদর করে দাদু বলে সম্বোধন করে।’

‘বয়সটা প্রাসঙ্গিক নয়?’

‘জী, সার।’ দ্রুত মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘সম্ভবত গত মাসেই আশি পেরিয়েছেন।’

রাহাত খানের চোখে প্রশংসার ক্ষীণ আভাস ফুটল। ‘মিস্টার আরাফাত মারা যাবার পর এই ভদ্রলোকের স্ট্যাটাস সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?’ আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

‘পরবর্তী পিএলও নেতাদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি,’ বলল রানা। ‘কারণ চরমপন্থা অবলম্বন, ধর্মীয় গোড়ামিকে প্রশ্রয় দান, আত্মঘাতী হওয়া ইত্যাদির ঘোর বিরোধী তিনি। তাঁর লেখা একটা বইয়ের রিভিউ পড়েছি আমি, সার। বইটাতে এমন সব কথা আছে, মেনে নিতে না পেরে ফিলিস্তিনি ধর্মান্ধ জঙ্গিরা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পিএলও-র সেন্ট্রাল কমিটির পদ থেকে কেউ তাঁকে সরানোর চেষ্টা করেনি, নেতারাও কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কখনও একটি টুঁ-শব্দও করেননি।’

‘কেন?’

‘কারণ, সার, বইটাতে তিনি একটাও মিথ্যেকথা লেখেননি, বা একটি ভুল তথ্য দেননি।’

‘একটু ব্যাখ্যা করতে পার, ঠিক কি আছে বইটায়?’ জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'মিস্টার দাউদ বলেছেন, সাধারণ ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের শত্রু নয়। শত্রু হলো সুপারপাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র আর তার তাঁবেদার দালালরা। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই মার্কিনিদের এই দালালরা নেতা সেজে লুকিয়ে আছে। এদের সাহায্য নিয়ে গোটা বিশ্বে মুসলমানদেরকে হেয় করছে মার্কিন প্রশাসন। উৎসাহ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, আশ্রয়, ফান্ড ইত্যাদি দিয়ে ইসলামী জঙ্গিবাদ আমেরিকাই সৃষ্টি করেছে, আবার সেটাকে দমন করার নামে দেশে দেশে চাপিয়ে দিচ্ছে অসমযুদ্ধ। উদ্দেশ্য হলো, সম্ভাব্য শক্তি হিসাবে মুসলমানরা ভবিষ্যতে দুনিয়ার কোথাও যাতে মাথা তুলতে না পারে।'

'হুম।' গম্ভীর দেখাল রাহাত খানকে। 'দাদু সম্পর্কে আর কী জানো তুমি?'

'ইয়াসির আরাফাত-এর প্রতি অবিচল আস্থা ছিল, তাঁর নেতৃত্বকে কখনও চ্যালেঞ্জ করেননি। মিস্টার আরাফাতকে আমি নানা কাজে সাহায্য করতাম, আমার প্রতি দাদুর ভালবাসা ও বিশ্বাসের সেটা একটা বড় কারণ,' এটুকু বলে চুপ করে থাকল রানা। ওর সঞ্চয় শেষ হয়ে গেছে।

'হামাস ক্ষমতায় আসার পর তেল আবিব থেকে খানিকটা দূরে কোথাও একটা সেফ হাউসে লুকিয়ে আছেন মিস্টার দাউদ,' বললেন বিসিআই চিফ। 'তুমি যেমন বললে, কিছু ধর্মান্ধ লোক আগেই তাঁকে খুন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। ওয়াশিংটনের প্ররোচণায় মোসাদও তাকে পেলে ছাড়বে না। এই মুহূর্তে খুন করবে বলে হামাসের কিছু নেতা-কর্মীও খুঁজছে তাঁকে। এরকম পরিস্থিতিতে অনুকূল ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল থেকে তাঁর একটা জরুরি মেসেজ পেয়েছি আমরা।'

‘সাহায্য চাইছেন দাদু? আমরা যাতে তাঁকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করি?’ প্রশ্নটা করে নিজের উপরই বিরক্ত হলো রানা। বহু বছর ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার সুবাদে খাদেমুল দাউদকে খুব ভাল করে চেনার সুযোগ হয়েছে ওর, কাজেই ওর বোঝা উচিত ছিল, ব্যক্তিগত কোনও কাজে কখনওই কারও সাহায্য চাওয়ার পাত্র তিনি নন।

‘না,’ বললেন বস্। ‘সে-ধরনের কিছু নয়।’ তাঁর সামনে ডেস্কের উপর একটা ফোল্ডার রয়েছে, সেটা খুললেন তিনি। ভিতর থেকে একটা এলভেলাপ বের করে ঠেলে দিলেন রানার দিকে। ‘মেসেজটা পড়ে দেখো।’

এনভেলাপ খুলে কাগজটা বের করল রানা। দেখামাত্র দাদুর হাতের লেখা চিনতে পারল ও। ছোট্ট একটা মেসেজঃ

স্নেহভাজন রানা,

মৃত্যুশয্যা থেকে লিখছি। তোমাকে শেষ একবার দেখতে চাই। জরুরি। তোমার এখানে আসবার সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে। – দাদু।

চোখ তুলল রানা, কাগজটা এনভেলাপে ভরে বসের সামনে রাখল।

‘কী বুঝলে?’ জানতে চাইলেন বস্, এনভেলাপটা ফোল্ডারে ভরলেন।

‘আমাকে দেখতে চাওয়াটা জরুরি হতে পারে না, সার,’ বলল রানা। ‘এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার আছে।’

‘হ্যাঁ, মেসেজ পড়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না,’ ভারী গলায় বললেন রাহাত খান। ‘তবে সিরিয়াস কোনও ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। সেটা কী তা তোমাকে জানতে হবে ওখানে গিয়ে।’ চট

করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন হাতঘড়ির উপর। 'আর দু'ঘণ্টা পর তোমার ফ্লাইট। জর্দানে যাচ্ছ তুমি।'

গলাটা হঠাৎ শুকনো লাগল রানার। 'দাদু যদি তেল আবিবের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকেন, জর্দান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ইজরায়েলে ঢুকতে হবে আমাকে।' ওহ্ আল্লা! ভাবল ও। আবার?

'হ্যাঁ।' ক্ষীণ একটু হাসলেন বিসিআই চিফ। 'কাজটায় দক্ষ হয়ে উঠেছ তুমি।'

কিছু না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

'মিস্টার খাদেমুল দাউদের অনুরোধে এবার তোমাকে সীমান্ত পেরুতে সাহায্য করবে জর্দানী ইন্টেলিজেন্স,' ধীরে ধীরে বললেন বস্। 'ওরা গোটা ব্যাপারটা জানে। ওদের মাধ্যমেই মেসেজটা পেয়েছি আমরা।' বাক্স থেকে সিগার বের করে ধরালেন। একমুখ নীল ধোঁয়া ছাড়লেন উপর দিকে। হাভানা চুরুটের ভারী গন্ধে ভরে উঠল কামরা। 'তুমি কাল জর্দানের সুমাইয়া শহরে পৌঁছালে কুখ্যাত একজন জর্দানী স্মাগলারকে সীমান্ত এলাকা থেকে তুলে এনে আম্মানের একটা সেফ হাউসে আটকে রাখবে ওরা। লোকটা ইহুদি, নাম আবিল আহুদ। সে স্মাগলারদের একটা সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করে। সম্ভবত কালই সীমান্ত পেরিয়ে ইজরায়েলে ঢোকার কথা আবিলের। তার বদলে, তার পরিচয় নিয়ে তুমি পেরুবে সীমান্ত।'

'বুঝলাম না, সার,' মাথা চুলকে বলল রানা। 'স্মাগলারের পরিচয় নিয়ে যেতে হবে কেন? ঝুঁকিটা তাতে আরও অনেক বেড়ে যায় না?'

'না, বরং ঠিক উল্টো – ঝুঁকি অনেক কমে আসবে,' বললেন বিসিআই চিফ। 'কারণ, ইজরায়েলি সীমান্তরক্ষীরা ইহুদি

স্মাগলারদের বিশেষ খাতির করে, ধরলেও দু'তিনদিন পর ছেড়ে দেয়। এমনও শোনা গেছে যে ধরা পড়ে কোনও মুসলমান বা খ্রিস্টান স্মাগলার নিজেকে ইহুদি বললে তাকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ধরা পড়লে তোমার বেলাও ঠিক তাই ঘটবে।'

'আচ্ছা, বুঝেছি, সার। আমি আবিলের পরিচয় ও চেহারা নিয়ে সীমান্ত পেরুব।'

'না, তার চেহারা নিয়ে নয়,' বললেন রাহাত খান। 'জন্মসূত্রে জর্দানের নাগরিক, ইজরায়েলে ঢুকলে তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হবে, এই ভয়ে আবিল কখনও ইজরায়েলে ঢোকেনি। স্মাগলার হিসেবে তার নাম সীমান্তের ওপারেও ছড়িয়ে থাকতে পারে, তবে ইজরায়েলের কোথাও তার কোনও ফটোগ্রাফ নেই।'

'আমি তা হলে...?'

'আল শাহরিয়ার-এর কথা মনে আছে তোমার?' রানাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন বস্, তারপর চুরুটে টান দিয়ে চিকন করে ধোঁয়া ছাড়লেন ছাতের দিকে।

'জী, সার,' চোখের সামনে রোমান্টিক একটা দৃশ্য ভেসে উঠতেই অতীতের দিকে ছুটতে চাইল স্মৃতি, তবে সেটাকে ঠেকিয়ে দিতে পারল রানা। 'মনে আছে।'

'তুমি ওই আল শাহরিয়ারের ছদ্মবেশ নিয়ে সীমান্ত পেরুবে,' বললেন রাহাত খান। 'অন্যান্য কাগজ-পত্রের সঙ্গে তার ওঅর্ক পারমিটটাও ইলোরার কাছ থেকে পাবে তুমি। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে তুমি আবিল নও, তখন ওই পরিচয়টা দিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করবে। নবায়ন করা না হলেও, ওটার একটা

বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুরুত্ব আছে। আর এটাও সঙ্গে রাখো, কাজে লাগবে।' ফোল্ডারটা রানার দিতে ঠেলে দিলেন।

'জী, সার।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় একটা ফাইল টেনে নিলেন রাহাত খান। এর অর্থ: 'আর কোনও প্রশ্ন না থাকলে তুমি এবার যেতে পার, রানা।' রানা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমনি সময়ে আবার কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ, নরম সুরে। 'আমি আশা করব মিস্টার দাউদের সঙ্গে আলাপটা সেরে যত তাড়াতাড়ি পারো আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি। রাজ্যের কাজ জমে আছে এখানে।' ফাইলটা খুললেন।

ইতস্তত করল রানা। 'সার।'

'হ্যাঁ, বলো?' ফাইল থেকে মুখ তুলছেন না বস্।

'সীমান্ত পেরিয়ে ইজরায়েলে ঢুকলাম,' বলল রানা। 'তারপর, সার?'

'তারপর কী করতে হবে ফোল্ডারের কাগজগুলো পড়লেই জানতে পারবে সব।'

'ও। ঠিক আছে, সার।' চেয়ার ছাড়ল রানা।

'উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার।'

ধীর পায়ে বসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

সেদিনই, তিন ঘণ্টা পর। থাই এয়ারের চার্টার করা একটা প্লেনে বসে রয়েছে রানা। প্লেন ছুটছে মধ্যপ্রাচ্য অভিমুখে। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছে ও। মনের চোখ দিয়ে আল শাহরিয়ারকে, অর্থাৎ নিজেকে দেখছে।

অনেক বছর পর আজ আবার মনে পড়ল মেয়েটির কথা। ভারি সুন্দর দেখতে ছিল ও। আরব বেদুইন নারী যেমনটি হওয়ার কথা – প্রাণচঞ্চল, দুঃসাহসী, স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া ও রহস্যময়ী – ঠিক তেমনটিই দেখেছে তাকে রানা।

চার

খান আল আসকার কারাগার। রাত সাড়ে বারোটা।

তিন ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে ইন্টারোগেশন চলছে।

ভাঙব, তবু মচকাব না – এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনও নিজের ভূমিকায় অটল রয়েছে মাসুদ রানা। নিজেকে একজন আরব বেদুইন, আল শাহরিয়ার বলছে ও। বলছে, সামারি ট্রায়াল-এর ম্যাজিস্ট্রেট ভুল করে ওকে আবিল আহুদ ধরে নিয়ে সাজা দিয়েছেন।

মোসাদ এজেন্ট লেভি মুভিনও নিজের সন্দেহ পরিত্যাগ করতে রাজি নয়। কয়েদিকে এক পলক দেখেই চেনা-চেনা লেগেছে তার। মনে হয়েছে, এ লোক তার পূর্ব-পরিচিত। কোথায় দেখেছে, কতদিন আগে, প্রথমে এ-সব কিছুই মনে পড়ল না। তারপর আন্দাজ করল, মোসাদ হেডকোয়ার্টারের কমপিউটারে এ-লোকের ফাইল ফটো দেখেছে সে। তার যদি মারাত্মক কোনও ভুল না হয়, এ হচ্ছে ইজরায়েলের পরম শত্রু বাংলাদেশ কাউন্টার

ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। অনেক চেষ্টা করেও একে শায়েস্তা করতে পারেনি মোসাদ।

সেলের ভিতর তিনজন সশস্ত্র সিপাই সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে, তাদের হাতের রাইফেল রানার দিকে তাক করা। দুটো চেয়ার আনা হয়েছে সেলে, একটায় বসেছেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি, আরেকটায় তরুণ মোসাদ এজেন্ট লেভি মুভিন। দেয়ালে হেলান দিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। সেলের অপর কয়েদি, বুড়ো ড্যান ব্রাউন, এখনও সেই আগের মতই দেয়ালের দিকে মুখ করে নিজের বেডে শুয়ে আছে। তবে ঘুমাচ্ছে কি না বলা মুশকিল।

'মিস্টার খিলজি, আপনাকে আবার আমি অনুরোধ করছি,' রুমাল দিয়ে ঘাড় ও কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুভিন। 'এই লোককে কথা বলাবার জন্যে আমাকে কিছু ইকুইপমেন্ট আনিয়ে দিন। ঠিক আছে, আর কিছু লাগবে না, শুধু ইলেকট্রিক শক দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন, প্লিজ। তারপর দেখবেন কেমন বাপ-বাপ করে স্বীকার যাচ্ছে সব কথা।'

মাথা নাড়লেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি। 'তা হয় না, মিস্টার মুভিন,' বললেন তিনি। 'আপনাকে তো বললামই, সাজা পাওয়া কয়েদির ওপর টরচার করার নিয়ম নেই এখানে।'

'কিন্তু আপনি খুব ভাল করেই জানেন, মোসাদ চাইলে আপনাদের যে-কোনও কয়েদিকে তেল আবিবে নিয়ে গিয়ে টরচার করে মেরে ফেলতে পারে।'

'এই কয়েদি যখন আমাদের দায়িত্বে থাকবে না, তখন আমরা দেখতেও যাব না তাকে নিয়ে কে কী করছে।'

মরিয়া হয়ে রানার দিকে তাকাল মোসাদ এজেন্ট।

‘তোমাকেও শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি, সাহস থাকে তো স্বীকার করো, তুমি মাসুদ রানা।’

‘সাহস থাকলেও স্বীকার করতাম না, সার,’ বলে ম্লান একটু হাসল রানা। ‘কারণ আমি স্মাগলার আবিল আহ্নদও নই, নই আপনার জানের দুশমন মাসুদ রানাও। আমি আল শাহরিয়ার।’

‘এত স্পর্ধা তোমার হয় কী করে? তুমি হাসছ কীভাবে?’ খেপে উঠল মুভিন।

‘হাসছি অতি দুঃখে, সার,’ বলল রানা। ‘আর দুঃখের কারণ আপনার নির্বুদ্ধিতা।’

আগুনে যেন ঘি পড়ল। ‘কী বললে?’ প্রচণ্ড রাগে হিসহিস করে উঠল মুভিন।

‘গত শুক্রবার রাতে আল আসকার হাইওয়েতে সামারি কোর্ট বসেছিল,’ বলল রানা। ‘একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন যে ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সাজা দিয়েছেন তাঁর নাম-ঠিকানা। চেষ্টা করলে তাঁর কাছ থেকে আমার ওঅর্ক পারমিটটাও আনিয়ে নিতে পারবেন। ব্যস, ঝামেলা শেষ।’

‘তুমি আর তোমার সমস্ত ঝামেলা শেষ হবে মোসাদ হেডকোয়ার্টারে,’ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মুভিন। ‘কীভাবে বলছি। এখানে আসার আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার-এর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তাঁর কোয়ার্টারে ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট সুবিধে পাওয়া যাবে। এখন আমি সোজা ওখানে ফিরে যাচ্ছি। ভদ্রলোক যদি জেগে থাকেন তা হলে মোসাদ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করব, মেসেজে বলব তোমার শ্রীমুখের ফটোটা যেন ই-মেইলে এখনই পাঠিয়ে দেয়া হয় আমাকে।’

হাত ঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে বখতিয়ার খিলজি বললেন,

'অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার হার্ট-এর রোগী, মিস্টার মুভিন। ঠিক এগারোটার সময় ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।'

'সেক্ষেত্রে সকালে, একেবারে ফার্স্ট আওয়ারে মেসেজটা পাঠাব আমি,' বলল মুভিন। রানার দিকে তাকিয়ে বেসুরো গলায় হাসল সে। 'ফটোসহ তোমার ডিটেলস পেতে কতক্ষণ লাগবে? নিশ্চয়ই পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি নয়!'

'সেটাই ভাল হবে, সার,' বলল রানা। 'নিজেই তখন বুঝতে পারবেন আপনার ভুলটা কোথায় হচ্ছে।'

'না, আমি কোথাও কোনও ভুল করছি না। এক লাফে তিনটে প্রমোশন পেতে যাচ্ছি, বুঝলে! তা ছাড়া, পুরস্কারের টাকা তো আছেই। তোমাকে জীবিত বা মৃত ধরতে পারলে কত টাকা যেন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল? থাক, তুমি তো বলবে না; ওটা আমি হেডকোয়ার্টার থেকে জেনে নেব।' পুলিশ সুপারের দিকে তাকাল মোসাদ এজেন্ট, জানতে চাইল, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার কথা দিয়েছিলেন তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা করবেন। ভদ্রলোক যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন, রাতটা আমার কাটবে কোথায়, মিস্টার খিলজি?'

'আপনাদের মত মেহমানদের জন্যে আমাদের একটা গেস্ট হাউস আছে,' বললেন পুলিশ সুপার, ট্রাউজারের পকেটে হাত চাপড়ালেন একবার। 'আমার কাছে চাবি আছে। আপনি চিনবেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলারের কোয়ার্টার ও হসপিটালের ঠিক মাঝখানের দালানটাই।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে একটু কষ্ট করে প্রথমে আপনাকে আমার কোয়ার্টারে যেতে হবে। ওখানেই আপনার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ভেরি গুড।' সন্তুষ্ট দেখাল মুভিনকে। তারপর বলল, 'সকালে

আবার এখানে আসার জন্যে আপনাকে আমার দরকার হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন খিলজি। 'সকাল ন'টায় তৈরি হয়ে অপেক্ষা করব আমি,' বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ। চলুন, তা হলে যাওয়া যাক।' চেয়ার ছাড়ল মুভিন। সেল থেকে বেরুবার আগে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল একবার সে। 'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, মাসুদ রানা। তারপর তোমার মাথায় নরক ভেঙে পড়বে, কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমাকে।'

বুধবার ভোর ঠিক পাঁচটায় জানা গেল লেভি মুভিন খুন হয়েছে।

গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার জন্য নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে নেমেছে, চোখে পড়ল গেস্ট রুমের দরজা হাঁ-হাঁ করছে। তার জানা আছে তেল আবিব থেকে আসা একজন গেস্টের থাকার কথা ওই কামরায়। ভদ্রলোক জরুরি কী একটা কাজে এসেছেন, সেটা শেষ করতে রাত গভীর হয়ে যাবে, তাই তার কাছ থেকে কামরাটার চাবি চেয়ে নিয়েছিলেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বখতিয়ার খিলজি।

এখনও ভোর হয়নি, এভাবে কারও দরজা খোলা থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য উঠান পার হয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে টেরেসে, সেখান থেকে কামরাটার সামনে এসে দাঁড়াল কেয়ারটেকার। অন্ধকার ঘর, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বার কয়েক কাশি দিল সে। কিন্তু কারও সাড়া পেল না।

অগত্যা অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেয়াল হাতড়ে আলো জ্বালল কেয়ারটেকার। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল সে।

গেস্ট লেভি মুভিন সিটিং রুমের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে

রয়েছে। আতংকে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো। গলার ফরসা চামড়ায় লালচে-কালো লম্বা দাগ দেখা যাচ্ছে। সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে জিভের ডগা, অত্যন্ত কুৎসিত একটা ভাব এনে দিয়েছে দৃশ্যটায়।

লাশের হাতে এখনও একটা পিস্তল রয়েছে, তবে সেটা থেকে কোনও গুলি হয়েছে কি না বলা মুশকিল। টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটা মেঝের কাছাকাছি নেমে এসে ঝুলছে।

কয়েক পা এগিয়ে ঝুঁকল কেয়ারটেকার। গেস্টের গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ নিল। অনেক আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে লাশ। অন্তত দু'ঘণ্টা আগে খুন হয়েছে লোকটা।

পুলিশ সুপারকে খবর দেওয়ার জন্য ছুটে কামরাটা থেকে বেরিয়ে গেল কেয়ারটেকার।

পাঁচ

কথাতেই তো আছে যে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, খান আল আসকার কারাগারেও ঠিক তাই হতে দেখা গেল।

সকাল ছ'টার মধ্যে জেলখানার ভিতর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, পাঁচিলের ওপারে, অফিসার্স গেস্ট রুমে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। সাড়ে ছ'টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলারকে নিয়ে ডি ব্লক পরিদর্শনে এলেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি। প্রথমেই

সরাসরি ড্যান ব্রাউন আর রানার সেলের সামনে হাজির হলেন তাঁরা।

সেলে রানা আছে, এটা দেখে পুলিশ সুপার যেন খুবই হতাশ হলেন। অন্তত রানার তাই মনে হলো। এরপর তাঁরা সেলের তালাটা বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন। সবশেষে বুড়ো ড্যান ব্রাউনকে সেল থেকে বের করে নিয়ে গেলেন, অন্য কোথাও আলাদা ভাবে জেরা করবেন তাকে।

মিশুক, আশ্চর্য সরল বুড়ো লোকটার সঙ্গে এই কদিনেই দারুণ সখ্য গড়ে উঠেছে রানার। স্ত্রী হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন খাটছে সে। তার পেশা ছিল চাবি বানানো।

ড্যান ব্রাউন খ্রিস্টান হলেও একজন প্যালেস্টাইনী হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক সে। ইয়াসির আরাফাত তারও শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন।

ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ত্রীকে হত্যা করা প্রসঙ্গে কোনও রাখ-ঢাক নেই তার। খুব বেশি ভালবাসতাম, তাই তার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, রানাকে অকপটে জানিয়েছে সে।

চল্লিশটা ঘুমের ট্যাবলেট ভর্তি একটা শিশি কিনে এনেছিল ডিসপেনসারি থেকে। স্ত্রীর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। ট্যাবলেটগুলো গুঁড়ো করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। বিছানায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিল দুজনে। কয়েক ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের খবর দিয়েছে স্ত্রী মারা গেছে। সবাই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। ব্রাউনের ধারণা, তাদেরই কেউ খবর দিয়েছিল পুলিশকে।

পুলিশ জানতে চেয়েছে কীভাবে কী হয়েছে। যা সত্যি তাই বলেছে ব্রাউন। ব্যস, বিচার করে যাবজ্জীবন দিয়ে দিয়েছে

ইজরায়েলি কোর্টের বিচারক। ব্রাউন অবশ্য আপিল করতে পারত, কিন্তু করেনি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবনের আর কোনও অর্থ ছিল না তার কাছে।

নিজের জীবনকাহিনীর প্রায় পুরোটাই রানাকে শুনিয়েছে ব্রাউন। নানা প্রশ্ন করে রানা সম্পর্কেও অনেক কথা জেনে নিয়েছে সে। রানা যা বলেনি, তা-ও বুঝে নিয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে। গত রাতে নিজেই যেচে পড়ে খুলে দিয়েছে তালাটা। রানাও আপত্তি করেনি, এসব কাজে রুমমেটকে জড়িয়ে নিলে সুবিধা, তার তরফ থেকে ভয়ের কিছু থাকে না আর।

আধঘণ্টা পর ফিরে এল বুড়ো ব্রাউন। বত্রিশপাটি দাঁত বের করে হাসছে। 'জিজ্ঞেস করল আপনি সেল থেকে বেরিয়েছিলেন কি না।'

'আপনি কী বললেন?'

'কী আর বলব। ভান করলাম আকাশ থেকে পড়েছি।'

ইঙ্গিতে সেলের গেটটা দেখাল রানা। 'ওদিকে তাকান।'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল বুড়ো ব্রাউন। সুর করে শিস বাজাল সে। 'জিযাস, নতুন তালা! একেই বলেঃ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। কখন বদলাল?'

'আপনি ফিরে আসার দশ মিনিট আগে,' বলল রানা।

অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ব্রাউন, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে শ্লেষাত্মক হাসি লেগে রয়েছে।

'মানে?' একাধারে কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করছে রানা।

'যতবারই বদলাক, এসব তালা খোলা বা লাগানো আমার কাছে ডাল-ভাত,' বলল বুড়ো।

রানাকে সন্দিহান দেখাচ্ছে। 'তাই কি? এটাও খুলতে

পারবেন?'

'দেখতে চান?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বেডসাইড লকার থেকে সাধারণ একটা চামচ বের করল ব্রাউন, ধীর পায়ে হেঁটে তালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত কান পেতে থাকল সে, তারপর একটা হাঁটু গাড়ল মেঝেতে।

প্রায় ছয় বর্গইঞ্চি ইস্পাতের প্লেট দিয়ে ঢাকা তালাটা। চামচের হাতলটা দ্রুত প্লেটের কিনারা ও জ্যাম-এর মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল ব্রাউন। মিনিট কয়েক ঘোরাল ওটা, থামল হঠাৎ ক্লিক করে একটা আওয়াজ হতে। 'তালা খুলে দিয়েছি, আপনি বেরিয়ে যেতে পারেন,' সহাস্যে বলল সে।

'বেরুবার ইচ্ছে থাকলে কেউ ফিরে আসে?' ফিসফিস করল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'ফিরে এসেছি, কারণ কারও সাহায্য ছাড়া এই এলাকা থেকে পালানো সম্ভব নয়।' একটু থেমে আবার বলল, 'তবে আপনি সত্যি আমাকে হতবাক করে দিয়েছেন। এরকম একটা জাদু জানার পরও কী কারণে বারোটা বছর জেলে কাটালেন বলুন তো?'

হাসল বুড়ো। 'এই জেল থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে হলে তিনটে বাধা টপকাতে হবে,' বলল সে। 'প্রথম বাধা, তালা খোলা। দ্বিতীয় বাধা, জেলখানার বাইরে বেরুনো। তৃতীয় বাধা, এলাকা ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া। আমি মাত্র একটা বাধা দূর করতে পারি, প্রথমটা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমিও তাই,' বলল ও।

তালাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে নিজের বেডে ফিরে এল ব্রাউন। রানার দিকে সিগারেটের একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল। 'এখান থেকে রওনা হয়ে উঠানে পৌঁছাতে হলে আরও অন্তত চারটে তালা

খুলতে হবে। প্রায় প্রতিটি গেটে পাহারা আছে। শুধু একটা চামচ দিয়ে কাজ হবে না। জানি না কীভাবে আপনি...'

'ভাগ্য সহায়তা করলে যে-কোনও কঠিন কাজও পানির মত সহজ হয়ে যায়,' বলল রানা। 'এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।'

দ্রুত একটা হাত তুলে মাথা নাড়ল ব্রাউন। 'নাহ্! আমার না জানাটাই আপনার জন্যে নিরাপদ।'

আজ একটু বেশি বেলা করে কয়লাখনিতে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। লাঞ্চ আওয়ারে ফেরার সময় শুনল তেতলার ডি-র বদলে চারতলার বি-ব্লকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের দুজনকে। ব্যাপারটার বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে বলে মনে হলো না রানার, কারণ খবর নিতে গিয়ে জানতে পারল একা শুধু ওদেরকে নয়, আরও অনেক কয়েদিকেই এক সেল থেকে সরিয়ে অন্য সেলে পাঠানো হয়েছে।

সেদিন বিকেলের দিকে আরও খবর কানে এল রানার: একজন প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার ও পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজিও আছেন। কমিটির কাজ হবে লেভি মুভিন হত্যাকান্ডের সঙ্গে কারাগারের কোনও কয়েদি, বিশেষ করে আবিল আহুদ কোনওভাবে জড়িত কি না খতিয়ে দেখা।

কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এক হপ্তার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

রানা ভাবল, আশা করা যায় এই কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মোসাদ আর কাউকে খান আল আসকারে পাঠাবে না। যা করার তার আগেই করতে হবে ওকে। তবে এখনও কোনও ধারণাই নেই, কী করার আছে ওর। জেলের বাইরে বেরুনো আর

এলাকা ছেড়ে নিরাপদে দূরে সরে যাওয়া, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সমস্যা। শেষ সমস্যাটার কোনও সমাধান জানা নেই ওর।

পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা কয়লাখনি থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা, করিডর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। কয়েক সেকেন্ড পর হেড কনস্টেবল ওদের সেলের সামনে এসে দাঁড়াল, সঙ্গে দুজন সশস্ত্র সিপাই রয়েছে। তাদের একজন তালা খুলল। হেড কনস্টেবল বলল, 'আবিল আহুদ, বেরিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কে, নাম কী?'

'জেফার টমসন নামে এক উকিল, তেল আবিব থেকে আসছেন। আপিল না কী একটা ব্যাপারে কথা বলতে চান।'

আধঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করার পর ভিজিটিং রুমে ঢোকার সুযোগ পেল রানা। ডিউটি অফিসার ভিতরে নিয়ে এসে ছোট্ট কিউবিকল-এ বসাল ওকে। দু'পাশের কিউবিকল থেকে ভোঁতা ও দুর্বোধ্য কথাবার্তা ভেসে আসছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মিনিট দুয়েক পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জেফার টমসন।

প্রথমেই নজর কেড়ে নিল প্রজাপতি আকৃতির গোঁফ জোড়া। ছোটখাট একজন লোক, চোখে-মুখে ধূর্ত ভাব। তবে অস্পষ্ট ডোরাকাটা কাপড়ের সুটটার ছাঁটকাট চমৎকার। মাথায় বোলার হ্যাট পরেছে। হাতে ব্রিফকেস।

বসল লোকটা, তার দিয়ে তৈরি জাল-এর ওদিক থেকে রানার চোখে চোখ রেখে হাসল। 'আপনি আমাকে চিনবেন না, মিস্টার আল শাহরিয়ার। আমি জেফার টমসন, পিএলও-র একজন অফিশিয়াল লইয়ার।'

'শুনলাম,' বলল রানা। ভাবল, আমার আসল পরিচয় জানানো হয়নি লোকটাকে। 'কে পাঠিয়েছে আপনাকে?'

'খাদেমুল দাউদ।'

এক মুহূর্ত পর রানা বলল, 'কিন্তু তাঁর পাঠানো মেসেজে বলা হয়েছে, তৈয়বিয়া অ্যান্ড ব্রাদার্স-এর ওয়্যারহাউস থেকে আলাউয়ি নামে এক লোক আমাকে নিতে আসবে।'

'আপনি ধরা পড়ে যাওয়ায় ওই প্ল্যান বাতিল হয়ে গেছে,' জানাল টমসন।

'দাদু তা হলে সব খবরই রাখছেন? তিনিই পাঠালেন আপনাকে?'

'সরাসরি নয়,' ক্ষীণ একটু হাসল টমসন। 'তাঁর গর্দান নেয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে ইজরায়েলি সরকার। তেল আবিবের কাছে কোথাও একটা সেফ হাউসে লুকিয়ে আছেন তিনি। বেশ অনেকদিন থেকেই একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে না। পরিস্থিতিই তাঁকে এরকম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে। সংগঠন হিসেবে পিএলও প্রায় শেষ, টাকা খেয়ে ইজরায়েল ও আমেরিকার হয়ে কাজ করছে নেতা-কর্মীরা। তাদেরকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আরেকদিকে হামাস তাঁকে খুন করবে বলে খুঁজছে, অতীতে তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন বলে। আমি মাত্র একবার তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাও তেল আবিবের ওদিকটায় নয়। তারপর থেকে যোগাযোগ রাখছি আরেকজনের ঠিকানার মাধ্যমে – কখনও কুরিয়ার সার্ভিসে, কখনও মোবাইল ফোনে।'

'কেন এসেছেন আপনি? আমাকে তো বলা হয়েছে কেসটা আপিলযোগ্য নয়।'

'না, তা নয়। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে জর্দান থেকে ইজরায়েলে ঢুকে ধরা পড়ে গেছেন আপনি, কাজেই আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করছেন তিনি।'

'কীভাবে?'

'আল মোস্তফা নামে এক কয়েদি মাস তিনেক আগে এখান থেকে ছাড়া পেয়েছে,' বলল টমসন। 'তার বড় ভাই ঠিকাদার, এদিককার কয়লা পরিবহন করে, সেই সূত্রে এদিকে আসা-যাওয়া আছে মোস্তফার। কোনও এক লোকের মাধ্যমে তার কাছ থেকে কাল রাতে ইন্টারেস্টিং একটা খবর পেয়েছেন দাদু। খবরটা হলো, মোসাদের একজন এজেন্ট আপনাকে ইন্টারোগেশন করতে এসে অফিসার্স কোয়ার্টারে খুন হয়ে গেছে। দাদুকে ধারণা দেয়া হয়েছে, জেল থেকে বেরিয়ে আপনিই কাজটা করেছেন।'

হ্যাঁ বা না, কিছুই বলছে না রানা। 'এই কয়েদিটা কে? আল মোস্তফা?' জানতে চাইল ও।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে টমসন বলল, 'তার সম্পর্কে বেশি কিছু আমি জানি না।'

'এটা তো জানেন কী অপরাধে জেল খাটছিল?' একটু কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'তা জানি,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল টমসন। 'ছিনতাই করে ধরা পড়েছিল।'

'আপনারা আর লোক পেলেন না?'

কাঁধ ঝাঁকাল উকিল। 'মোস্তফা এখন ভাল হয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন না, তা না হলে কী ইজরায়েলিরা তাকে এরকম একটা স্পর্শকাতর জায়গায় আসা-যাওয়া করতে দেয়?'

রানার ঠোঁটে তিক্ত হাসি। 'ভাল কাদের কাছে?'

‘নিশ্চয়ই পিএলও-র কাছেও, তা না হলে কি দাদু তাকে এই কাজের দায়িত্ব দিতেন?’

‘হুঁ।’

‘কথাটা কি সত্যি?’ এই প্রথম টমসনের কণ্ঠস্বরে জরুরি তাগাদার সুর শোনা গেল। ‘এখান থেকে বেরুবার পথ জানা আছে আপনার?’

‘যদি থাকে?’

‘তা হলে বাকিটা দাদুর নির্দেশ মোতাবেক করা হবে, কেউ একজন এই এলাকা থেকে বের করে নিয়ে যাবে আপনাকে।’

‘কীভাবে করবে সেটা?’

সামনের দিকে ঝুঁকে আরও কাছাকাছি হলো পিএলও-র অফিশিয়াল উকিল। ‘আপনাকে তো কোয়ারি-তে ইতিমধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই না? নদী ও খনির মাঝখানে টিনের শেডগুলো দেখেছেন নিশ্চয়ই?’

‘দেখেছি।’

‘ওগুলোর পেছনে রেললাইন আছে, তাতে কয়লা ভর্তি ট্রেলি ও ওয়্যাগন চলে।’

‘আমাকে কী করতে হবে?’

‘সেটা নির্ভর করবে জেল থেকে কখন আপনি বেরুতে পারবেন তার ওপর,’ বলল টমসন। ‘যদি ভোর হবার অনেক আগে টিনশেডের পিছনে পৌঁছাতে পারেন তা হলে তখনই আপনাকে একটা ওয়্যাগনে তুলে দেয়া হবে। আপনার জন্যে একটা ওয়্যাগন আলাদা করে রাখা হবে, তাতে একটা ইস্পাতের ট্রে থাকবে – ট্রের নীচে থাকবেন আপনি, উপরে কয়লা। সারা রাতই কয়লা পরিবহনের কাজ চলে, তেমন কোনও পাহারাও

থাকে না, কাজেই কোনও সমস্যা হবার কথা নয়। ওয়্যাগন থেকে আপনাকে বের করা হবে দশ মাইল দূরে, একটা কয়লার ডিপোয়।’

‘আর যদি এখান থেকে আমার বেরুতে দেরি হয়ে যায়?’ জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল টমসন। ‘সেক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে হবে। কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবেন আপনি, সকাল সাড়ে সাতটায় দেখবেন কয়লাখনির দিকে মিছিলের মত যাচ্ছে কয়েদিরা। আড়াল থেকে বেরিয়ে স্রেফ মিশে যাবেন তাদের ভিড়ে। বেশ কিছু কয়েদি টিনশেডের দিকে কাজ করতে যাবে, আপনিও যাবেন তাদের সঙ্গে। এখানে ভাগ্য আপনাকে নিয়ে খেলবে। তাদের কেউ আপনাকে চিনে ফেললে কী ঘটবে বলা মুশকিল।’

‘ধরুন চিনল না, তারপর?’

‘মোস্তফার লোক বিশজন কয়েদিকে কয়লার ডিপোতে নিয়ে যাবে, তাদের সঙ্গে আপনিও থাকবেন।’

‘মোস্তফার লোক আমাকে চিনবে কীভাবে?’

‘আপনার শার্টের কলার খাড়া করা থাকবে।’

‘আমি তাকে চিনব কীভাবে?’

‘তার গায়ে কালো শার্ট থাকবে।’

‘তারপর?’

‘লাঞ্চ আওয়ারে সবাই ফিরলেও, আপনি ওই ডিপোয় রয়ে যাবেন। পরে সময় ও সুযোগমত ওখান থেকে নিরাপদে সরে যাবার পথ দেখিয়ে দেয়া হবে আপনাকে,’ বলল টমসন। ‘জলাভূমি আর ব্রিজ পেরুবার পর পাথরের তৈরি একটা বাড়ি পাবেন। সেখানে পুলিশের একটা জিপ লুকানো আছে। গাড়িটা

অনেক আগে চুরি করা হয়েছে, তবে নাম্বার প্লেটটা নতুন। পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম, কাগজ-পত্র এসবও পাবেন।'

'আর্মস?' জানতে চাইল রানা।

'একান্ত দরকার?'

'বলেন কী! একজন পুলিশ অফিসারের কাছে অস্ত্র থাকবে না?'

'কিন্তু আপনি তো ভুয়া পুলিশ অফিসার।'

'সেজন্যেই তো আরও বেশি দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকাল উকিল। 'মোস্তফার জন্যে কাজটা খুব কঠিন হবে। ঠিক আছে, যেভাবে হোক ম্যানেজ করতে হবে তাকে। ঠিক কী ধরনের অস্ত্র চান আপনি?'

'পিস্তল, ওয়ালথার পিপি হলে ভাল হয়,' বলল রানা। 'ও জিনিস ইজরায়েলি অনেক পুলিশই ব্যবহার করে।'

'ঠিক আছে। আর কিছু?'

'একটা ব্রিফকেস।'

'বেশ।'

'তারপর? পুলিশ সেজে ওখান থেকে কোথায় যাব আমি?' জানতে চাইল রানা।

'মোস্তফাকে সমস্ত নির্দেশ দেয়া আছে। ওগুলো জানার পর দাদুর কাছে পৌঁছাতে আপনার কোনও সমস্যা হবে না। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

চিন্তা করছে রানা। পরিস্থিতি মোটেও সুবিধের নয়। একজন ছিনতাইকারীর হাতে তুলে দিতে হবে নিজেকে। টমসনকেও নিরেট নয়, বরং খুবই ফাঁপা একজন লোক বলে মনে হচ্ছে। তবে এ-ও ঠিক যে, বাছ-বিচার করার সুযোগ নেই ওর।

‘কী ঠিক করলেন?’ জানতে চাইল পি.এল.ও-র উকিল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘ঠিক আছে। রেডি হতে কতক্ষণ সময় নেবে মোস্তফা?’

‘সে এখনই রেডি,’ বলল উকিল। ‘আমার ধারণা, আপনিও সময় নষ্ট করতে চান না। এ তো জানা কথা যে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে মোসাদ।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। ‘তা হলে রোববারে।’

‘বেশ,’ বলল টমসন। ‘বিশেষ কোনও কারণ আছে, মিস্টার শাহরিয়ার?’

‘ছ’টায় সন্ধে হলেও রোববারে আমাদের উইং-এ তালা দেয়া হয় সাড়ে ছ’টায়,’ বলল রানা। ‘ওই সময় থেকে মাত্র একজন অফিসার ডিউটি দেয় সেন্ট্রাল হলে, বাকি সবাই টিভি দেখতে চলে যায় মেসে। ডিউটি মানে মাঝে-মধ্যে ব্লকগুলো চেক করা। তার মানে, পালাবার সময় আমি যদি ধরা না পড়ি, সকাল সাতটায় সেল খুলতে আসার আগে কেউ জানতে পারবে না আমি পালিয়েছি।’

‘কথাটায় যুক্তি আছে,’ বলল টমসন। খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল, ‘আচ্ছা, সত্যি বেরুতে পারবেন তো?’

হাসল রানা। ‘এতদিনে নিশ্চয়ই আপনার বোঝার কথা, জীবনের কোনও কিছুতেই নিশ্চয়তা নেই, মিস্টার টমসন।’

‘মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার শাহরিয়ার।’ টেবিল থেকে হ্যাট ও ব্রিফকেস তুলে নিয়ে চেয়ারটা পিছনে সরাল টমসন। ‘আর কিছু আলোচনা করার নেই। অপেক্ষায় থাকব সোমবারের পত্রিকায় কী ছাপা হয় দেখার জন্যে।’

‘আমিও।’

সেলে ফিরে রানা দেখল টেবিলে দুপুরের খাবার সাজাচ্ছে ব্রাউন। ওকে দেখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'বিষয়টা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছুই বলবে না বুড়োকে। বলা মানেই লোকটার বিপদে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করা। 'উপকার করার ছলে আসলে এক ডাকাত এসেছে। বলছে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আপিল করিয়ে দেবে, কিন্তু সেজন্যে এক লাখ মার্কিন ডলার দিতে হবে তাকে, পঞ্চাশ হাজার অগ্রিম।'

'এদেরকে গুলি করে মারা উচিত,' বলল ব্রাউন। 'বিপদগ্রস্ত মানুষের গলায় ছুরি চালাবার ওস্তাদ!'

'বাদ দিন,' বলে হাত ধুয়ে খেতে বসল রানা।

ছয়

এসে গেল রোববার।

ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিক পর নীচতলার ইস্পাতের গেটে তালা লাগানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। তার মানে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বাজে। জানালার দিকে পিছন ফিরল ও, টান টান নিঃশব্দ হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ঠিক আজ রাতেই বৃষ্টি হতে হবে!'

বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে ব্রাউন। এক কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে। 'কেন বলুন তো?'

এগিয়ে এসে তার পাশে বসল রানা, শান্ত সুরে বলল, 'আজও আমি বেরুচ্ছি, মিস্টার ব্রাউন। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো?'

'আবার জিজ্ঞেস করছেন!' বিস্মিত দেখাল বুড়োকে। 'আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছি।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ব্রাউন।'

'এবার তো আর ফিরবেন না আপনি, মিস্টার শাহরিয়ার?' জিজ্ঞেস করল ব্রাউন।

'না।'

সামান্য নার্ভাস দেখাচ্ছে ব্রাউনকে। 'জেরার জবাবে কী বলব আমি?'

'কিছু বলতে হবে না, ওরাই বুঝে নেবে,' বলে হাসল রানা। 'সকালে ওরা এসে আপনার চাদর সরিয়ে দেখবে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন আপনি, মুখে কাপড় গোঁজা। আমি কীভাবে তালা খুলে কখন বেরিয়ে গেছি জানেন না।'

'ঠিক আছে।' স্বস্তি ফুটল ওর চেহারায়।

নিজের বিছানার তোষক একটু উঁচু করল রানা। ওটার গায়ে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, তাতে হাত ভরে ভিতর থেকে টেনে আনল কুণ্ডলী পাকানো দুই প্রস্থ নাইলনের রশি ও স্ন্যাপ লিঙ্ক সহ একটা স্লিং – এরকম স্লিং পাহাড়ে চড়ার সময় ক্লাইম্বাররা ব্যবহার করে।

'এ-সব আপনি পেলেন কোথায়?' জানতে চাইল ব্রাউন।

'পাহাড়ের গায়ে চার্জ ফিট করার সময় এগুলো ব্যবহার করে

ওরা।’ সরু হাতলওয়ালা একটা স্ক্রুড্রাইভার ও একজোড়া ওয়ায়্যার-কাটার বের করে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল রানা। ‘আর এগুলো এসেছে মেশিনশপ থেকে, ওখানে একটা কাজে পাঠানো হয়েছিল আমাকে।’ বুড়োকে চামচ বের করতে দেখে রানা বলল, ‘জাদুটা এবার আমি দেখাব। আমার শেডিউল খুব টাইট।’

এক প্রস্থ নাইলন রশি দিয়ে বুড়োকে খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতে গিয়ে লক্ষ করল রানা, লোকটার হাত সামান্য কাঁপছে, তবে সেটা বয়সের কারণেও হতে পারে। মুখে কাপড় গোঁজার আগে শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করল, ‘যাবেন, আঙ্কেল, আমার সঙ্গে?’

ম্লান হেসে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। ‘যাও, বাবা,’ ফিসফিস করল বুড়ো। ‘প্রার্থনা করি, যিশু তোমাকে সাহায্য করবেন।’

সাদা চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিল রানা লোকটাকে। ঠিক পাঁচ সেকেন্ড পরেই নরম আওয়াজটা শোনা গেল – ক্লিক।

দ্রুত হাতে নিজের লকার থেকে কিছু কাপড় বের করল রানা, তারপর বালিশের সাহায্যে চাদরের তলায় মানুষের একটা আকৃতি তৈরি করল। কাজটা শেষ করে গেটের দিকে এগোল ও।

ধীরে ধীরে গেট খুলছে রানা, যাতে কোনও শব্দ না হয়। সেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল নিস্তেজ আলোয় করিডর ফাঁকা পড়ে আছে। দেয়ালের ছায়া ঘেঁষে নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও।

সামনে বাঁক, তারপর মেইন করিডর। প্রথমে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। কেউ নেই। বাঁক ঘুরে নিঃশব্দ পায়ে এগোল। মেইন করিডরের শেষমাথা শক্ত তারের জাল দিয়ে আটকানো, কেউ কোথাও নেই। কোনও আওয়াজও হচ্ছে না।

কীভাবে কী করবে, আরেকবার ভেবে নিল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল আল আসকার কারাগারের ভিতরদিকের নকশাটা।

ঠিক মাঝখানটায় পঞ্চাশ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার মস্ত একটা সেন্ট্রাল হল, একশো ফুট উপর থেকে দেখায় গভীর একটা কূপের মত। সেটা ঘিরে প্রতিটি তলায় আটটা করে প্রিজন-সেলের ব্লক। নিরাপত্তার কারণে ইস্পাতের তৈরি টানা জাল দিয়ে প্রতিটি সেল-ব্লককে আলাদা করা হয়েছে সেন্ট্রাল হল থেকে।

নীচতলার প্রতিটি সেল ব্লক-এর মুখে একটা করে প্রকাণ্ড গেট আছে, ইস্পাতের পুরু পাত দিয়ে তৈরি। স্টিল ফেন্সের ফাঁক দিয়ে চাইলে সেন্ট্রাল হলের একশো ফুট উঁচু ছাদটা দেখা যায়, লোহার ফ্রেমের উপর বসানো রয়েছে ইস্পাত দিয়ে তৈরি গম্বুজ।

অর্থাৎ, নীচতলার ওই একটিমাত্র গেট না খুলে সেন্ট্রাল হল-এ ঢোকার কোনও উপায় নেই। গেট না খুলে ঢুকতে হলে ইস্পাতের জাল কাটতে হবে।

এই মুহূর্তে ঠিক তাই করতে যাচ্ছে রানা। কেউ কোথাও নেই দেখে জালের কাছে এসে দাঁড়াল।

বিশাল সেন্ট্রাল হল-এ একটা মাত্র বালব জ্বলছে। ওর মাথার বারো ফুট উপর সিলিং। জালটা ধরল রানা। মাকড়সার মত উঠে যাচ্ছে ওপরে।

সিলিঙের কাছে পৌঁছে থামল রানা। স্লিং-এর হুক ইস্পাতের জালের সঙ্গে আটকাল, তারপর রশিটা কোমরে জড়িয়ে গিঁঠ দিল। এবার বের করল ওয়ায়্যার কাটার।

তিনদিকের জাল কেটে দুই ফুট বাই দুই ফুট একটা ফাঁক তৈরি করল রানা। জালটা উপর দিকে ভাঁজ করে ফাঁক গলে

বেরিয়ে গেল ওপারে। আবার নিজেকে জালের সঙ্গে আটকে নিল রানা। কাটা জাল জায়গামত বসাচ্ছে, লক্ষ রাখছে প্রতিটি লিঙ্ক যেন খাপে খাপে মেলে, যাতে শুধু খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে যে এটা কাটা হয়েছিল।

আগের বার ডি ব্লক থেকে বেরিয়েছিল রানা, সেটা সেন্ট্রাল হল-এর উল্টোদিকে। ওখানকার জালও কাটা হয়েছে, তবে কাছ থেকে পরীক্ষা না করায় এখনও ধরা পড়েনি। ধরা পড়লে হইচই শুরু হয়ে যেত, তদন্ত কমিটি নির্দেশ দিত ডি ব্লকের কয়েদি আবিল আহুদকে হাতকড়া পরিয়ে সলিটারি সেলে ভরো।

জাল কেটে বেরিয়ে রানা এখন সেন্ট্রাল হল-এর ভিতরদিকে রয়েছে, ওর পঞ্চাশ ফুট নীচে সেন্ট্রাল হল-এর মেঝে, মাথার দিকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে গম্বুজ আকৃতির ছাদ।

ইস্পাতের একটা দরজা ঝনঝন করে উঠল। নীচে তাকাতে জেলার আর হেড কনস্টেবলকে দেখতে পেল রানা – আলোর উপর দিয়ে হেঁটে ডেস্কের দিকে এগোচ্ছে দুজন। নিচু গলায় কথা বলছে, তবে বুঝতে পারার মত পরিষ্কার নয়। নাইট বুকে কিছু লিখল ডিউটি অফিসার। হল পেরুবার সময় কী নিয়ে যেন হেসে উঠল দুজনেই। একটা দরজার তালা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওই পথে গার্ডরুমে যাওয়া যায়।

আবার নীরব হয়ে গেল পরিবেশ। জাল বেয়ে সাবধানে উপরে উঠছে রানা, একের পর এক ফ্লোরগুলো পেরোবার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে কেউ কোথাও আছে কি না। ওর গন্তব্য সেন্ট্রাল হল-এর উল্টোদিক, অর্থাৎ ডি ব্লক।

উপরের অন্ধকার ঢেকে ফেলছে রানাকে, সেই সঙ্গে নীচের আলোটা ক্রমশ ওর কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। কয়েক

মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছে গেল ও – গম্বুজের বাঁক যেখান থেকে শুরু তার ঠিক আড়াই ফুট নীচে শেষ হয়েছে ইস্পাতের জাল। ওখানেই বসানো রয়েছে আটটা ব্লকের আটটা ভেন্টিলেশন গ্রিল। প্রতিটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দুই ফুট। প্রতিটি শাফট পরস্পর সংযুক্ত।

ডি ব্লকের গ্রিলটাকে দেয়ালের সঙ্গে জায়গামত আটকে রেখেছে বড় আকারের দুটো স্ক্রু। ঝুলন্ত শরীরটাকে আবার জালের সঙ্গে আটকে নিয়ে স্ক্রুড্রাইভার বের করল রানা, দ্রুত হাত দিল কাজে।

স্ক্রুদুটো সহজেই ঢিল হলো। একটা শুধু আংশিক খুলল রানা – গ্রিলটা যাতে ঝুলে পড়ে, আবার ভিতরে ঢোকার পথে বাধা না হয়।

এখন সবচেয়ে কঠিন সময়। জালটা একহাতে শক্ত করে ধরে হুকটা সাবধানে খুলল ও, অপর হাতে ধরল ভেন্টিলেশন শাফটের কিনারা। এবার একটা পা তুলল শাফটের ভিতর, তারপর দ্বিতীয়টা। পিছু নিল ওর শরীরও।

শাফটের ভিতর দিকে জিঙ্ক-এর লাইনিং আছে।

শুকনো ধুলো উড়ে এসে নাকে ঢুকল, কেশে ওঠার ঝোঁকটাকে কোনও রকমে চাপল রানা। উপুড় হয়ে গ্রিলটাকে ধরে তুলল আগের জায়গায়। সরু ফাঁক দিয়ে হাত বের করে খোলা স্ক্রুটা জায়গামত ঢোকাল, ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে।

অন্ধকারে পিছু হটছে রানা। চোখ ও গলায় ধুলো ঢুকছে, ঘাম গড়াচ্ছে জুলফি বেয়ে। এগোবার গতি মন্থর, তবে থামছে না একবারও। কিছুক্ষণ পর আরেকটা খোলা মুখ-এ পৌঁছাল। এটার ভেতর ঢুকল প্রথমে মাথা দিয়ে, অল্প ঢালু একটা শাফট বেয়ে নীচে নামছে – নামার গতি কমাবার জন্য হাত দুটো শাফটের দু'পাশে

চেপে রেখেছে।

সাবধানে বেশ কিছুটা নেমে এসে থামল রানা। এদিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার, আলোর কণামাত্র নেই কোথাও। যেন একটা কফিনে রয়েছে। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আবার সামনে এগোল।

একটা সাইড শাফটকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। সামনে পড়ল আরেকটা। থামল এখানে। ছ'টা ছিল, নাকি সাতটা? না, রশি বেয়ে ফার্স্ট লেভেলে নামবার আগে ছ'টা সাইড শাফটকে পাশ কাটাতে হয়েছিল।

দালানটা তৈরি হওয়ার পর বহুবছর পার হয়ে গেছে, তাই ক্ষয়ে বা ভেঙে যাওয়ায় অনেক কিছুই এটার বদলাতে হয়েছে। তাওহিদার দেওয়া ডিটেল প্ল্যানটা সেজন্যই একেবারে নিখুঁত ছিল না। অন্তত দু'বার ভুল পথ ধরে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর সামনে গ্রিল পায়নি ও, পেয়েছে নিরেট পাঁচিল। ফলে পিছু হটে ফিরে আসতে হয়েছে আগের জায়গায়, শাফটের অন্য একটা শাখা ধরে এগোতে হয়েছে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য, যে শাখাটা তাওহিদার নকশায় ছিলই না।

ক'টা শাফটকে পাশ কাটাল হিসাব রাখছে রানা। থামল বাঁ দিকেরটায় পৌঁছে। ডান পাশটা হাতড়াল ও, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল সাপোর্টিং ব্র্যাকেটটা। অবলম্বন হিসাবে ব্যবহারের জন্য গায়ের জোরে দেয়াল থেকে খসিয়ে এনেছিল গতবার। শরীরটাকে খানিকটা সামনে ঠেলে দিয়ে একটু কসরত করতে হলো, যাতে গর্তটার ভিতরে প্রথমে পা দিয়ে ঢোকা যায়।

ভিতরে ঢোকার পর নাইলন রশিটার কুণ্ডলী খুলল রানা, সেটার একমাথা দেয়াল থেকে খসানো ব্র্যাকেটের ওপর দিয়ে

ঘুরিয়ে আনল। এবার দুটো রশি দুই হাতে ধরে শাফটের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে নামছে। ত্রিশ ফুট নীচে সরল রেখার মত হয়ে গেছে ওটা। পিছু হটে নামল সেখানে, একহাতের রশি টেনে নিয়ে কুণ্ডলী পাকাল।

কয়েক জায়গায় আলো দেখা যাচ্ছে। একটা গ্রিল-এ থেমে নীচে তাকাল। মেইন কিচেন দেখতে পাচ্ছে। আলো জ্বললেও, ভিতরে কেউ নেই। আবার এগোল রানা, খানিক পর বেরিয়ে এল একটু বড় শাফটে। শরীরটাকে মুচড়ে বাঁক ঘুরল, হাত ও হাঁটুর সাহায্যে সামনে এগোচ্ছে।

সেন্ট্রাল ব্লকের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে রানা, সেল ছেড়ে বেরুবার পর সম্ভবত চল্লিশ মিনিট পার হয়েছে। এগোবার গতি বাড়াল ও। মিনিট দুয়েক পর চওড়া একটা শাফটের তলায় পৌঁছাল। ওর মাথার উপর খাড়া হয়ে আছে ওটা, বিভিন্ন লেভেলে গ্রিল থেকে ভিতরে ঢোকা হলদেটে আলো দেখা যাচ্ছে।

শাফটের জিঙ্ক লাইনিং-কে জায়গামত ধরে রেখেছে স্টিল ব্রাকেটের নেটওঅর্ক, পাদানি হিসাবে খুব কাজ দিচ্ছে। দ্রুত উঠছে রানা। একেবারে মাথায় উঠে একটা সাইড শাফটে পৌঁছাতে চাইছে ও। ছাদের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে উঠান পেরিয়েছে সেটা, তারপর উল্টোদিকের হাসপাতালের দিকে চলে গেছে।

জোরাল বাতাস পাচ্ছে রানা। বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল কেমন শোঁ-শোঁ আওয়াজ। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। এখানে তো কোনও রকম আওয়াজ হওয়ার কথা নয়! হার্টবিট বেড়ে গেল ওর।

কয়েক মিনিট পর শাফটের মাথায় পৌঁছাল রানা। সবচেয়ে খারাপ যেটা ভয় করেছিল, সেটাই দেখতে পাচ্ছে। গতবার, মাত্র

কদিন আগে, যেখানে শুধু হসপিটাল লিঙ্ক-এ ঢোকার প্রবেশমুখ ছিল, এখন সেখানে মেটাল গ্রিল শোভা পাচ্ছে – ভিতরে ঘুরছে একটা এগযস্ট ফ্যান।

ওখানে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রানা, গ্রিলের কিনারায় এক হাতের আঙুল বুলাচ্ছে, জানে এখানে কিছু করার নেই ওর।

নামবার সময় প্রথম যে গ্রিলটা পড়ল সেটা মাত্র একফুট চওড়া। পরেরটা দুইফুট হতে পারে, খুব আঁটসাঁট হলেও ভিতরে ঢোকা সম্ভব। নির্জন একটা করিডর দেখতে পাচ্ছে রানা, নিস্তেজ আলো জ্বলছে। মনে পড়ল, এদিকটায় ব্যাচেলার অফিসাররা থাকে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর স্ক্রুড্রাইভার বের করে গ্রিল খোলায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাড়া শাফট ধরে খানিকটা উপরে উঠতে হলো ওকে, যাতে সদ্য তৈরি ফাঁকটার ভিতর প্রথমে পা দুটো ঢোকাতে পারে। জায়গা খুব কম, গ্রিল গলে সাতফুট নীচের প্যাসেজে নামবার সময় ডোরাকাটা শার্ট ছিঁড়ে গেল খানিকটা। বিড়ালের মত নিঃশব্দে নামল রানা।

চট্ করে সিধে হয়ে মাথার উপর হাত তুলে গ্রিলটাকে দ্রুত জায়গামত আটকে দিল। প্যাসেজ ধরে সাবধানে এগোচ্ছে। টেলিভিশন চলছে কোথাও, নারীকণ্ঠের মিষ্টি আরবী গানের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল কয়েকজনের সম্মিলিত হাসি, খুব বেশি দূর নয়।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তে ব্যালকনি। উঁকি দিয়ে রেলিং-এর নীচে তাকাল রানা। ঝমঝম বৃষ্টি। ত্রিশ ফুট নীচে বৃষ্টির মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে জেলখানার স্পাইক লাগানো আউটার ওয়াল-এর মাথা। জেলখানার দেয়াল থেকে পনেরো ফুট দূরে।

নাইলন রশির কুণ্ডলী খুলল রানা, একটা প্রান্ত রেলিঙের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দু'হাতে ধরল। রশি ছাড়তে ছাড়তে নীচে নামছে। পঁচিশ ফুট নেমে দেয়ালে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দোল খেতে শুরু করল। ঝুলের দৈর্ঘ্য বাড়ছে ক্রমে।

তারপর পৌঁছে গেল রানা। সাবধানে দাঁড়াল আউটার ওয়ালের ওপর। চট্ করে বসে পড়ে ধরে ফেলল একটা স্পাইক। টেনে খসিয়ে আনল রশি। এইবার মরচে ধরা স্পাইকে ওটা জড়িয়ে খুব সহজেই চলে এলো জেল কম্পাউন্ডের বাইরে।

বন্ধুর কাজ করছে অন্ধকার। পাঁচ মিনিট পর ঢাল বেয়ে উপত্যকার মাথায় উঠে এসে থামল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল। দূরে, অনেকটা নীচে জেলখানাটা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় দানবের মত ওত পেতে আছে অন্ধকারে, এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে দু'একটা হলদেটে ম্লান আলোর বিন্দু।

আবার ঘুরে হনহন করে এগোল রানা। আকাশে মেঘ, হাতেও ঘড়ি নেই, বুঝতে পারছে না রাত কত হলো। আন্দাজ করল সেল থেকে বেরুবার পর আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। কোয়ারিতে যেতে আরও পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে ওর। তারপর, ওখান থেকে কয়লাখনি ও নদীর মাঝামাঝি পৌঁছাতে হবে।

বিশ মিনিটের মধ্যে টিনশেডগুলোর কাছে চলে এল রানা। ছেড়ে গিয়েছিল, আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টিটা। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল এক সারি পোলের উপর শেড পরানো বালব জ্বললেও, আশপাশে না আছে কোনও লোকজন, না কোনও ট্রলি বা ওয়্যাগনের আসা-যাওয়া। ওর সামনের বৃত্তাকার রেললাইনে বেশ কিছু ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে থাকলেও, কোথাও কোনও ইঞ্জিন দেখা

যাচ্ছে না। ওদিকটায় কয়লার স্তূপ ও মাথায় আলোসহ মাঝারি আকারের একটা ক্রেন দেখা গেলেও, কোথাও কিছু নড়ছে না। কী ব্যাপার, প্ল্যানটা কেঁচে গেল নাকি?

তারপর কান পাতল রানা। একটা ট্রেন আসছে। আওয়াজটা ক্রমশ জোরালো হলেও, হেডলাইট জ্বলছে না। আরও খানিক পর ওটাকে দেখতে পেল রানা। কোনও ওয়্যাগন নেই, শুধু ইঞ্জিনটা আসছে। আলোকিত ইঞ্জিনরুমের দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পরনে ওটা কালো শার্ট না? টিনশেডগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন।

অপেক্ষা করছে রানা। হি-হি করছে ঠাণ্ডায়।

অপেক্ষা করছে লোকটাও।

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্রেনের কাছাকাছি পৌঁছেছে, ইঞ্জিনরুমের দরজায় দাঁড়ানো লোকটা ওকে লক্ষ করে ছোট্ট করে শুধু একবার মাথা ঝাঁকাল, তারপর ইঙ্গিতে ওকে অপেক্ষা করতে বলে ট্রেন থেকে নেমে টিনশেডের দিকে চলে গেল।

খানিক পর রানা দেখল সাইড লাইন দিয়ে একটা ওয়্যাগন ঠেলে আনছে লোকটা। দ্রুত হাত চালিয়ে ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া লাগাল ওটাকে।

ওটার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে ভিতরে তাকাল রানা। ছাদবিহীন ওয়্যাগনে কিছু নেই। হাত দিয়ে হাতড়াতে ইস্পাতের ট্রে-র কিনারা ঠেকল আঙুলে। ট্রে-র এক প্রান্ত উঁচু করল ও, ওয়্যাগনের নিচু পাঁচিল টপকে ঝুপ করে তলায় নামল, তারপর মাথার উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল ট্রে। ওয়্যাগনের মেঝেতে ফাঁক-ফোকর আছে, অক্সিজেনের কোনও অভাব হবে না।

ট্রেনের ড্রাইভার একাই সব কাজ সারছে। বৃত্তাকার লাইন ধরে ট্রেনটাকে প্রথমে ঘুরিয়ে নিল সে। ট্রেনের পিছনে এক এক করে সাতটা ওয়্যাগন জোড়া লাগাল। ক্রেন স্টার্ট দিয়ে কয়লা ভরল সবগুলোয়। তারপর রওনা হলো।

এত রকম আয়োজনের যে প্রয়োজন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল তিন, পাঁচ ও সাত মাইলের মাথায়। তিন জায়গাতেই রেললাইনের ধারে অপেক্ষা করছে টহল পুলিশের একটা করে দল। জেল পলাতক আসামী নয়, সার্চ করা হলো "ওয়ান্টেড" তালিকায় নাম আছে এমন কোনও জঙ্গি ওয়্যাগনে লুকিয়ে আছে কি না দেখার জন্য। বলতে হবে ভাগ্যক্রমেই, ইঞ্জিনরুম সংলগ্ন ওয়্যাগনটা তারা ভাল করে সার্চ করল না, করলে ফল্‌স্‌ বটমটা ঠিকই দেখতে পেত।

ডিপোয় পৌঁছাতে রাত ভোর হয়ে গেল। ট্রে-র উপরের কয়লা সরিয়ে নেয়া হলে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ট্রাউজার, শার্ট ও জুতো দেওয়া হলো ওকে, কাপড়গুলো পুরানো হলেও ধোয়া, ইস্ত্রি করা। একটা কাগজে নকশা এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হলো জলাভূমি ধরে কোন্‌দিকে যেতে হবে, কোথায় পড়বে ব্রিজটা ইত্যাদি। হ্যাঁ, এখান থেকে হেঁটেই পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছতে হবে ওকে। আর রানার সেই গন্তব্য হলো দুর্গম জঙ্গলের ভিতর পাথরের একটা বাড়ি, কেউ দেখিয়ে না দিলে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তেমন কোনও কথা হলো না লোকটার সঙ্গে। বিদায় নেওয়ার সময় রানা শুধু বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

সাত

পাথরের তৈরি বাড়িটার বৈঠকখানায় বসে নিজের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলছে আল মোস্তফা। সোফা ছেড়ে আলমারির কাছে যাওয়ার জন্য প্রতিবার একটা করে অজুহাত তৈরি করছে সে।

একবার ভাবল, 'আমার ঠাণ্ডা লাগছে।' আর ঠাণ্ডা যখন লাগছে, এক ঢোক খাওয়া যেতে পারে।

তারপর ভাবল, 'ধ্যাত – চিনি না জানি না কোন্ শালা শাহরিয়ারের জন্যে রাতটাই আমার মাটি হয়ে গেল!' তো রাত মাটি হওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে আরও এক ঢোক খাওয়া যেতে পারে।

মোস্তফার এক ঢোক মানে আধ গ্লাস। সোফা ছেড়ে বারবার উঠছে সে, আলমারি খুলে বোতল বের করে হাতের গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। দূরের মসজিদে খানিক আগে আজান দিয়েছে। বৃষ্টিটা ছেড়ে গেলেও বাইরে হাহাকার করছে মাতাল বাতাস।

কোনও আওয়াজ হয়নি, শুধু হিম একটু বাতাস তার কপালের ডান পাশটা ছুঁয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল তার ঘাড়ের লোম।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ভেজা শার্ট ও ট্রাউজার

গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকায় সুঠাম পেশল শরীরটা যেন উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

কী কারণে বলা মুশকিল, হঠাৎ খুব ভয় পেল মোস্তফা। তার মনে হলো, এরকম কোনও ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি আগে দাঁড়াতে হয়নি তাকে। সন্দেহ হলো, তার মনের সব গোপন ইচ্ছা ও অভিসন্ধি এই লোক অনায়াসে জেনে ফেলবে।

শুকনো ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে নিয়ে জোর করে হাসল আল মোস্তফা। 'আপনি সত্যি তা হলে আসতে পেরেছেন, মিস্টার আল শাহরিয়ার। যাক, সবার জন্যেই এটা একটা ভাল খবর।'

আরও এক মুহূর্ত মোস্তফার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। লোকটা লম্বা-চওড়ায় ওরই মত, তবে পেশির বদলে চর্বির পরিমাণই বেশি। নিঃশব্দে হেঁটে কামরাটা পার হলো ও। আসার সময় নিচু টেবিলে প্রায় খালি গ্লাসটা লক্ষ করল, তলায় এখনও খানিকটা রঙিন হুইস্কি রয়ে গেছে। 'ক'টা বাজে?' জানতে চাইল ও।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল মোস্তফা। 'পাঁচটা।'

'দিনের বেলা রওনা হওয়া যাবে?' জানতে চাইল রানা। 'আমি এখান থেকে ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে চাই।'

'হ্যাঁ, কেন যাবে না।'

'গোসল করা যাবে?'

ব্যগ্র একটা ভাব দেখিয়ে মোস্তফা বলল, 'আপনার জন্যে আমি চুলোয় পানি গরম করতে দিয়েছি, বললেই বাথরুমে দিয়ে আসি। ওটা প্যাসেজের শেষ মাথায়।

'তার দরকার নেই, আমি ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করব,' বলল রানা। 'পুলিশের ইউনিফর্ম?'

‘বেডরুমের বিছানায় রাখা হয়েছে,’ বলল মোস্তফা। ‘আপনি কিছু খাবেন না?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘সময় নেই,’ বলল ও। ‘ফ্লাস্ক থাকলে তাতে কফি ভরে দিতে পারেন, আর যদি সম্ভব হয় গোটা দুই স্যান্ডউইচ, প্লিজ।’ ঘুরে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল ও।

জোর করে ধরে রাখা হাসিটা অদৃশ্য হলো মুখ থেকে, সোফা ছাড়ার সময় তিক্তকণ্ঠে বিড়বিড় করছে মোস্তফা, ‘ইশ্, যেন কোত্থেকে নবাবপুত্তুর এসেছেন! আমি যেন ওনার বাপের কেনা গোলাম, একের পর এক অর্ডার মারছেন! শালাকে দেব নাকি ধরিয়ে?’

কিচেনে ঢুকে চুলোয় কেটলি চড়াল সে। চেহারাটা রাগে কদর্য হয়ে আছে। কেবিনেটের দেরাজ খুলে রুটি বের করল, ছুরি দিয়ে ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে কাটছে।

পাঁচ মিনিট পর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যাসেজ হয়ে বেডরুমে ঢুকে দেখল ইজরায়েলি পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর-এর ইউনিফর্মে যা যা লাগে সব বিছানার উপর পাশাপাশি সাজানো। মিডিয়াম সাইজের ব্রিফকেসের উপর রাখা হয়েছে পিস্তলটা – যেমনটি চেয়েছিল, ওয়ালথার পিপি। এখনই সেদিকে বিশেষ নজর না দিয়ে চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল ও। পাশের কামরায় যাওয়ার দরজাটা খোলা দেখল, ভিতরে একটা ওয়ার্ড্রোব দেখা যাচ্ছে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজাটা পার হলো রানা, পাশের ঘরে ঢুকে ওয়ার্ড্রোব খুলে ভিতরে তাকাল। কিছু শার্ট ও ট্রাউজার ঝুলছে, নীচে রয়েছে চকচকে কয়েক জোড়া জুতো। প্রায় সাদা জিনসের প্যান্ট ও একটা নীল সুতি শার্ট পছন্দ করল, আর নিল একজোড়া

শু। বেডরুমে ফিরে এসে দ্রুত হাতে ভরে ফেলল ব্রিফকেসে।

ইউনিফর্ম পরা শেষ করে এনেছে রানা, এই সময় বেডরুমে ঢুকল মোস্তফা। তার হাতে বড় আকারের ফ্লাস্ক ও বিস্কিটের টিন দেখা যাচ্ছে। 'টিনে স্যান্ডউইচ আছে, রাস্তার কোথাও আপনাকে থামতে হবে না,' হাসিমুখে বলল সে।

তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'এখনও বলেননি কোথায় যাচ্ছি আমি।'

'দাদু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল মোস্তফা। 'আল্লাহই বলতে পারবেন! আমি তুলকারাম-এর এক লোকের ঠিকানা ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখছি। জায়গাটা কোথায় জানেন?'

জানে রানা, তবু মাথা নাড়ল। 'কোথায়?'

'তেল আবিব থেকে বেশ খানিকটা উত্তরে তুলকারাম,' বলল মোস্তফা, রানার কী প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ রাখছে। 'হয় দুপুর দুটো, নয়তো রাত ন'টায় ওখানে পৌঁছতে হবে আপনাকে।'

'ব্যাখ্যা করুন।'

'ওই দুই সময় আপনাকে পিক করার জন্যে লোক থাকবে ওখানে,' বলল মোস্তফা। 'এখান থেকে সোজা তুলকারামে যাবেন, তারপর দায়ান থিয়েটার হল-এর কার পার্কে ঢুকে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন।'

'কার জন্যে?'

'সত্যি বলছি, জানি না। কী বললাম তখন? একটা ঠিকানার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছি। ওই ঠিকানায় যে লোকটা আছে সে আমার চিঠি দাদুর কাছে, দাদুর চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এ হয় না, মোস্তফা,' ভারি গলায় বলল ও। 'চোখ বুজে কেউ অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে পারে না।'

'খোদার কসম, আমি সত্যি কথা বলছি! ওদের কারও সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই আমার।'

'আরেকটা খুন করতে হবে দেখছি!' আনমনে শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে হঠাৎ বলে উঠল রানা।

'না... এই, না!' আঁতকে উঠল মোস্তফা। পরক্ষণে রানার চোখে কী দেখল কে জানে, কাঁপা কাঁপা গলা থেকে উল্টো সুর বেরুতে লাগল। '...হ্যাঁ... মানে... কথাটা আন্দাজে বলা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে আমার!' ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ল মোস্তফা। 'নিজ গুণে ক্ষমা করে দেন।'

'আমি তো কোনও অভিযোগ করছি না,' বলল রানা। 'কথাটা আপনি লোক মারফত দাদুকে না জানালে তিনি এই আয়োজন করার কথা ভাবতেন না।'

'জী, ঠিক ধরেছেন। কাজটা তা হলে আমার অন্যায় কিছু হয়নি, তাই না? আসলে মানুষ কিন্তু অনেক সময় ভুল করেও দু'একটা ভাল কাজ করে ফেলে। হে হে!' হঠাৎ বোকার মত হাসতে দেখা গেল মোস্তফাকে।

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'উকিল টমসন সম্পর্কে কী জানেন বলুন।'

'বার কাউন্সিল পাঁচ বছরের জন্যে তার প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করেছে,' বলল মোস্তফা। 'ভারি ধড়িবাজ লোক। এই কাজটায় সাহায্য করছে সে, বেশ ভাল কামাবে।'

'আপনি কত পাচ্ছেন?' জানতে চাইল রানা।

দাঁত বের করে হাসল মোস্তফা। 'খরচ বাদে দুই হাজার

মার্কিন ডলার।'

মনে মনে রানা চিন্তিত। অনেক কিছুই স্বাভাবিক নয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে দাদু কোনও অবস্থাতেই নিজের সেফ হাউসের ঠিকানা কাউকে জানাতে চাইছেন না। 'ঠিক আছে, আপাতত আমি আর কোনও প্রশ্ন তুলছি না। তুলকারামে যাব কীভাবে?'

'উকিল টমসনকে বলা হয়েছিল আপনার জন্যে পুলিশের একটা জিপ ব্যবস্থা করা হবে,' বলল মোস্তফা। 'কিন্তু সেটা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি, মিস্টার শাহরিয়ার। তার বদলে পুরানো একটা ফোর্ড পাওয়া গেছে। আপনার ব্রিফকেসে ড্রাইভিং লাইসেন্স, পরিচয়-পত্র, রোডম্যাপ ইত্যাদি যা যা লাগার সব পাবেন। আপনি সিমন রেমন, ইজরায়েলি পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর।'

'দেখা যাচ্ছে সবদিকই কাভার করেছেন।'

'আমাদের লক্ষ্যই হলো মানুষের সেবা করা।' পুরনো একটা মানিব্যাগ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল মোস্তফা। 'এর মধ্যে হাজার তিনেক শেকল আছে, প্রয়োজনে খরচ করবেন।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'আপনার রওনা দেয়ার সময় হয়ে এসেছে।'

বিছানা থেকে ট্রেঞ্চকোটটা তুলে নিয়ে গায়ে চাপাল রানা, বেল্টটা শক্ত করে বাঁধল কোমরে। সুতি ক্যাপটাও মাথায় দিল। কিচেনের ভিতর দিয়ে ওকে পথ দেখাল মোস্তফা। একটা সাইড ডোর দিয়ে উঠানে বেরুল ওরা। উঠান পেরিয়ে ঢুকল পুরানো একটা গোলাঘরে।

ভিতরে দুটো গাড়ি।

পুরানো ফোর্ডটা আকারে বিরাট। দ্বিতীয়টা সবুজ স্যালুন।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'দুটো?' প্রশ্ন করল ও।

'এই বৃষ্টির মধ্যে এখান থেকে আমি ফিরব কীভাবে?' বলল মোস্তফা। 'কাল সকালে ফোর্ড নিয়ে এখানে আসার পর বাড়ি ফেরার জন্যে পাঁচ মাইল হেঁটে কাছাকাছি বাস স্টপে যেতে জান কাবাব হয়ে গেছে আমার। প্লেমাথ-টা এনেছি রাতে।'

কথাটা রানা বিশ্বাস করল না। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল রাত থেকে, অথচ দুটো গাড়ির চাকাই ভিজে। শুধু তাই নয়, কাদাও লেগে রয়েছে। তবে প্রসঙ্গটা তুলল না ও। বলল, 'আমি যাই।'

মাথা ঝাঁকাল মোস্তফা। 'সাবধানে, কেমন? ভুলে আবার বন্দরের দিকে চলে যাবেন না।'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা, চোখে-মুখে কোনও ভাব নেই। 'ঠিক কী বলতে চান আপনি?'

জোর করে হাসল মোস্তফা। 'কিছু না, সার, কিছু না। আপনার পেছনে মোটা টাকা ইনভেস্ট করেছেন দাদু। নিশ্চয়ই তিনি আশা করছেন ওই টাকা বহুগুণ হয়ে ফিরে আসবে।'

কীভাবে কী হলো কিছুই বলতে পারবে না মোস্তফা। হঠাৎ তার ঝাপসা মত লাগল রানাকে। পরমুহূর্তে দেখা গেল শূন্যে ঝুলছে সে, শ্বাস নিতে পারছে না, গলাটা আঁকড়ে ধরে আছে পেশল একজোড়া হাত।

তার মুখে গরম নিঃশ্বাস ফেলে রানা বলল, 'আমি হেঁয়ালি পছন্দ করি না। কথাটা সব সময় মনে রাখবে, মোস্তফা। আমার সঙ্গে ভুলেও চালবাজি করতে যেয়ো না!'

ছেড়ে দিতে ভারি বস্তার মত মেঝেতে ঢলে পড়ল মোস্তফা। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে সে, নড়ার শক্তি নেই, শুনতে

পেল স্টার্ট নিয়ে গোলাঘর থেকে উঠানে বেরিয়ে গেল ফোর্ড। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

পাথুরে মেঝে থেকে জুতোর শব্দ ভেসে আসছে। শান্ত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মোস্তফা। 'পরদেশী শাহরিয়ার দেখা যাচ্ছে বড়ই কঠিন পাত্র। তার সঙ্গে লাগতে যাওয়াটা সত্যিই মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

মুখ তুলে উকিল টমসনের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন অভিশাপ দিল মোস্তফা। 'জানি না কী করছ তুমি,' বেসুরো গলায় বলল সে। টলতে টলতে সিধে হলো, গলাটা একহাতে ডলছে। 'নিজের ভাল চাইলে এখনই এসব থেকে আমার দূরে সরে যাওয়া উচিত।'

'কোটিপতি হবার গোল্ডেন অপরচুনিটি হারাতে চাও?' তার কাঁধ চাপড়ে দিল টমসন। 'চলো বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসি। গোটা ব্যাপারটা আবার তোমাকে শোনাই। দেখবে ভয়-সংশয় সব কেটে গেছে।'

বাঁক ঘোরার পর রাস্তার কিনারায় গাড়ি থামিয়ে নীচে নামল রানা। পায়ে হেঁটে পাথুরে বাড়িটার দিকে ফিরে আসছে। মোস্তফা লোকটাকে পছন্দ হয়নি ওর। তাকে বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না। তা ছাড়া, দুটো গাড়ির চাকাতেই ভেজা কাদা দেখেছে ও, অথচ ফোর্ডটা কাল থেকে ছাদের তলায় ছিল।

বাড়িটার কাছাকাছি এসে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল রানা। গাছপালার আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে। পিছনের উঠান পার হয়ে পরদা টানা একটা জানালার পাশে চলে এল ও। ছোট্ট ফাঁক দিয়ে বৈঠকখানার ভিতর দেখতে পেল উকিল টমসন আর মোস্তফাকে, টেবিলে বসে চুমুক দিচ্ছে মদের গ্লাসে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল।

অর্থাৎ, ষড়যন্ত্র জটিল হচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দাদু এ-ধরনের লোকজনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন কীভাবে? প্রশ্নটার উত্তর পেতে হলে প্রথমে ওকে তুলকারাম-এ পৌঁছাতে হবে।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে ইউনিফর্ম খুলে জিনস ও সুতি শার্টটা পরে নিল রানা, জুতো জোড়াও বদলাল। পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় ও বুট রাস্তার ধারে ঝোপের ভিতর গুঁজে রাখল, সহজে যাতে কারও চোখে না পড়ে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তার উপর চোখ রাখল রানা।

সত্তর কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে তিন-চার ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়, কিন্তু ঘুরপথ ধরতে বাধ্য হওয়ায় রানার সময় লাগল ছয় ঘণ্টার কিছু বেশি।

রওনা হওয়ার পর প্রথম যে শহরটা পাওয়া গেল সেখানকার এক গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে গল্প করে কিছুটা সময় কাটাল রানা। লোকটার মন-মানসিকতা বুঝে ফোর্ডটা বিক্রি করার প্রস্তাব দিল ও। চোরাই গাড়ি মনে করে কিনল গ্যারেজ মালিক; রঙ পাল্টে, কাগজ বানিয়ে অন্য কারও কাছে বেচে দেওয়ার উপায় জানা আছে তার।

ফোর্ড বেচা টাকা দিয়ে আরেক গ্যারেজ থেকে সাতদিনের জন্য একটা টয়োটা ভাড়া নিল রানা।

প্রথম রোড ব্লক পড়ল দ্বিতীয় শহরে ঢোকার মুখে। বেলা তখন দশটা। রানা আন্দাজ করল, ওর জেল ভেঙে পালাবার খবরটা গোটা ইজরায়েলে ইতিমধ্যে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ওর পরিচয় সম্পর্কে কী বলা

হচ্ছে কে জানে – আল শাহরিয়ার, নাকি মাসুদ রানা?

আল শাহরিয়ারকে মাসুদ রানা বলে সন্দেহ করছি, রানা চায়নি লেভি মুভিন এই কথাটা মোসাদ হেডকোয়ার্টারকে জানাক। তাকে তেল আবিবে মেসেজ পাঠাতে বাধা দেওয়ার জন্যই প্রাণের উপর ঝুঁকি নিয়ে প্রথমবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ও। কিন্তু মেসেজটা মুভিন পাঠাতে পেরেছে কি না জানার সুযোগ হয়নি ওর।

গেস্ট হাউসে মুভিন ছাড়া সেই রাতে আর কোনও অতিথি ছিল না। নিজের কামরার দরজা খোলা রেখে কাউকে টেলিফোন করছিল সে। সন্দেহ নেই মোসাদ হেডকোয়ার্টারের কারও সঙ্গেই কথা বলতে চাইছিল। সম্ভবত লাইন পাচ্ছিল না, কিংবা অপরপ্রান্ত থেকে আসা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না। রানার এরকম মনে করার কারণ হলো, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেয়েছে হতাশ ভঙ্গিতে টেবিলে ঘুসি মারছে মুভিন।

নিঃশব্দ পায়ে ওখান থেকে সরে এসে দরজার দিকে এগিয়েছে রানা, কিন্তু ভিতরে ঢোকার মুখেই ধরা পড়ে গেছে মুভিনের চোখে। লোকটার রিফ্লেক্স অদ্ভুত। চোখের পলকে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে সে। রানা অবশ্য ঝাঁপ দিয়েছে তার আগেই।

রানার ইচ্ছে ছিল না ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে লোকটাকে। সেবার অন্তত পালাবার ইচ্ছেও ছিল না। ওর ধারণা ছিল দু'তিনদিনের মধ্যেই দাদুর প্রতিনিধি ওর কাছে লোক বা মেসেজ পাঠাবে।

ওর প্ল্যান ছিল নিজের চেহারা না দেখিয়ে মুভিনকে এমনভাবে আহত করবে, সে যাতে অন্তত ওই দু'তিনদিন মোসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে।

পিস্তল বের করতে পারলেও, সেটা ওর দিকে তাক করার সুযোগ পায়নি মুভিন। তার আগেই জুডো চপ মেরে রানা তার কণ্ঠার হাড় ভেঙে দিয়েছিল। হাত থেকে ছুটে গিয়ে পিস্তল পড়েছিল কার্পেটের উপর। খানিক ছটফট করে লোকটা মারা যাওয়ার পর হাতে রুমাল জড়িয়ে পিস্তলটা গুঁজে দিয়েছে ও মুভিনের হাতে, আলোর সুইচ অফ করেছে, তারপর ভূতের মত নিঃশব্দে ফিরে এসেছে নিজের সেলে।

প্রথম রোড ব্লকের পুলিশ কোনও প্রশ্ন বা চেক না করেই ছেড়ে দিল রানাকে। তবে তাদের চোখের দৃষ্টি কেমন সন্দেহজনক মনে হলো রানার। এরপর সামনে রোড ব্লক আছে টের পেলেই অন্য পথ ধরল ও, শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল মরুভূমি ও জলাভূমিতে।

তুলকারামে পৌঁছাতে প্রায় দুপুর একটা বেজে গেল ওর। দায়ান থিয়েটার হল-এর কার পার্কটা খুঁজে বের করল, তবে ভিতরে ঢুকল না। ফিলিং স্টেশনে এসে ট্যাংকে অকটেন ভরল ও। মোস্তফার বানিয়ে দেওয়া কফি ও স্যান্ডউইচ অনেক আগেই একটা ডোবায় ফেলে দিয়েছে, লাঞ্চ করার জন্য ঢুকল একটা ইহুদি হোটেলে।

ও ইসলামী জঙ্গি নয়, শরীরে বোমা ফিট করা নেই, এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঢোকার সময় শুধু ওর বডি সার্চ করা হলো, সিকিউরিটি গার্ডরা কোনও কাগজ-পত্র দেখতে চাইল না।

এখানে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না, এরকম একটা আংশিক স্বস্তি নিয়ে লাঞ্চ শেষ করল রানা। তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এসে ঢুকল দায়ান থিয়েটার হল-এর কার পার্কে। ইঞ্জিন বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

আশপাশে আরও গাড়ি আছে, লোকজনও আছে, বোকার মত

চুপচাপ বসে থাকাটা সন্দেহজনক মনে হতে পারে। ইঙ্গিতে একজন হকারকে ডেকে একটা সিগারেট কিনল রানা, সেটা ধরিয়ে রেডিওটা অন করল। কোনও এক ইজরায়েলি পপশিল্পীর গান হচ্ছে।

শান্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভাষাটা ইংরেজি, অক্সফোর্ড ভার্সিটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ। 'আমি আপনাকে নিতে এসেছি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

অন্য কারও মুখে নিজের নাম শুনে কোমরে গোঁজা পিস্তলের বাঁটে হাত চলে যাচ্ছিল রানার, তবে মেয়েটিকে দেখার পর মাঝপথে থেমে গেল সেটা। মেয়েটির বয়স হবে খুব বেশি হলে পঁচিশ, কাঁধ থেকে একটা চামড়ার বড় ব্যাগ ঝুলছে। ট্রেঞ্চকোটটা বেল্ট দিয়ে কোমরে বাঁধা। মাথায় স্কার্ফ থাকলেও, বাইরে বেরিয়ে আসা ঘন চুলে ঝিরঝিরে বৃষ্টির খুদে ফোঁটা মুক্তোর মত ছড়িয়ে আছে।

ঘুরে গাড়ির আরেকদিকে চলে এল মেয়েটি, দরজা খুলে ওর পাশের সিটে উঠে বসল। নিখুঁত ক্রিম রঙের মুখ, আকৃতি কিছুটা ডিমের মত, মোহনীয়। আয়ত চোখ, ভুরু ও চুল কুচকুচে কালো।

'আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার দাদু বলেছেন,' জবাব দিল মেয়েটি। 'তিনি আপনার পুরানো একটা ফটোও দেখিয়েছেন আমাকে। দেখা যাচ্ছে একটুও বদলাননি আপনি।' এমন সুরে কথা বলছে মেয়েটি, রানা যেন তার কতদিনের পরিচিত।

'ফটোর সঙ্গে মিল দেখেই ধরে নিলেন আমি রানা? অমিলগুলোকে গুরুত্ব দিলেন না? আমার তো এই গাড়ি নিয়ে আসার কথা নয়।'

'জানি। হাইজ্যাক করা পুলিশ জিপ আপনাকে দিতে পারেনি ওরা,' বলল মেয়েটি, তারপর কী ভেবে যেন হেসে ফেলল। 'আপনি এই জিনস আর শার্ট চুরি করে এনেছেন।'

'কে আপনি?' জানতে চাইল রানা। 'এ-সবের মধ্যে ঠিক কোথায় আপনার জায়গা?'

প্রশ্নটা রূঢ় শোনালেও, মেয়েটির মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। 'খানিক পরেই জানতে পারবেন। আপনি যদি হুইলটা আমাকে ছেড়ে দেন, আমরা রওনা হতে পারি।'

গাড়ি থেকে নেমে উল্টোদিকে হেঁটে এল রানা। ইতিমধ্যে ড্রাইভিং সিটে সরে গেছে মেয়েটি। ওকে উঠতে দেখে স্টার্ট দিল সে। 'গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুললে একটা এনভেলাপ পাবেন,' বলল সে।

'কখন রাখলেন?' চট্ করে প্রশ্ন করল রানা।

'যখন খেতে ঢুকলেন, তখন,' বলল মেয়েটি। 'ওটায় আপনার নতুন কাগজ-পত্র আছে। আপনার নাম জিয়া হাসান। মিউনিসিপ্যালিটির একজন রোমিং ইন্সপেক্টর, স্লটারহাউসে গরু-ছাগলগুলো হালালভাবে জবাই করা হচ্ছে কি না ইন্সপেকশন করার দায়িত্বে আছেন।'

'আর কিছু পাওয়া গেল না, শেষ পর্যন্ত কসাইদের ইন্সপেক্টর বানিয়ে দিলেন আমাকে?' কৌতুক করে বলল রানা।

'বাস্তবে এরকম একটা লোক সত্যি আছে, সে জানে না তার কাগজ-পত্র ব্যবহার করছি আমরা।'

'দাদু কেমন আছেন এখন?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। তিনি মৃত্যুশয্যায়, ভোলেনি ও।

'আগের চেয়ে এখন একটু ভাল,' বলল মেয়েটি, ঠোঁটের

কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল। 'তাঁর এই হঠাৎ ভাল হয়ে ওঠার সঙ্গে জেল থেকে আপনার বেরিয়ে আসার বোধহয় সম্পর্ক আছে।'

কাগজগুলোয় চোখ বুলাবার সময় এই প্রথমবার খেয়াল করল রানা, গাড়ির ভিতরে মিষ্টি একটা সেন্টের সুগন্ধ রয়েছে।

তথ্যগুলো মাথায় গেঁথে নিল রানা। কিছু কাগজ ছিঁড়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরাল, সেগুলোর মধ্যে সিমন রেমন-এর কাগজ-পত্রও থাকল। কিছু স্থান পেল ট্রাউজারের পকেটে। 'রোড ব্লকে থামানো হলে, অন্য লোকের ফটোকে আমার বলে চালাব কীভাবে? আইডি-র ফটোর সঙ্গে আমার অনেক কিছুই মিলছে না,' বলল ও।

'মুখের গড়ন মেলে – নাক ঠিক আছে, ঠিক আছে চোখের সাইজ, ভুরুর ঘনত্ব ও বিস্তার,' আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলল মেয়েটি। 'ঠিক নেই চুল, জুলফি ও গোঁফ; ঠিক নেই চোয়াল। জিয়া হাসানের জুলফি অস্বাভাবিক লম্বা, অত লম্বা জুলফিসহ পরচুলা পাওয়া যায় না; তবে চিন্তা করবেন না, তারও সমাধান করা হয়েছে। ফাঁকা একটা জায়গা পেলে থামব, নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে নেবেন। ভেতরে প্যাড ব্যবহার করলে মুখটাও বড়সড় দেখাবে।'

'সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি। 'দাদুর নির্দেশ।'

ট্রেঞ্চকোট সরে যাওয়ায় তার ঊরুর অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে, ভরাট দেখাচ্ছে নীল জিনসের ভিতর। সচেতনতার লেশমাত্র নেই, স্রেফ অভ্যাসবশত সেটুকু ঢেকে দিয়ে টয়োটা ছেড়ে দিল সে। ফুলহাতা পপলিনের শার্ট পরেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পর জিজ্ঞেস করল রানা, 'জায়গাটা কত দূরে?'

'আমরা পারদেস হান্না ও হাডেরা – এই দুই এলাকার মাঝখানে একটা জায়গায় যাচ্ছি। এই ধরুন, ত্রিশ কিলোমিটার।' সম্পূর্ণ শান্ত মেয়েটি, স্টিয়ারিং হুইল ধরা হাত দুটো দৃঢ়। ট্রাফিক জ্যাম এড়িয়ে, কখনও সরু রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

রানা মাঝে মাঝেই তার দিকে তাকাচ্ছে, বুঝতে পেরে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল মেয়েটির ঠোঁটে। তারপর যেন কৌতুক করার জন্যই জানতে চাইল, 'পরে কোথাও দেখলে চিনতে পারবেন আমাকে?'

'তা তো পারবই, গলার এই আওয়াজও চিনতে পারব,' বলল রানা। 'অক্সফোর্ডে পড়া মেয়ে এখানে কী করছে?'

হেসে ফেলল মেয়েটি। 'ধরে ফেলেছেন?' তারপরই ম্লান হয়ে গেল চেহারা। 'এখানে এসে আটকা পড়ে গেছি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আমার কথা থাক। আপনার কথা শোনা যাক। দাদু বলছিলেন – খাঁটি একজন মানুষ, অথচ সাম্প্রদায়িক নন।'

'খাঁটি? এটা তাঁর অন্ধ স্নেহ।' মন্তব্যটা হেসে উড়িয়ে দিল রানা। 'তবে এটা ঠিক যে সাম্প্রদায়িক নই আমি। প্যালেস্টাইনের মাটিতে কথাটা নিশ্চয়ই বেমানন শোনাচ্ছে।'

'না, মোটেও না!' দ্রুত দ্বিমত পোষণ করল মেয়েটি। 'আপনি জানেন না? সাম্প্রতিক সবগুলো জরিপে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় আচার বা কর্তব্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে – এ-দেশে এরকম মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য হয়ে উঠছে অগ্রহণযোগ্য। সাধারণ

মানুষ কাউকে ঘৃণা করতে চায় না। একজন মুসলমান তার সৎ ও সরল প্রতিবেশীকে ভালবাসতে চায়; সে-লোক খ্রিস্টান, মুসলিম নাকি ইহুদি তা সে জানতে চায় না।'

'খুবই ভাল লক্ষণ বলতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আর মাইল দুয়েক এগোতে পারলেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাব আমরা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, এরমধ্যে যেন রোড ব্লকের সামনে পড়তে না হয়।'

ওদের প্রার্থনায় নিশ্চয়ই কোনও গলদ ছিল, মাইলখানেক পর একটা মোড় ঘুরতেই মহাবিপদ হয়ে দেখা দিল রোড ব্লক।

মনে মনে প্রমাদ গনল রানা, কারণ পুলিশ নয়, চেক করছে সামরিক বাহিনীর লোকজন। চেক করার ধরন দেখেই বোঝা গেল কতটা সাবধানী তারা।

ব্যারিকেড-এর পিছনে গাড়ির লম্বা লাইন তৈরি হয়েছে কিন্তু লাইনের লেজের দিক থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে কেউ, তারও উপায় নেই – কারণ সেদিকেও আধ মাইল পর্যন্ত জিপ ও মোটরবাইক নিয়ে আছে মিলিটারি পুলিশের টহল।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা, এটা কি রুটিন রোড ব্লক, নাকি বিশেষভাবে জেল পালানো কয়েদি আবিল আহুদকে ধরার কোনও চেষ্টা?

ধীরে ধীরে গাড়ি থামাচ্ছে মেয়েটি। উত্তেজনায় তার বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

'এখন উপায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। পিস্তলটার কথা মনে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে ওটা কোনও কাজের জিনিস নয়, যদি না আত্মহত্যা করতে চায় ও।

‘আপনাকে একটা পিস্তল দেয়া হয়েছে, সেটা কোথায়?’ ঢোক গিলে জানতে চাইল মেয়েটি। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। গাড়ি থামাল সে, ভিউমিরর-এ তাকিয়ে দেখল আরও গাড়ি লাইন দিচ্ছে পিছনে।

সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, এ মেয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ। ‘কোমরে।’

‘ওটা আমাকে দিন,’ বলল মেয়েটি। পিস্তলটা নিয়ে নিজের শিরদাঁড়ার কাছে গুঁজে রাখল সে। তারপর ব্যস্ত হাতে খুলে ফেলল সিটের পাশে পড়ে থাকা চামড়ার ব্যাগটা। ‘তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন! আমার কোলে!’

‘কী?’ প্রথমে রানা মনে করল ভুল শুনেছে। তারপর চামড়ার ব্যাগ থেকে কী বেরুচ্ছে দেখতে পেয়ে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে সিটের উপর আধশোয়া হয়ে মাথা রাখল ওর উরুর উপর।

মোটরবাইকে বসা দুজন মিলিটারি পুলিশ সগর্জনে পাশ কাটাল ওদের গাড়িকে।

রানা ভাবল, এরকম বিপজ্জনক পরিবেশে এত ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, না জানি কী আছে কপালে!

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল উল্টোদিকে ছুটল একটা আর্মার্ড কার।

প্রায় ছয়ফুটী একজন মানুষের পক্ষে গাড়ির সামনের সিটে শোয়া বড়ই কঠিন! হাঁটু দুটো ভাঁজ করে রাখতে হয়েছে রানাকে, বেকায়দা ভঙ্গিতে, মাথাটা অবশ্য আরামেই আছে মেয়েটির উরুর উপর। কিন্তু আরাম উপভোগ করার পরিস্থিতি নয় এটা, তবে ও সামান্য নড়লে মেয়েটির সর্বশরীর যে শিউরে উঠছে সেটা স্পষ্ট অনুভব করল ও। একটু না নড়ে মড়ার মত পড়ে থাকতে চেষ্টা

করল রানা।

অনভ্যস্ত হাতে রানার মাথায় প্রথমে পরচুলাটা পরিয়ে দিল মেয়েটি। খুবই নার্ভাস, হাত দুটো কাঁপছে। ওর উষ্ণ, কাঁপা নিঃশ্বাস এসে লাগছে রানার মুখে।

ওর হাত থেকে নিয়ে স্পঞ্জের প্যাড দুটো মুখে পুরল রানা। বাইরে থেকে চাপ দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিল। 'শান্ত থাকুন,' বলল ও। 'স্বাভাবিক থাকতে পারলে বিপদ এড়ানো সম্ভব।' একটু বিরতি নিয়ে জানতে চাইল, 'আপনার সঙ্গে আর কোনও অস্ত্র আছে?'

রানার ঠোঁটের উপর গোঁফ লাগাচ্ছে মেয়েটি, প্রশ্নটা শুনে মাথা নাড়ল। ছদ্মবেশের এ-সব উপকরণে আঠা লাগানো আছে, জায়গামত বসিয়ে চাপ দিলেই লেগে যাবে।

এবার নকল জুলফি লাগাচ্ছে মেয়েটি।

ভট্ ভট্ আওয়াজ তুলে ফিরে আসছে মোটরসাইকেলটা। দ্বিতীয় জুলফিটা লাগাতে গিয়ে রানার ঘামে হাত পিছলে গেল মেয়েটির। এক ইঞ্চি নীচে লাগল ওটা, তাও সোজা হয়ে না; রানার চোয়ালের সঙ্গে কোনও রকমে ঝুলে থাকল বাঁকা হয়ে। ঠিক করার চেষ্টা করেও বিফল হলো মেয়েটি, হাত দুটো এত কাঁপছে তার, কাজটা শেষ করতে পারছে না।

মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল রানা, প্রায় ক্ষমার অযোগ্য একটা ভুল করে বসেছে ও। মেয়েটির নাম জানা হয়নি ওর।

দুটোই মারাত্মক ত্রুটি, অথচ একটাও শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল না।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে মেয়েটির জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটারসাইকেল। একটু আগে ওদের গাড়িটাকে পাশ

কাটাবার সময় নিশ্চয়ই দৃশ্যটা চোখে পড়েছে মিলিটারি পুলিশের, একটি তরুণীর উরুর উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে, কিংবা শুতে যাচ্ছে এক তরুণ।

মোটরবাইকও থামল, রানাও উঠে বসল সিটের উপর। বলা মুশকিল স্থানচ্যুত জুলফিটা মিলিটারি পুলিশ দেখে ফেলেছে কি না।

'সাবধান! কেউ নড়বেন না!' মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর হাতেই পিস্তল বেরিয়ে এল।

মেয়েটির জানালার দিক থেকে গাড়ির ভিতরে তাকালে দেখা যাবে ঠিক ভাবে লাগানো রানার ডানপাশের জুলফি। কিন্তু এমপি-রা কেউ যদি ঘুরে এপাশে চলে আসে, তা হলেই সর্বনাশ।

এপাশে... কথাটা মাথায় আসতেই একটা হাসির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ঘাড় সামান্য একটু ঘুরিয়ে সেদিকে, অর্থাৎ বাম দিকের ফুটপাতের দিকে তাকাল ও। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। সর্বনাশ!

কখন কে জানে ওদের পাশে একটা কালো মার্সিডিজ এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যাকসিটে সাত-আট বছরের একটা বাচ্চা ছেলে বসে রয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে, নিশ্চয়ই চোয়ালে বাঁকা হয়ে ঝুলে থাকা জুলফিটা দেখে!

তার সামনে ড্রাইভিং সিটে বসা ভদ্রলোক বৃদ্ধ, খুলি কামড়ে থাকা টুপিই বলে দিল লোকটা ইহুদি। রানার ওপর চোখ, এবার একটা হাত দিয়ে বুড়োর পিঠে ধাক্কা দিচ্ছে বাচ্চাটা, হাস্যকর দৃশ্যটার দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে।

শান্ত ভঙ্গিতে হাতটা তুলে মাথা চুলকাবার ছলে জুলফিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে নিতে চেষ্টা করছে রানা। সেটা দেখে নিভে গেল

বাচ্চা ছেলেটার মুখের হাসি। হাতটা নামিয়ে নিয়েছে ও, এক সেকেন্ড পর অনুভব করল কানের পাশ থেকে, চোয়াল ছুঁয়ে, খসে পড়ল জুলফিটা। সম্ভবত কাঁধের উপর পড়েছে। সন্দেহ নেই, ঘামে ভিজে আঠা নষ্ট হয়ে গেছে ওটার।

হাসিটা আরও জোরালো হয়ে ফিরে এল বাচ্চার মুখে।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?' গাড়ির আরোহী দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে আরবী ভাষায় জানতে চাইল মোটরসাইকেলের ড্রাইভার। 'কোত্থেকে আসছেন?' হয়তো মেয়েটির মাথায় স্কার্ফ দেখে ধরে নিয়েছে ওরা মুসলমান। সেজন্যই হয়তো ওদের ঘনিষ্ঠতা সন্দেহ জাগিয়েছে মনে।

রানা ভাবল, যে-কোনও মুহূর্তে মার্সিডিজের বুড়ো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে ওর দিকে। ওর কাঁধে পড়ে থাকা জুলফিটা দেখে মুহূর্তে বুঝে ফেলবে ওটা ছদ্মবেশের অংশ। আর ছদ্মবেশ নেওয়ার দরকার হয় আত্মঘাতী জঙ্গিদের। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি পুলিশের উদ্দেশে চেঁচাতে শুরু করবে বুড়ো।

'তুলকারাম থেকে আসছি,' শান্ত, নির্লিপ্ত সুরে বলল মেয়েটি। 'যাচ্ছি হাইফায়।'

'এত লম্বা জার্নি, কী ব্যাপার?' কঠিন সুরে জানতে চাইল মোটরসাইকেলের ড্রাইভার, তার হাতের পিস্তল ওদের দুজনকেই কাভার করছে।

তবে তার পিছনে বসা লোক সরাসরি কারও দিকে অস্ত্র তাক করেনি।

'কে কোথায় কীভাবে জবাই করছে দেখতে হয় আমাদেরকে,' মেয়েটিকে অবাক করে দিয়ে হিব্রু ভাষায় বলল রানা। 'আমি একজন স্লটারহাউস ইন্সপেক্টর।'

মোটরসাইকেলের পিছনে বসা লোকটার দৃষ্টি রানাকে ছাড়িয়ে পাশের গাড়ির বাচ্চাটার উপর পড়েছে। বাচ্চার দেখাদেখি সে-ও হাসছে। হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল সে।

'কাগজ-পত্র দেখান,' নির্দেশ দিল মোটরবাইকের ড্রাইভার।

ওদের সামনের গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাবার সময় চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, বাচ্চার মুহুর্মুহু তাগাদায় বাধ্য হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছে বৃদ্ধ ড্রাইভার। বোধহয় ওর জুলফির অবস্থা দেখে ফেলেছে লোকটা!

রানার বুকের ভিতরে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। যে-কোনও মুহূর্তে সাঙ্গ হবে খেলা! পরিচয়-পত্রটা বের করে মেয়েটির হাতে দিল ও।

নিজের এক গাদা কাগজ-পত্র আগেই বের করেছে মেয়েটি, সব একসঙ্গে মোটরবাইক ড্রাইভারের বাড়ানো হাতে তুলে দিল সে।

কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে তার দিকে তাকাল মিলিটারি পুলিশ। 'আপনি তো দেখা যাচ্ছে অক্সফোর্ড ভার্সিটি থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন। এখানে, ইজরায়েলে কী করছেন? এই লোকের সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক আপনার?'

পাশের মার্সিডিজ স্টার্ট নিল।

'এখানে আবার কী করব? দেখতেই তো পাচ্ছেন ভিসা পেয়েছি, যে-কোনওদিন চলে যাব আবার,' নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে ভালই জবাব দিচ্ছে মেয়েটি।

'আমি জানতে চাইছি ইজরায়েলে আপনি ফিরেছেন কী মনে করে?' ব্যঙ্গ ও আক্রোশ মেশানো সুরে প্রশ্ন করল মোটরবাইকের ড্রাইভার। 'সবাই জানে দেশটাকে আমরা মুসলমানদের জন্যে

নরক বানিয়ে রেখেছি। সেই নরকে কী মনে করে ফিরলেন আপনি?'

স্টার্ট নেওয়া মার্সিডিজ সামনে এগোল, তারপর ব্যাক করে ফিরে আসতে শুরু করল, ওদের টয়োটার দিকে পিছিয়ে আসছে। রানা ভাবল, বুড়ো ড্রাইভারের উদ্দেশ্যটা কী? বাচ্চাটা এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তবে কী কারণে যেন তার মুখের হাসিটা উধাও হয়ে গেছে।

'ইহুদিদের জন্যে আমরাও দেশটাকে খুব একটা খারাপ নরক বানাইনি,' ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিল মেয়েটি। 'তারপরেও তো আপনারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না।'

'এটা আমাদের দেশ, আমরা এই দেশের মালিক, চলে যাব কেন?'

মার্সিডিজটা পিছিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। রানার টয়োটা ও মার্সিডিজের মাঝখানে রয়েছে মোটরবাইক। ভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, মিলিটারি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চায় বুড়ো ড্রাইভার। নিজের সন্দেহের কথা জানাবেঃ রানা একজন আত্মঘাতী জঙ্গি, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে?

'এটা আমাদেরও দেশ, আমরাও এই দেশের মালিক, কেন ফিরে আসব না?' পাল্টা প্রশ্ন মেয়েটির।

'এই লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?'

'আমরা বন্ধু।'

'কী রকম বন্ধু?'

'আমাদের বিয়ে হবে।'

'অনুমতি চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন?'

'সেটা আপনাকে কেন বলতে যাব আমি?'

হাসল এমপি। ‘বিয়ের আগে এত ঘনিষ্ঠতা আপনাদের ইসলাম অনুমোদন করে? আমি যেন দেখলাম আপনার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন উনি, আর আপনি তার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছিলেন।’

‘অফিসার, দিস ইজ টু মাচ! আপনি আমাদের প্রাইভেসিতে নাক গলাচ্ছেন। আপনার বাড়াবাড়ির উত্তরে আমি শুধু বলতে চাই, ক্যান্টনমেন্ট কমান্ডার-এর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। টেলিফোন করে আমার সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। নাম বলবেন শায়লা আলাউয়ি।’

‘কমান্ডারের নামটা যেন কী, প্লিজ, ম্যাডাম?’ মেয়েটিকে পরীক্ষা করছে এমপি, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। তার কথা বিশ্বাস করছে না সে।

‘ব্রিগেডিয়ার এরিক কারমেল। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম লুদভিলা। মেয়ের নাম সুনামি।’

একটু থতমত খেয়ে গেল এমপি। ‘কমান্ডারের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা কীভাবে…’

‘এসব প্রশ্ন যে ক্ষমার অযোগ্য বাড়াবাড়ি, সেটা কি সত্যিই আপনি এখনও টের পাচ্ছেন না?’ কড়া গলায় ধমক দিল মেয়েটি। ‘আপনি যদি এরকম আর একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেন, তাঁর কাছে অভিযোগ করতে বাধ্য হব আমি,’ বলল মেয়েটি।

এতক্ষণে যেন একটা ধাক্কা খেল এমপি। কানে পানি গেছে।

এই সময় মার্সিডিজের ড্রাইভার গলা চড়িয়ে বলল, ‘অফিসার, আমার কথাও একটু শুনুন! ব্যাপারটা ইমার্জেন্সি!’

ওদের কাগজগুলোর উপর আবার চোখ বুলাচ্ছে এমপি। বিশেষ করে জিয়া হাসানের ফটো ও রানাকে বারবার দেখছে।

'অফিসার, দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি!' গলার আওয়াজ আরও চড়াচ্ছে বুড়ো। হাতে ধরা মোবাইল ফোনটা পিস্তলের মত তাক করেছে মিলিটারি পুলিশের দিকে। 'আমার জরুরি কথা শুনতে হবে আপনাদেরকে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, কী বলবেন বলুন,' এতক্ষণে সাড়া পেল বুড়ো, মোটরবাইকের পিছনে বসা আরোহী মুখ খুলল।

রানা ভাবল, তীরে এসে তরি ডুবতে চলেছে। আড়চোখে মেয়েটির পিঠের দিকে তাকাল ও। পিস্তলটা গুঁজে রাখার কারণে কোমরের কাছটা সামান্য উঁচু হয়ে আছে। ওটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে দুই মিলিটারি পুলিশকে গুলি করা যায়, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হওয়া যায় উল্টোদিকে। এভাবে পালানো সম্ভব কি না সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। একেবারে শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে কাজটা যদি করে রানা, প্রাণের মায়া পুরোপুরি ত্যাগ করেই করবে।

বুড়ো বলছে, 'এইমাত্র বাড়ি থেকে টেলিফোন পেয়েছি আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। প্লিজ, আমাকে চেক করুন, নয়তো অনুমতি দিন, আমি রওনা হয়ে যাই।'

সারা শরীরে শীতল আরামের পরশ পেল রানা। এমন স্বস্তি বহুদিন অনুভব করেনি ও।

'ঠিক আছে, যান আপনি।'

অনুমতি পেয়ে মার্সিডিজ ছেড়ে দিল বুড়ো।

'ওর জুলফিটা নকল!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা, আঙুল তুলে রানাকে দেখাচ্ছে।

ওরে বিচ্ছু! রানার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব নিল। চোখ-মুখ স্বাভাবিক রেখে

বলল, ‘আমাদেরও তাড়া আছে, অনুমতি পেলে রওনা হয়ে যাই।’

‘কী বলে গেল বাচ্চাটা?’ মোটরবাইকের ড্রাইভার তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল। রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণে ছেলেটির কথার শেষটুকু পরিষ্কার শোনা যায়নি।

‘আমরা উত্তরটা শোনার অপেক্ষায় আছি,’ ঠাণ্ডা সুরে বলল মেয়েটি। ‘এখানে আমাদের বিনা কারণে দাঁড় করিয়ে রাখবেন, নাকি যেতে দেবেন?’

‘ঠিক আছে, নো ইল ফিলিংস, আপনারাও যেতে পারেন,’ বলল মোটরবাইকের ড্রাইভার, কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল মেয়েটিকে।

সময় নষ্ট না করে গাড়ি নিয়ে এগোল মেয়েটি। স্পিড বাড়ছে। ‘গতিটা স্বাভাবিক রাখুন,’ রিয়ারভিউ-মিররে চোখ রেখে বলল রানা। ‘এমপি দুজন এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে।’

কী কারণে জানি কালো মার্সিডিসটা দাঁড়িয়েছে রাস্তার পাশে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল টয়োটা। দু’মিনিটও পার হয়নি, রুদ্ধশ্বাসে বলল মেয়েটি, ‘বিপদ এখনও কাটেনি!’

‘মানে?’ তারপর নিজেই দেখতে পেল রানা। মার্সিডিজটা আসছে পিছন পিছন! চট্ করে জায়গামত বসাল ও জুলফিটা।

টয়োটাকে পাশ কাটাবার সময় বুড়ো ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তবে তার চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। বাচ্চা ছেলেটা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, ওদেরকে দেখতেই পেল না।

সাবধানের মার নেই, মেইন রোড ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল মেয়েটি। আঁকাবাঁকা গলি ধরে আধঘণ্টা এগোবার পর আবার মেইন রোডে উঠল। দুজনেরই একটা করে চোখ আছে

সামনে-পিছনে। তবে সামনে কেউ নেই, পিছু নিয়েও কেউ আসছে না।

একসময় শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওদের গাড়ি। এলাকাটা নির্জন, ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে ঢালু পথ চলে গেছে। পাহাড়ি ঝরনার পাশে, একটা গির্জার সামনে গাড়ি থামাল মেয়েটি।

রানাকে নিয়ে ভিতর ঢুকল, হাতে একটা ব্যাগ। গির্জার ভিতরটা ফাঁকা পড়ে আছে। রানাকে একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়াতে বলল সে। ব্যাগ থেকে একটা পোলারয়েড ক্যামেরা বের করে পাসপোর্ট সাইজের ফটো তুলল ওর। তার আগে বেয়াড়া জুলফিটাকে জোরাল চাপ দিয়ে জায়গামত বসিয়ে নিতে ভোলেনি। শাটার টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে এল ফটো।

ফটোটা নিয়ে জিয়া হাসানের আইডি-তে লাগাল রানা। হাসানের ফটো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল খরস্রোতা নদীতে।

কাজ সেরে তখনই আবার গাড়িতে ফিরল ওরা।

'তা দুঃসাহসী মেয়েটির নামটা কি?' জানতে চাইল রানা। 'কার সঙ্গে চলেছি আমি? শায়লা, নাকি আর কেউ?'

'সত্যি দুঃখিত!' বলে হুইল থেকে নামিয়ে রানার দিকে ডান হাতটা বাড়াল মেয়েটি। 'আমি শায়লাই…শায়লা আলাউয়ি।'

রানার মনে পড়ল, দাদুর মেসেজে বলা হয়েছিল তৈয়বিয়া অ্যান্ড ব্রাদার্স-এর ওয়্যারহাউস থেকে আলাউয়ি নামে কেউ একজন তুলে নেবে ওকে। হাতটা একবার ধরেই ছেড়ে দিল রানা। 'ব্রিগেডিয়ার এরিক কারমেল সম্পর্কে যা বললেন সে-সব সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'দেখা যাচ্ছে আমাকে পিক করার জন্যে পাঠানো হয়েছে

শত্রুর বন্ধুকে,’ হেসে উঠে বলল রানা।

শায়লা কিছু বলছে না।

‘প্রফেশনাল না হওয়া সত্ত্বেও বিপদটা যেভাবে ফেস করলেন, প্রশংসা না করে পারছি না,’ বলল রানা।

কেমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শায়লা।

‘পারদেস হাননা বা হাডেরা-য় কেন নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? জানতে পারি জায়গাটা ঠিক কোথায়?’

‘লেকের অপর পারে,’ বলল শায়লা।

‘খাদেমুল দাউদ, মানে দাদুকে পাব ওখানে?’

‘আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

‘ফর গড’স সেক, শায়লা, স্পিড আরেকটু বাড়ান!’ তাগাদা দিল রানা। ‘কাজ সেরে তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে চাই। জানেনেই তো, জেল ভাঙা কয়েদি, ধরতে পারলে...’ গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করল রানা, ‘একেবারে খতম করে দেবে।’

আট

মেঘে মেঘে ভারী হয়ে থাকা আকাশটার মত পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজির মনটাও খুব ভার হয়ে আছে। ব্যাপারটা সংক্রামক, বাথরুমে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার সময় কথাটা মনে

হলো তাঁর। শুধু তিনি বা প্রকৃতি নয়, বিষণ্ন তাওহিদাও। আমরা আল শাহরিয়ারের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, ভাবলেন তিনি। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট যা-ই দিক, সবাই ধরে নেবে লেভি মুভিনকে কয়েদি আল শাহরিয়ারই খুন করেছে। তার নিজের করার সুযোগ ছিল না, তাই বাইরের কোনও লোককে দিয়ে করিয়েছে। এ না হয়েই নয়!

দাড়ি কামিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছেন, বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তাওহিদা। 'তোমার ফোন। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার।'

স্ত্রীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন খিলজি, কপালের মাঝখানে চিন্তার গভীর রেখা ফুটছে। 'বুঝেছি, ঠাট্টা করছ তুমি।'

মাথা নাড়ল তাওহিদা, সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'তোমার ব্রেকফাস্ট মাইক্রো আভনে গরম করতে দিচ্ছি, তোমাকে বোধহয় তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে হবে।'

লিভিংরুমের দিকে এগোবার সময় একটা শার্ট পরলেন খিলজি, ট্রাউজারে গুঁজছেন। নিশ্চয়ই খুব বড় কিছু হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের ফোন করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। রিসিভার তুলে লিভিংরুমের দেয়ালে হেলান দিলেন তিনি। 'সুপার খিলজি বলছি, সার।'

'মর্নিং, খিলজি। নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্টের টেবিল থেকে তুলে এনেছি?'

'এবারই প্রথম নয়, সার,' বললেন খিলজি।

'আবিল আহুদ বেরিয়ে গেছে।'

অকস্মাৎ মাথাটা এত বেশি হালকা লাগল, রীতিমত অসুস্থ বোধ করলেন বখতিয়ার খিলজি। বড় করে শ্বাস নিয়ে চোখ বুজে

আবার খুললেন। ‘কখন?’

‘রাতে। কে জানে কখন! সকাল সাতটায় ওদেরকে বের করার সময় ব্যাপারটা জানা গেছে। জেলার এইমাত্র মোসাদ চিফ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন।’

‘আশ্চর্য, বেরুল কীভাবে?’

‘কেউ কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে না। সঙ্গের বুড়োটাকে হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে রেখে বেরিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিকই একটা ব্যাখ্যা বের করা হবে, তবে প্রথমবার দ্রুত চেক করে কিছুই পাওয়া যায়নি।’

‘কিন্তু এলাকা ছেড়ে যায় কীভাবে?’ জানতে চাইলেন খিলজি। ‘সেটা তো প্রায় অসম্ভব।’

‘দায়িত্বটা আপনাকে দেয়া হচ্ছে,’ বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। ‘তদন্ত করে বের করুন।’

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন পুলিশ সুপার খিলজি। ‘দুঃখিত, সার, এবার অন্তত নয়।’

‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস্‌কল রায়ান-এর নির্দেশ; **না** শব্দটা তিনি শুনতে চাইবেন না, মিস্টার খিলজি। যুক্তিও আছে, প্রথম থেকে কেসটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন আপনি।’

এদিক থেকে কথা বলছেন না পুলিশ সুপার।

‘আপনার আপত্তিটা কী কারণে, সুপার?’

‘কারণটা ব্যক্তিগত, সার।’

‘কাছেই, জেরিকোয়, একজন মোসাদ এজেন্ট আছে। হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে এই কেসে মোসাদের প্রতিনিধিত্ব করবে সে। কোথায় দেখা হবে, ফোন করে জানিয়ে দিন তাঁকে আপনি। নম্বরটা বলছি, লিখে নিন।’ লেখার কাজ শেষ হতে আবার শুরু

করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। 'ভদ্রলোকের নাম তারিকি, মিরাজ তারিকি। আপনারা দুজন একটা টিম হিসাবে কাজ করবেন, মিস্টার খিলজি।'

বিড়বিড় করলেন পুলিশ সুপার, 'ইয়েস, সার।' রিসিভার নামিয়ে রেখে এক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থেকে কিছু চিন্তা করলেন তিনি। তারপর ডায়াল করে জেলখানায় আসতে বললেন মোসাদ এজেন্ট তারিকিকে। কাজটা শেষ করে প্যাসেজে বেরিয়ে এসে কিচেনে উঁকি দিলেন তিনি।

মাইক্রো-আভনের দিকে পিছন ফিরে স্বামীর দিকে তাকাল তাওহিদা। হাতের প্লেটে তুলছিল স্বামীর জন্য নাস্তা।

চোখাচোখি হতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন খিলজি। 'শুধু এক কাপ কফি, তাওহিদা। আমাকে এখনই বেরুতে হচ্ছে।'

কাপে কফি ঢেলে টেবিলে রাখল তাওহিদা। কপাল থেকে চুল সরাল, স্বামীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই বুকের ভিতরে কী চলছে তার। 'সিরিয়াস কিছু একটা হয়েছে,' অবশেষে নীরবতা ভাঙল সে। 'আমাকে তুমি বলছ না কেন?'

'ব্যাপারটা আল শাহরিয়ারকে নিয়ে। আল্লাহই জানেন কীভাবে, ভদ্রলোক জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। বাবা চাইছেন, কেসটা আমি তদন্ত করি, মোসাদের একজন এজেন্টকে নিয়ে।'

বাবা মানে এস্‌কল রায়ান, ইজরায়েলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'সে কি! এ তাঁর ভারি অন্যায়...' অকারণ রাগের সঙ্গে শুরু করল তাওহিদা।

'দায়িত্বটা প্রথমে আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তাওহিদা, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমি একজন পুলিশ অফিসার, আমার

উচিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া।'

'কিন্তু তাঁকে কি তুমি ধরবে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল তাওহিদা; কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, ব্যাকুলতাও কম নেই।

'সুযোগ পেয়েও যদি না ধরি, নীতি বলে কিছু থাকবে না আমার,' বললেন বখতিয়ার খিলজি। 'তা হলে আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব। আর যদি ধরি, জাতির সঙ্গে বেঈমানী করা হবে; একজন নিঃস্বার্থ, মহান মানুষকে করা হবে খুন। এটাকে একটা ক্লাসিকাল উভয়সংকট বলা ছাড়া উপায় নেই, তাওহিদা। এখনও জানি না কী করব আমি।'

'কেসটা না নিলেই ভাল করতে তুমি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তাওহিদা। 'তোমার জন্যে এ তো অগ্নিপরীক্ষা।'

'যিনি পাঁচ বছর বয়েসে রাস্তা থেকে কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে গেছেন আমাকে, সযত্নে খেতে-পরতে দিয়েছেন, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নামকরা স্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন, যাঁকে আমি বাবা বলে ডাকি, তাঁর কথা অমান্য করব?'

'এখন তা হলে কী হবে, বখতিয়ার?' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল তাওহিদা। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'জানি না।' শুধু এটুকু জানি যে সুযোগ পেলে তাঁকে আমার ধরতে হবে, তাওহিদা,' বললেন খিলজি। 'আমি একজন পুলিশ অফিসার, আইন অমান্যকারীকে ধরে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোই আমার কাজ।'

'কিন্তু, বখতিয়ার, তিনি প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করছেন – অনেকদিন ধরে!'

'গড ইন হেভেন, তুমি কি ভেবেছ আমি তা জানি না?'

একটা হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে স্বামীর গাল স্পর্শ করল

তাওহিদা। তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে।

সেটা দেখেও না দেখার ভান করে চেয়ার ছাড়লেন বখতিয়ার খিলজি। 'আমি যাই, তাওহিদা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।' ধীর পায়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোমবার।

বিকেল চারটের দিকে রানাকে নিয়ে লেকের ধারে পৌঁছে ফেরিতে চড়ল শায়লা। বোটটায় তেমন লোকজন নেই, পিছনদিকের রেলিং-এর কাছে দাঁড়াল ওরা।

'কেমন লাগছে আপনার আমাদের দেশটা?' বলার পর আড়ষ্ট একটু হাসল শায়লা। 'কথাটা বোধহয় বোকার মত হয়ে গেল। প্যালেস্টাইনে এর আগেও অনেকবার এসেছেন আপনি।'

'তাও জানেন?'

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুরু করল শায়লা, 'আপনার সম্পর্কে এত কথা শুনেছি, বলতে পারেন আমি রীতিমত আপনার একজন ফ্যা...' সময়মত নিজেকে সামলে নিতে পারলেও, চেহারার লাল হয়ে ওঠাটা ঠেকাতে পারল না সে। 'ইয়ে, মানে, আমি আসলে বলতে চেয়েছি – হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই জানি আমি।'

'এই জায়গাটা ভারি সুন্দর,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'অনেকবার এলেও, সব সময় প্রাণ হাতে করে ছুটোছুটি করতে হয়েছে, কাজেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় পাওয়া যায়নি।'

লেক পার হওয়ার কিছুক্ষণ পর একটা গিরিপথে ঢুকল ওদের গাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে হেফযি বাহ্ নামে ছোট একটা

শহরের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা।

এদিকে সাগর ঘেঁষে দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্য গড়ে উঠেছে বেশ কিছু হোটেল ও কটেজ। রাস্তাটা ঝকঝক তকতক করছে।

বিপদের আভাস পাওয়া গেল একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। 'এখানে হেলিকপ্টার গানশিপ কেন?' হঠাৎ বিড়বিড় করল রানা।

'কই!' নার্ভাস দেখাল শায়লাকে। 'কোথায়?'

কান পাতল রানা। 'মনে হচ্ছে কয়েকটা ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি। ওরা আমাদেরকে থামতে বলবে না তো?'

'কেন, একথা কেন বলছেন?' রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের আকাশে মেশিন গান ফিট করা কালো কুচকুচে একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছে শায়লা। ওটার গতিবিধি দেখে তারও মনে হলো, যেন ওদের উপরেই নজর রাখা হচ্ছে।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে মাথার উপরের আকাশটা দেখবার চেষ্টা করল রানা। 'শুধু সামনে নয়, পেছনেও আছে একটা। ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমাদেরকে অনুসরণ করে আসছে।'

'চোরের মন পুলিশ-পুলিশ নয়তো?' নার্ভাস একটু হেসে জানতে চাইল শায়লা।

তার কথা শেষ হতে না হতে লাউডহেইলার থেকে নির্দেশ ভেসে এল। প্রথমে ইংরেজি, তারপর আরবী ভাষায়: 'এটা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন! এটা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন! আমরা সন্দেহ করছি আপনাদের মধ্যে আত্মঘাতী জঙ্গি থাকতে পারে। সন্দেহ করছি আশপাশে সুইসাইড বম্বার থাকতে পারে। সামনের

রাস্তায় ব্যারিকেড ফেলা হয়েছে, প্রতিটা গাড়ির ড্রাইভারকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ুন। যে যার রাস্তায় থাকুন, অন্য কোনও দিকে যাবার ঝুঁকি নেবেন না। সেরকম কিছু করতে দেখলে বিনা নোটিসে গুলি করা হবে। আবার বলছি...'

'কী করব?'

'গাড়ি থামান। এখনই!' নির্দেশ দিল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে টয়োটা দাঁড় করিয়ে ফেলল শায়লা। 'এখন কী হবে?' ঢোক গিলল শায়লা।

'খারাপ যদি কিছু হয়, আমার ভুলে হবে,' বলল রানা। 'আপনি আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছেন – আমার নাম জিয়া হাসান, মিউনিসিপ্যালিটির স্লটারহাউস ইন্সপেক্টর, বিভিন্ন শহরে সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে দেখতে হয় হালালভাবে সব কিছু হচ্ছে কি না...'

'ট্রাক ভর্তি সৈন্য আসছে!' ফিসফিস করল শায়লা।

দেখতে দেখতে পাঁচ-সাতটা সৈনিক ভর্তি ট্রাকে ভরে উঠল রাস্তা। লাফ দিয়ে নীচে নামছে তারা, শৃংখলা বজায় রেখে দলে দলে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একটা দল রাস্তার পাশে এক সারিতে দাঁড়াল, পঁচিশ ফুট পরপর।

সামনের রাস্তায় আগেই ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে।

দশজন সৈনিকের একটা দল এগিয়ে এল দাঁড়িয়ে পড়া যানবাহনের দিকে।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

রোড ব্লকের একেবারে সামনের গাড়ির তিন আরোহীকে নীচে নামানো হলো। দুজন সৈনিক গাড়ির ভিতরটা সার্চ করতে ঢুকল,

একজন এক এক করে আরোহীদের দেহ তল্লাশি করল। পাঁচ মিনিট সার্চ করবার পরও কিছু পাওয়া গেল না। ব্যারিকেড উঁচু করা হলো, তার নীচ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

একই দৃশ্যের অবতারণা হলো দ্বিতীয় গাড়িটার বেলায়ও। রানার টয়োটা ও দ্বিতীয় গাড়িটার মাঝখানে আর মাত্র চারটে গাড়ি।

'সবাইকে সার্চ করছে ওরা, গাড়িও বাদ দিচ্ছে না,' শুকনো গলায় বলল শায়লা। 'পিস্তলটা কী করবেন?' ওটা এখন রানার কাছে।

কীভাবে সার্চ করা হচ্ছে দেখার পর এই সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে রানা। 'একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও। 'ওরা কাছে চলে আসার আগেই গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ি আসুন। দরজা খোলার সময় পিস্তলটা নীচে ফেলে দেব, তারপর পায়ের খোঁচা দিয়ে গাড়ির তলায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।' এটাও ভাল কোনও সমাধান নয়, জানে ও। প্রথমত, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে, কাছেই, দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী সৈনিক, ওরা নামছে টের পেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে ওদের দিকে – তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাজটা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তা ছাড়া, গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে দেখা যাবে পিস্তলটা পড়ে রয়েছে ওখানে, ওদেরকে ধাওয়া করে ধরা তখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

'ওটা বরং আপনি আমাকে দিন,' দ্রুত বলল শায়লা। 'জলদি!

'কেন, কী করবেন?' বেল্ট থেকে টান দিয়ে বের করল রানা পিস্তলটা, চোখ ঘুরিয়ে সৈনিকদের মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে।

ওর হাত থেকে ছোঁ দিয়ে পিস্তলটা নিল শায়লা। 'আপনি অন্যদিকে তাকান, প্লিজ,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

অন্যদিকে ফিরলেও, চোখের কোণ দিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করল রানা ঠিক কোথায় রাখা হলো অস্ত্রটা।

তারপর এক সময় ওদের পালা শুরু হলো। প্রথমে ওদের পরিচয়-পত্র দেখতে চাইল ইজরায়েলি সৈন্যরা। ওরা দুজন ভালই অভিনয় করে যাচ্ছে। পুরুষটি, অর্থাৎ রানার চোখে-মুখে চাপা ক্রোধ ও লুকিয়ে রাখা ঘৃণার আভাস; তরুণীর চেহারা বরফের মত শীতল, হাত দুটো শক্ত মুঠো করা, দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো।

পরিচয়-পত্রে নামকাওয়াস্তে চোখ বুলাল একজন সৈনিক। ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'অসুবিধে হওয়ার জন্যে দুঃখিত। এবার নীচে নামুন, প্লিজ, আপনাদের বডি ও কার সার্চ করা হবে।'

নীচে নামল ওরা।

রানার হার্টবিটা ক্রমশ বাড়ছে, যদিও বাইরে থেকে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। তবে শায়লা হঠাৎ বড় বেশি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমে রানাকে সার্চ করা হলো। থাকলে তো কিছু পাবে। এবার শায়লার পালা। কেন যেন আশপাশে কেউ কোনও শব্দ করছে না। ইহুদি সৈনিকরা কী একটা প্রত্যাশায় শায়লার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওয়েট!' মাথার উপর সগর্জনে চক্কর দিচ্ছে জোড়া হেলিকপ্টার গানশিপ, তারপরেও অত্যন্ত ভারী শোনাল রানার কণ্ঠস্বর।

শায়লাকে সার্চ করতে যাচ্ছিল একজন সৈনিক, তার হাত স্থির হয়ে গেল।

'আপনাদের মধ্যে মহিলা সৈনিক নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মুসলমান মেয়ের গায়ে অন্য কোনও পুরুষ হাত দেবে কীভাবে?'

‘ও, হ্যাঁ, তাই তো!’ সৈনিকদের সঙ্গে উপস্থিত ক্যাপটেন এমন ভাব দেখাল, কথাটা যেন তার মনে ছিল না।। ‘ঠিক আছে,’ বলল সে, ‘দেখি কী করা যায়। কমান্ডারের জিপে দুজন মহিলা সৈনিক থাকার কথা... এই, দেখো তো...’

একজন সৈনিক ছুটল কমান্ডারের জিপের দিকে। ওদের টয়োটার পঞ্চাশ-ষাট গজ পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা।

এক মিনিট পর আবার ছুটে ফিরে আসতে দেখা গেল সৈনিকটিকে। দূর থেকেই মাথা নাড়ছে।

শায়লার দিকে ফিরল ক্যাপটেন। ‘কিছু যদি মনে না করেন, প্লিজ, মাথার স্কার্ফটা খুলে ফেলুন, খুলুন ট্রেঞ্চকোটটাও, আর শার্টটা একটু উঁচু করুন – তা হলেই হবে।’

প্রথমে মাথার স্কার্ফ খুলল শায়লা। ‘হয়েছে দেখা?’ ঝাঁঝাল সুরে জিজ্ঞেস করল। ক্যাপটেন মাথা ঝাঁকাতে আবার স্কার্ফটা যত্ন করে পরল মাথায়। তারপর ট্রেঞ্চকোট খুলল। সেটা ভাঁজ করে রেখে দিল টয়োটার ছাদে। তারপর সাদা পপলিনের শার্টটা তুলল, নীচের প্রান্ত উঠে এল গুরুনিতম্ব ছাড়িয়ে আরেকটু উপরে।

আর সবার মত রানাও খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। ইজরায়েলি সৈনিকরা বুঝতে চাইছে তার শরীরে বোমা লুকানো আছে কি না, রানা খুঁজছে জিনসের উপর বেমানান, ফোলা কোনও অংশ।

নেই।

রানা মোটামুটি নিশ্চিত, পিস্তলটা উরুসন্ধিতে কোথাও লুকিয়েছে শায়লা। সেটার কোনও আভাস না পাওয়ার কারণ হয়তো এই যে তার পরনের জিনস মোটেও আঁটসাঁট নয়।

সন্দেহ করবার কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তারপরও সময় যেন স্থির হয়ে থাকল। অন্তত যতক্ষণ না ক্যাপটেন বলল, ‘ঠিক আছে,

আপনারা যেতে পারেন। সহযোগিতা করার জন্যে ধন্যবাদ। নেক্সট!’

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল রানার।

তারপর হঠাৎ শায়লাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল ও। পরিবেশ-পরিস্থিতি গ্রাহ্য না করে চুমো খেল তার ঠোঁটে।

দৃশ্যটা দেখে হাসাহাসি করছে ইজরায়েলি সৈন্যরা। তারা তো আর জানে না প্রচণ্ড টেনশনে ভোগার পর বিপদ কেটে যাওয়ায় ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল শায়লা, টলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল। হঠাৎ তাকে অসুস্থ হতে দেখলে সৈনিকরা সন্দেহ করতে পারে, এই ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে বাধ্য হয়েছে রানা।

অন্তত হেফজি বাহ্ শহর থেকে বেরুবার সময় শায়লাকে এরকম একটা ব্যাখ্যাই দেওয়ার চেষ্টা করল রানা। তবে মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল শায়লা, বলল, ‘কোনও কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার জায়গায় আমি হলেও ঠিক এই কাজই করতাম।’

বেশ অনেকক্ষণ হলো মেঠো পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। পথের দু’পাশে লবণাক্ত ও পরিত্যক্ত জলাভূমি। জলার পানিতে লবণের মাত্রা বেশি হওয়ায় চাষবাস হয় না বললেই চলে।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানা, হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। ঝট করে সেদিকে তাকাতে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর স্যাৎ করে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখল ও। তার কাঁধের উপর খাড়া হয়ে থাকা লম্বা লাঠিটা রাইফেলের ব্যারেলও হতে পারে।

‘আপনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি রুস্তম,’ মৃদু হেসে বলল শায়লা। ‘দাদুর বডিগার্ড ও। আরও দুজন আছে – মুহাদিয়া ও জিগলু।’

‘এরা সবাই পিএলও-র ক্যাডার?’

মাথা নাড়ল শায়লা। ‘দাদু পুরানো, পরিচিত, দলীয় লোকজনকে যতটা পারা যায় এড়িয়ে চলছেন,’ বলল সে। ‘এদের মধ্যে শুধু একজন, মুহাদিয়া, একসময় হামাস-এর সদস্য ছিল। বাকি দুজন রেলওয়ের ছাঁটাই হওয়া কর্মচারী, তার বন্ধু, নিজের হাতে ট্রেনিং দিয়ে দাদুর বডিগার্ড হিসেবে কাজে লাগিয়েছে।’

ইজরায়েলি সরকার স্লটারহাউস বানাবার জন্য এদিকটা লিজ দিয়েছিল বছর কয়েক আগে, তখনই বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে স্লটারহাউস মাত্র কয়েকটা, বেশিরভাগই ফার্মহাউস ও ট্যুরিস্টদের জন্য সুন্দর সুন্দর কটেজ। এগুলো সবই পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে।

কথায় কথায় শায়লা জানাল, এদিকের স্লটারহাউসগুলোর মালিক সবাই মুসলমান, এখানে জবাই করা গরু-ছাগলের হালাল মাংস তেল আবিবে তো যায়ই, মিশরেও রফতানী করা হয়।

গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে ফার্মহাউসটার সামনে থামল গাড়ি। কাছেই সাগর। বোল্ডার ও পাহাড় প্রাচীরে একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জন ভেসে আসছে।

‘হঠাৎ দরকার হলে পালাবার কী ব্যবস্থা?’ জানতে চাইল রানা।

‘কার? আপনার?’ হাসছে শায়লা।

‘দাদুর?’

‘গোপন একটা টানেল আছে, দালানের ভেতর থেকে বেরিয়ে সৈকতের কাছাকাছি একটা কুয়ার সঙ্গে মিশেছে। কুয়াটা ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানে, বলে না দিলে দেখতে পাওয়া কঠিন।’

‘পালানোর জন্যে তা কি যথেষ্ট?’ রানার গলায় সংশয়।

‘সৈকতের ওখানটায় পাশাপাশি একজোড়া হেডল্যান্ড আছে,’ বলল শায়লা। ‘ওগুলোর মাঝখানে আছে একটা লঞ্চ। এটাও, বলে না দিলে, কেউ দেখতে পাবে না।’

রানার চোখে সংশয়। ‘কিন্তু একটা লঞ্চ নিয়ে কীভাবে পালানো সম্ভব? ইজরায়েলি কোস্টগার্ড ধাওয়া করলে?’

‘প্রশ্নটা আমিও করেছিলাম,’ বলল শায়লা। ‘শুনে হাসলেন দাদু, বললেন, জেনারেল মোটরস-এর নতুন মডেলের একজোড়া ইঞ্জিন ফিট করা হয়েছে ওটায়, স্পিড ঘণ্টায় বিশ নট-এর কিছু বেশি – ইজরায়েলি কোস্টগার্ড কেন, ওদের নৌবাহিনীরও সাধ্য নেই ধাওয়া করে ধরে ওটাকে।’

‘গুড।’ মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো রানা।

ইঞ্জিন বন্ধ করে শায়লা বলল, ‘এই ফার্মহাউসের মালিক আমরা নই। দাদুকে লুকিয়ে রাখার জন্যে ভাড়া নেয়া হয়েছে। টানেল ও কুয়া বডিগার্ডদের সাহায্য নিয়ে নিজেই বানিয়েছেন তিনি।’

‘ভাড়া নেয়া হয়েছে কতদিনের জন্যে?’ জানতে চাইল রানা।

‘এক বছর।’

‘এক জায়গায় এতদিন?’

‘এরচেয়ে কম সময়ের জন্যে ভাড়া নেয়া হলে সন্দেহ জাগত,’ বলল শায়লা, তারপর প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, ‘দাদুকে আপনি শেষ কবে দেখেছেন?’

'বছর পাঁচেক আগে।'

'অনেক বদলে গেছেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে রিয়্যাক্ট করবেন না, প্লিজ। গর্বিত একজন মানুষ, নিজেকে এখনও সক্ষম ভাবতে ভালবাসেন।'

উত্তরে রানা কিছু বলবার আগেই ওর পিছনের একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল। ঝট্ করে ঘুরল ও। হাতের চকচকে ছড়িটায় ভর দিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ, মাথাটা সামনের দিকে একটু বাড়ানো, কাঁধ দুটো উঁচু করা।

'মাসুদ রানা!' কর্কশ কণ্ঠস্বর, আওয়াজটা যেন গলার ভিতর ঘন কফের বাধা পেয়ে ঘড় ঘড় করে উঠল। 'আমি জানতাম তুমি আসবে। থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ!'

ভাঙাচোরা, বিধ্বস্ত একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে রানা। একটা ঢোক গিলে এগোল ও, হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল। 'আপনি ডাকলে আমাদেরকে তো আসতেই হবে, দাদু,' বলল ও। খাদেমুল দাউদের লোলচর্মসর্বস্ব হাতটা ধরে সাবধানে ঝাঁকাল। 'কেমন আছেন?'

জড়িয়ে ধরলেন ওকে বৃদ্ধ।

'এতদিন ভাল ছিলাম না, রানা। এখন বোঝাটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে বাকি কটা দিন ভাল থাকব,' বললেন দাদু, ঘুরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দু'-পাশের দেয়ালে সাদা চুনকাম করা প্যাসেজ ধরে এগোলেন। পিছু নিল রানা, দেখল তাঁর হাড়সর্বস্ব শরীরে ঢোলা আলখেল্লা অসংখ্য ভাঁজ হয়ে ঝুলছে। 'পথে খারাপ কিছু ঘটেনি তো? কোনও বিপদ?'

লিভিং রুমে শুধু একটা টেবিল ও ক'-টা ভাঙা চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। মেঝেতে সুতো বেরুনো তেরপল বিছানো, এত

পুরানো যে রঙটা চেনার উপায় নেই।

ধীরে-সুস্থে, সংক্ষেপে রিপোর্ট করল শায়লা।

একটা চেয়ারে বসে সশব্দে হাঁপাতে লাগলেন দাদু। 'দেখা যাচ্ছে, নেহায়েত ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছ তোমরা।'

'এত হাঁপাচ্ছেন, কী হয়েছে আপনার?' জানতে চাইল রানা, শায়লার দিকে তাকাচ্ছে না। দাদুর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল।

কাঁধ ঝাঁকালেন খাদেমুল দাউদ। 'সারাটা জীবন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে এখন শরীরের আর কী দোষ দেব, বলো?'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা। 'কী বলছেন তাঁরা?'

'কীসের অসুখ? আমার তো কোনও অসুখ নেই। আমি ক্লান্ত, ব্যস। কাঁধ থেকে বোঝাটা নেমে গেলে সব ক্লান্তি মুছে যাবে, আবার আমি তাজা, ঝরঝরে হয়ে উঠব...' কথা শেষ হলো না, খক খক করে অদম্য কাশিতে শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল তাঁর।

দৃষ্টিতে খানিকটা অনুযোগ নিয়ে রানার দিকে একবার তাকাল শায়লা, তারপর এগিয়ে এসে দাদুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

দু'মিনিট পর শান্ত হলেন খাদেমুল দাউদ।

দরজার দিকে এগোল শায়লা। 'আমি আপনাদের জন্যে কফি করে নিয়ে আসছি।'

সময় নষ্ট না করে রানা জানতে চাইল, 'জরুরি ডাকটা কী কারণে, দাদু?'

'এত তাড়া কীসের, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ ফিলিস্তিনি নেতা। 'তা ছাড়া, গতরাত থেকে দৌড়ের ওপর আছ তুমি, ঘুমাবার সুযোগ পাওনি। কফিটা খেয়ে যাও, প্রথমে লম্বা একটা

ঘুম দাও, তারপর শায়লার তৈরি সাপার খেয়ে কাজের কথা শুরু করা যাবে।'

- 'জী, না, দাদু,' সবিনয়ে বলল রানা। 'প্রথমে কেন ডেকেছেন শুনে টেনশনমুক্ত হয়ে নিই, তারপর বিশ্রাম নেব।'
- একটা হাত উঁচু করলেন খাদেমুল দাউদ, পিএলও-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।। 'আমার পাশে এসে বসো, রানা।'
- উঠে এসে তাঁর পাশের চেয়ারটায় বসল রানা। 'আমাকে কি করতে হবে, সংক্ষেপে সে-সম্পর্কে শুধু একটু ধারণা দিন। ক্লান্ত শরীর নিয়ে আপনাকে বেশি কথা বলতে হবে না।'
- 'দুয়েকটা কথায় ব্যাপারটা সেরে ফেলা যায়,' বললেন দাদু। 'কোনও ভূমিকার দরকার নেই, প্রয়োজন নেই কোনও জল্পনা-কল্পনারও। কথাটা হলো, আমাদের প্রয়াত নেতা, মরহুম ইয়াসির আরাফাত, একটা ডায়েরি রেখে গেছেন। ডায়রিটা লেখা হয়েছে তাঁর রহস্যময় অসুস্থতার সময়। অর্ধেক লেখার পর তিনি গোপনে সেটা আমাকে দেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে।'
- 'নিজের হাতে লেখা? নাকি তিনি শুধু মুখে বলেছেন, অন্য কেউ লিখেছে?' জানতে চাইল রানা।
- মাথা নাড়লেন দাদু। 'পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের নিজের হাতে লেখা ডায়েরি ওটা। শুধু টপ সিক্রেট নয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতরও।'
- 'কী আছে তাতে?'
- 'কী আছে তা তুমি এখনই জানতে পারছ না,' বললেন দাদু। 'কারণ ডায়েরিটা আমি রেখে এসেছি তেল আবিবের কাছাকাছি আমার একটা সেফ হাউসে – শেফাইমে।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুললেন তিনি, তারপর সেই হাতটা ঢোলা

আলখেল্লার পকেটে ঢোকালেন। 'তবে,' বললেন, 'ডায়েরিতে লেখা মিস্টার আরাফাতের একটা নির্দেশনা আমি টুকে নিয়ে এসেছি। সেটা এখন তোমাকে পড়ে শোনাব।'

- 'নির্দেশনা?' বিস্মিত হলো রানা। 'মিস্টার আরাফাতের নির্দেশনা? কার প্রতি, দাদু?'

- 'আমার।' পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে রানাকে দেখালেন দাদু।

- আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা।

- '১৯৬৪ সালে পিএলও প্রতিষ্ঠিত হয়,' শুরু করলেন দাদু খাদেমুল দাউদ, ভাঁজ খোলা হাতের কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'সেই তখন থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নগদ টাকা, সোনার গহনা ও দামি পাথর জমা হয়েছে পিএলও-র ফান্ডে।

- 'মিস্টার আরাফাত জীবিত থাকা পর্যন্ত নগদ টাকা পাওয়া গেছে সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই টাকার বেশিরভাগই এসেছে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছ থেকে সাহায্য বা চাঁদা হিসাবে, কিছু পাওয়া গেছে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন সরকারের থোক বরাদ্দ থেকে। তবে প্রসঙ্গত এ-কথাও বলা দরকার যে, পরিচয় গোপন রাখা হবে এই শর্তে ভারতীয় রাজনীতির প্রথমসারির অন্তত তিনজন অমুসলিম নেতা, ইউরোপ-আমেরিকার বহু নামকরা খ্রিস্টান বিজ্ঞানী আর অভিনেতা-অভিনেত্রী এই ফান্ডে মোটা টাকা দান করেছেন। অনেক টাকাই ফেদাইনদের জন্যে অস্ত্র আর গোলাবারুদ কিনতে খরচ করেছি আমরা, তার পরেও রয়ে গেছে মেলা টাকা।

- ‘তবে মূল্যবান রত্ন ও সোনায় হাত দেয়া হয়নি। দামি পাথরগুলো পাঠিয়েছেন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় ফিলিস্তিনি ব্যবসায়ীরা। আর সোনা এসেছে গোটা বিশ্বের সাধারণ নারী-পুরুষের কাছ থেকে – লক্ষ লক্ষ আঙটি, ব্রেসলেট, নেকলেস, কানের দুল, ইয়ারিং, বোতাম ইত্যাদি।
- ‘তোমাদের মিষ্টি বাংলায় আছে না, বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু? এ যেন ঠিক তাই। তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে জমা হওয়া ছোট ছোট জিনিসগুলোর ওজন দাঁড়ায় কয়েক টন। দামী পাথরগুলোর বেশির ভাগই সুইস ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়েছে। তবে সংরক্ষণে সমস্যা দেখা দেয়ায় গলিয়ে সোনার বার তৈরি করা হয়েছে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার।
- সবই মিস্টার আরাফাতের কাছে রাখা ছিল গোপন জায়গায়। মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে আমাকে ডেকে পাঠান তিনি। ডায়েরিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এতে লেখা আছে টাকা, দামি পাথর আর সোনার বারগুলো কোথায় আছে, এবং ওগুলো দিয়ে কী করতে হবে।’
- ‘কী করতে হবে?’ রানা কৌতূহলী।
- ‘এটা আমার ওপর আমার প্রিয় নেতার নির্দেশ,’ বললেন দাদু। ‘অনেক কষ্টে বললেন: তোমার জীবদ্দশায় যদি দেখ হামাস ওদের কট্টর নীতি ছেড়ে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছে, জানবে ওরা ভয়ানক অর্থকষ্টে পড়তে যাচ্ছে। তখন ওই সোনার বার, ডলার আর সুইস ব্যাঙ্কে জমা রাখা যা আছে সব তুমি হামাসের তিন নেতার যে-কোনও একজনের হাতে তুলে দেবে।’

- ‘আমার শুনতে ভুল হচ্ছে না তো, দাদু?’ রানা বিস্মিত। ‘হামাস কখনও মিস্টার আরাফাতকে সমর্থন করেনি, তিনিও তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সহিংস নীতি মেনে নিতে পারেননি।’
- ‘না, শুনতে তোমার ভুল হচ্ছে না, রানা,’ নরম গলায় আশ্বস্ত করলেন খাদেমুল দাউদ। ‘এরকম একটা নির্দেশনা কেন তিনি দিয়ে গেছেন, সময় আর সুযোগ পেলে আরেকদিন সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলব আমি। আজ বলি এই জ্বলন্ত কড়াই-এ কেন তোমাকে ডেকে এনেছি।’
- মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘কেন, দাদু?’
- ‘মিস্টার আরাফাতের নির্দেশ মানতেই হবে আমাকে,’ বললেন দাদু। ‘সোনার বার, ডলার, হীরা-জহরত আর সুইস ব্যাঙ্কের কাগজ-পত্র যেভাবে হোক তিনজন সৎ হামাস নেতার যে-কোনও একজনের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু পিএলও-র বেশিরভাগ নেতা-কর্মী যেখানে আদর্শ হারিয়ে টাকার পেছনে ছুটছে, হামাস যেখানে আমাকে খুন করতে চায় – আমি নিজে অসুস্থ, অথর্ব হয়ে পড়েছি, সেখানে আমার হয়ে কে করবে এই কাজ? আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়।
- ‘কী করা যায় ভাবছিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ওই তিন নেতার একজনের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক আছে তোমার। তুমি তাকে বিশ্বাস করো, সে-ও তোমাকে পছন্দ করে। ভাবলাম, আর কোনও উপায় যখন নেই, আমার দাদুভাই মাসুদেরই সাহায্য নেব।’
- কী করতে হবে বুঝতে পারছে রানা। ‘বলুন, দাদু। নামটা কী তার?’
- ‘শেখ বুরহানুদ্দিন হামাদান।’

- নামটা শোনামাত্র নিঃশব্দে একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হামাসের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম বুরহানুদ্দিন হামাদানকে বিশ্বাস করা যায় – ইয়াসির আরাফাত কোনও ভুল করে যাননি। তাঁর হাতে পড়লে এই সম্পদের একটা কণাও অপব্যয় হবে না।
- এরপর দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন দাদু: বর্তমানে শেফাইম সেফহাউসের ঠিক কোথায় রয়েছে আরাফাতের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ, সেখানে যাওয়ার কী ব্যবস্থা, সেখান থেকে কবে ও কীভাবে রওনা দিয়ে হামাস নেতার কাছে পৌঁছাতে হবে রানাকে ইত্যাদি বললেন। শোনালেন একটা অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার কথাও। আরাফাতের সেফহাউসের কথা কীভাবে জানি প্রকাশ হয়ে যায় ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কাছে...
- 'নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক ছিল আপনাদের ভেতর,' বলল রানা।
- 'হ্যাঁ, আমাদের কারও কাছ থেকে খবর পেয়ে মাসতিনেক আগে রেইড করেছিল ওরা। একটু আগে-ভাগে টের পেয়ে আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর পাঁচটা ট্রাকে তুলে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে ধন-সম্পদ আরেক সেইফহাউসে। কিন্তু শেষ ট্রাকটা অ্যাকসিডেন্ট করে ধরা পড়ে যায় শত্রুর হাতে। ওতে ছিল ডলার আর হীরার ব্যাগ। সব কেড়ে নিয়ে গেছে ইজরায়েলি আর্মি ইন্টেলিজেন্স। বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ দেয় আমার তিন অনুচর। গত তিনটে মাস হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করেও বাকি ধনরত্ন পায়নি ওরা, শেষে হাল ছেড়েছে এতদিনে। এখন ওই পঞ্চম ট্রাকের মালগুলোর কথা ভেবে কোনও লাভ নেই, যা গেছে তা গেছেই। যা আছে, সেগুলোর একটা সুব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে, দাদু।'

- সব ভালমত বুঝিয়ে দেওয়ার পর রানাকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করালেন দাদু, তারপর স্বস্তির একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে হেলান দিলেন চেয়ারে।
- প্রসঙ্গ পাল্টে রানা জানতে চাইল, 'আচ্ছা, হাজার কথা বলছে হাজার লোকে – ইয়াসির আরাফাতের রহস্যময় অসুখটা আসলে কী ছিল?'
- 'সেটা কেউ বলতে পারে না, রানা। তবে আমার মনে হয়েছে মিস্টার আরাফাত ভাল করেই জানতেন, এর মধ্যে রহস্যময় কিছুই ছিল না। তিনি অবশ্য কারও নামে নালিশ করার লোক ছিলেন না। আমার ব্যক্তিগত ধারণার কথা বলতে পারি। মার্কিনিদের মোটা টাকা খেয়ে, তাদের প্রিয়পাত্র হবার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করে পিএলও-র উপরসারির নেতা, তাঁরই ঘনিষ্ঠ দু'জন লোক, এই জঘন্য অপরাধটা করেছে। যাদেরকে তিনি একশোভাগ বিশ্বাস করতেন, তারাই তাঁকে মার্কিন সেনাবাহিনীর গোপন ল্যাবে তৈরি বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে।'
- 'ওহ্, গড, নো!'
- 'ওহ্, গড, ইয়েস!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন দাদু। 'ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম থেকেই এমন বিশ্বাসঘাতকতার নজির পাবে তুমি ভূরি ভূরি। একই ট্র্যাডিশন চলে আসছে আজ পর্যন্ত।'
- 'কিন্তু, সেক্ষেত্রে মারা যাবার আগে কাউকে কিছু জানাননি কেন তিনি? অন্তত জার্নালিস্টদের?' রানা বিশ্বাস করতে পারছে না দাদুর কথাটা।
- 'মারা যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ব্যাপারটা তিনি জানতে পারেন, কিন্তু অপরাধীরা সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে থাকায় মুখ

খোলেননি। আসলে পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাননি তিনি। তা ছাড়া তিনি জানতেন, বলে কোন লাভও নেই – কথাটা অসুস্থ মানুষের প্রলাপ হিসেবে ধরে নেয়া হবে, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

- 'কারা তারা, দাদু?' জানতে চাইল মর্মাহত রানা।
- 'ডায়েরিতে তাদের নাম রয়েছে,' বললেন বৃদ্ধ দাউদ। 'কিন্তু তাদের দোষারোপ করা হয়নি, শায়েস্তা করার কথাও নেই। কাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে শুধু তারই একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন শুধু।'
- 'আর কী আছে ওটায়?' জানতে চাইল রানা।
- 'কঠোর সত্য ও বর্তমান বাস্তবতা মেনে নিয়ে প্যালেস্টাইনে কীভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনা যায় তার একটা নিখুঁত প্ল্যান রেখে গেছেন তিনি।'
- 'কঠোর সত্য ও বাস্তবতা – সেটা কী, দাদু?'
- 'প্রথমে এই সত্যটাকে সম্মান দেখাতে হবে যে এই দেশ একা কোনও একটি ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠির নয়,' বললেন খাদেমুল দাউদ। 'ইসলাম আসার অনেক আগে থেকে এখানে অনেক জাতের মানুষ বসবাস করেছে, যীশুর অনুসারী খ্রিস্টানরা। খ্রিস্টধর্ম আসার আগে এখানে বাস করত মুসা নবীর অনুসারী, ইহুদিরা। ইহুদিদের আগে ছিল অন্য কোনও সম্প্রদায়ের লোকজন, যেমন রোমানরা। কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করব, এটা তাদের সবার দেশ নয়?'
- ট্রে-তে কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে কামরায় ফিরে এল শায়লা আলাউয়ি। ওদের দুজনের কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে বসল।
- 'মিস্টার আরাফাতের বক্তব্যে যুক্তি আছে,' বলল রানা, শায়লার বাড়ানো হাত থেকে কফির কাপটা নিল। 'ডায়েরিতে আর কী আছে, দাদু?'

- ‘আর কী আছে আমি জানি না।’ কফির কাপটা নেয়ার সময় শায়লাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমারটায় চিনি দাওনি তো?’
- মৃদু হেসে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল শায়লা। তারপর হঠাৎ সে বলল, ‘দাদু, মিস্টার রানার সঙ্গে ওই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছ?’
- ‘কোন্ ব্যাপারটা?’ প্রায় রেগে উঠে জানতে চাইলেন খাদেমুল দাউদ। তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, ‘না, ওসব কথা রানাকে কিছু বলিনি। ওর আসল কাজটা অনেক বেশি জরুরি। নিজেদের সামান্য একটা ব্যাপারে ওকে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না।’
- যেন একমত হতে না পেরেই মাথাটা নিচু করে নিল শায়লা, তবে আর কিছু বলল না সে।
- অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে ভেবে বিষয়টা সম্পর্কে রানা কোনও আগ্রহ দেখাল না। ‘আমার যাওয়ার কী ব্যবস্থা, দাদু?’ জানতে চাইল ও।
- ‘তোমার জন্যে নতুন একসেট কাগজ-পত্র তৈরি করে রেখেছি,’ দাদু জানালেন। ‘শায়লার চাচা মুক্তাদির আলাউয়ি কাছেই একটা স্লটারহাউসের ম্যানেজার, সেখান থেকে মিশরে হালাল মাংস রফতানী করা হয়। প্রতিবার ওই কার্গোর সঙ্গে একজন করে লোক যায়, এবার তুমি যাবে। শায়লাই তোমাকে মিশরীয় জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে।’
- ‘কবে?’ জানতে চাইল রানা। ‘কখন?’
- ‘পরবর্তী শিপমেন্ট আগামী সোমবার।’
- হতাশ বোধ করল রানা। ভাবল – সেরেছে, তার মানে আরও ছ’টা দিন এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে!

- ওর প্রশ্নের উত্তরে দাদু বললেন, 'না, সময়টা এগিয়ে আনার কোনও উপায় নেই, রানা। অসুবিধে কী, এখানে এই কটা দিন ভাল খাওয়াদাওয়া করো আর বিশ্রাম নাও। আমাদের শায়লা খুব ভাল রান্না করে।'
- অসহায় একটু হাসি দেখা দিল রানার ঠোঁটে। 'কী আর করা, ঠিক আছে। তবে আমার ফেরার আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমি।'
- শায়লার দিকে তাকালেন খাদেমুল দাউদ।
- 'আমার চাচার স্লটারহাউসটা সেদোত ইয়াম-এ। কর্মচারীদের ছুটি দেয়া হলেও, সোমবার সকালে এসে গরু-ছাগল জবাই করে সব কাজ সেরে ফেলবে তারা। এখান থেকে আমরা রওনা হব রাত আটটায়,' বলল শায়লা। 'মাংস নিয়ে মুক্তাদির চাচার কাভারড্ ভ্যান ছাড়বে রাত দশটার দিকে। ওটার ক্যাবে চড়ে যাওয়াটাই সবদিক থেকে নিরাপদ। তবে ভ্যানটার মেঝে তুলে ফলস বটম লাগানোরও ব্যবস্থা আছে।'
- 'জাহাজ ছাড়বে কখন?' জানতে চাইল রানা।
- 'এই রাত দুটোর দিকে বন্দর ছেড়ে যাবে।'
- 'এখন তুমি বিশ্রাম নেবে, রানা,' বললেন দাদু। 'আটটায় সাপারে বসে আরও কথা হবে, তখন বাংলাদেশের গল্প শুনব।' আলখেল্লার আস্তিন সরিয়ে হাতঘড়ি দেখলেন। 'এখন পাঁচটা বাজে, তিনটে ঘণ্টা অনায়াসে ঘুমাতে পারবে। শায়লা, ওর রুমটা দেখিয়ে দিয়ে এসো তো, ভাই।'
- 'আসুন,' বলে চেয়ার ছাড়ল শায়লা।
- বুড়ো দাদুর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর শায়লার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

রানার ঘুম ভাঙল অন্ধকার কামরায়। বাইরে কর্কশ, চাপা কণ্ঠস্বর; কে যেন কার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। এক কি দু'সেকেন্ড মনে করতে পারল না কোথায় রয়েছে ও। তারপর সব মনে পড়ে গেল।

ওকে লিভিংরুম থেকে করিডরে বের করে এনেছিল মেয়েটি, শায়লা আলাউয়ি। এই কামরাটা বাইরে থেকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেছে সে, ভিতরে ঢোকেনি। সঙ্গে ঘড়ি নেই, তবে আন্দাজ করল রাত এখন ন'টার কম নয়।

কর্কশ গলার আওয়াজটাও এখন চিনতে পারছে রানা। খাদেমুল দাউদ কাকে যেন বলছেন, 'কাজে হাত দেওয়ার আগেই যদি এভাবে টাকার জন্যে চাপ দিতে থাকো, তা হলে তো মুশকিল!'

এরপর শায়লার গলা শুনতে পেল রানা। 'এ-ও জানিয়ে দিন, দাদু, অতিরিক্ত টাকা চেয়ে লাভ হবে না।'

রানা ধারণা করল, দাদু সম্ভবত কারও সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলছেন।

'যা দেয়ার কথা হয়েছে তাই পাবে, তবে কাজ শেষ হলে, তার আগে আর একটি পয়সাও নয় ...কী? ত্রিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার? ...কে বলল? ...তা জেনে তোমার দরকার কী? ...নাহ্, যা কথা হয়েছে তাই। যদি ভেবে থাকো চাপ দিয়ে তোমরা আমার কাছ থেকে আরও বেশি টাকা আদায় করতে পারবে, ভুল ভাবছ।'

'কী বলছে ওরা?' জানতে চাইল শায়লা।

'লুঠ করা টাকার ভাগ চাইছে,' বললেন বৃদ্ধ দাউদ।

'হীরার ব্যাগগুলো সম্পর্কে কিছু জানে?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

• ‘কী জানি, ঠিক বোঝা গেল না। আভাসে দামি পাথরের কথা কী যেন বলতে চাইল। তোমার মুক্তাদির চাচার কাছ থেকে জেনেছি আমরা, সে কী আর ওদেরকে বলেনি? মাতাল লোককে বিশ্বাস কী?’

• মিলিয়ন-কে-মিলিয়ন মার্কিন ডলার! হীরার চালান! লুঠ! ...কামরা থেকে বেরিয়ে লিভিংরুমে ঢোকার সময় চিন্তা করছে রানা। এ-সবের মানেটা কী?

• মোবাইল ফোনটা আলখেল্লার পকেটে ভরে রাখার সময় কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন দাদু, দোরগোড়ায় রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চুপ করে গেলেন। তাঁর এই প্রতিক্রিয়া দেখে দরজার দিকে তাকাল শায়লা। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে আড়ষ্ট একটু হাসল সে, বলল, ‘আসুন, বসুন, মিস্টার রানা। নিশ্চয়ই সব শুনে ফেলেছেন?’

• ‘মিস্টারটা বাদ দিলে হয় না?’ এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল রানা, দাদু ও শায়লার দিকে মুখ করে। ‘হ্যাঁ, কিছু কথা কানে এল। যদি আপত্তি না থাকে, সবটুকু শুনতে চাই আমি।’

• ‘এটা এমন কোনও বিরাট ব্যাপার নয় যে আমরা সামলাতে পারব না,’ বললেন বৃদ্ধ দাউদ।

• ‘কিন্তু আমি যেন কিছুটা বিপদের আভাস পেলাম,’ বলল রানা। ‘কারা যেন চাপ দিচ্ছে লুঠ করা টাকার ভাগ পাবার জন্যে।’

• ‘ব্যাপারটা রানাকে জানানো উচিত, দাদু,’ নরম সুরে বলল শায়লা। ‘অন্তত ওর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে অসুবিধে কী?’

• দুর্বল কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকিয়ে দাদু বললেন, ‘বেশ। শোনো তা হলে। তবে একটু ভূমিকা দরকার।’

- সংক্ষেপে এদেশি মুসলিমদের দুর্দশার কথা বললেন বৃদ্ধ দাউদ। এই অবস্থায় পাঁচ ট্রাকের একটা খোয়া যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। তাঁর ধারণা আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কেড়ে নেওয়া ধনরত্ন উদ্ধার করতে না পারলে মরেও শান্তি পাবেন না তিনি। ওগুলো উদ্ধার করবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে – তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে চান।
- কথার ফাঁকে আলখেল্লার পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডার বের করলেন তিনি। সেটা থেকে বেরুল একটা ম্যাপ। টেবিলের উপর সেটার ভাঁজ খোলা হলো।
- ম্যাপে একটা পেন্সিল ছোঁয়ালেন দাদু। 'কয়েকদিনের মধ্যেই হাইফা থেকে একটা মেইল ট্রেন এই লাইন ধরে রওনা হবে। ট্রেনটার নাম ব্যাঙ্কার'স ট্রেন, হরেক রকম মূল্যবান কার্গো নিয়ে যাতায়াত করে এই বিশেষ ট্রেন। আমরা জানতে পেরেছি, এতে করেই জেরুজালেমের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠানো হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে লুঠ করা হীরা ও ক্যাশ ডলারের চালান। ওগুলো কেড়ে নেব আমরা।'
- 'কী রকম ক্যাশ? নতুন নোট, নাকি পুরানো?'
- 'পুরানো। বিশ, পঞ্চাশ, একশো ও পাঁচশো ডলারের নোট। ক্যানভাসের বড় বড় ব্যাগে করে আসছে ওগুলো। প্রতি ব্যাগে পনেরো মিলিয়ন করে থাকে বলে শুনেছি।'
- 'ঠিক আছে, বলে যান।'
- 'হাইফা থেকে রওনা হয়ে ব্যাঙ্কার'স ট্রেন দর, বিনাইমিনা, পারদেস হাননা, হাডেরা, মা'উর, আহিটাভ ও বির এস সিক্কা-কে ছুঁয়ে পৌঁছায় শুয়েকাহ্-এ। এখান থেকে মেইল ট্রেনের কার্গো ভাগাভাগি হয়ে যায়। স্টেশনে আরেকটা ট্রেন অপেক্ষায় থাকে,

সেটার নাম এক্সপ্রেস মেইল। জেরুজালেমের মালগুলো তাতে তোলা হয়। তারপর ব্যাঙ্কার'স ট্রেন নাবলুসের দিকে চলে যায় – এক্সপ্রেস মেইল যায় জেরুজালেমের দিকে।'

- 'আপনাদের প্ল্যানটা বলুন,' বলল রানা।
- 'রোববারে ব্যাঙ্কার'স ট্রেন শুয়েকাহ্-এ পৌঁছাবার আগেই যা করার করতে চাইছি আমরা।'
- 'আমরা বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছেন?' জানতে চাইল রানা।
- 'শেফাইম থেকে ভাড়া করা দুজন লোককে কাজটার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে...'
- 'কে তাদেরকে ভাড়া করেছে?' জানতে চাইল রানা। 'যে ভাড়া করেছে সে জানে এদেরকে দিয়ে কী করাবেন আপনি?'
- 'আমার পরিচিত ও বিশ্বস্ত এক লোকের মাধ্যমে পেয়েছি ওদেরকে, কাজটা হয়ে গেলে টাকা-পয়সাও তার মাধ্যমে পাবার কথা তাদের...'
- 'কাজ মানে ট্রেন ডাকাতি?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'নিশ্চয়ই বিশ-পঁচিশজন আর্মড গার্ড থাকবে,' বলল রানা। 'মাত্র দুজন লোক তাদের সঙ্গে পারবে কীভাবে?'
- 'ওরা নিশ্চয়ই আরও লোক ভাড়া করবে,' বললেন দাদু। 'আমি ঠিক জানি না...'
- 'আপনি ভাড়া করবেন ওদেরকে, ওরা ভাড়া করবে আরও কজনকে?' মাথা নাড়ল রানা। 'এ-সব কাজ এভাবে হয় না, দাদু। 'আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আপনারা সাংঘাতিক বিপদের মুখে পড়তে চলেছেন।'

- ‘না, ওদের প্ল্যানটা যদি শোনো তুমি…’ প্রতিবাদের সুরে শুরু করলেন খাদেমুল দাউদ।
- ‘নগদ ডলার কত থাকবে,’ জানতে চাইল রানা, ‘সব মিলিয়ে?’
- ‘বিশ মিলিয়নের কম নয়, আবার ত্রিশ মিলিয়নের বেশি নয়।’
- ‘আর হীরা?’
- ‘আমরা খবর পেয়েছি, আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সমস্ত হীরা এই একই সঙ্গে চলেছে কয়েকটা ব্যাগে করে।’
- ‘খবরটা কে দিল?’
- ‘অত্যন্ত গোপন খবর,’ ফিসফিস করে বললেন দাদু।
- চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে শায়লার। খোয়া যাওয়া সবকিছু ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনায় উত্তেজিত। বলে উঠল, ‘কীভাবে যেন জানতে পেরেছেন আমার মুক্তাদির চাচা।’
- ‘হায় হায়!’ খুশি তো নয়ই, রানা যেন আঁতকে উঠল।
- ‘কী হলো, রানা?’ জানতে চাইলেন দাদু।
- দ্রুতই নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা, তাড়াতাড়ি বলল, ‘না, কিছু হয়নি। প্লিজ, আপনাদের কথা আগে শেষ করুন।’
- ‘দুটো ব্রিফকেসে কত টাকার হীরা থাকতে পারে, রানা?’ জানতে চাইলেন দাদু। ‘এ-সব ব্যাপারে আমার আসলে কোনও ধারণা নেই।’
- ‘সংখ্যা, আকার ও গুণগত মান না জেনে হীরার দাম আন্দাজ করা সম্ভব নয়,’ বলল রানা। ‘কোয়ালিটি মোটামুটি হলে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ফিরে পাবেন, আবার খুব ভাল হলে আড়াই থেকে তিন বিলিয়ন ডলারও পেতে পারেন।’

- ‘কমটাই ধরি, পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার,’ বললেন বৃদ্ধ দাউদ, ঠিক একটা শিশুর মতই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন তিনি, তাঁর ম্লান চোখ-মুখ থেকে হঠাৎ করে একটা দীপ্তি ছড়াতে শুরু করেছে। ‘আর নগদ ত্রিশ। তা হলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল আশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমরা তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম ওগুলোর। আবার ফিরে পাচ্ছি ওগুলো! কল্পনা করতে পার? আবার আমরা শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে পারব...’
- ‘না, পারবেন না,’ বাধা দিয়ে বলল রানা।
- ‘কী? তুমি কিছু বললে, রানা?’ হকচকিয়ে গেছেন দাদু।
- ‘বলছিলাম যে অন্তত এই ডলার বা হীরার সাহায্য আপনাদের কপালে নেই,’ বলল রানা। ‘কারণ এগুলোর কিছুই আপনার হাতে পৌঁছাবে না।’
- ‘কী বলছ তুমি?’ দাদু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ‘আমার হাতে পৌঁছাবে না মানে? ওরা সব মেরে দেবে?’
- ‘দেবে না? আপনি একা, একজন বৃদ্ধ মানুষ, তার ওপর আত্মগোপন করে আছেন। কাজটা করবে শক্ত-সমর্থ কয়েকজন বেপরোয়া জোয়ান। এ-ধরনের কাজে নিশ্চয়ই তারা অভ্যস্ত, তা না হলে আপনি তাদেরকে ভাড়া করতেন না। একদল ডাকাতের কাছ থেকে আর কী আশা করতে পারেন আপনি?’
- ‘কিন্তু...’
- ‘আরও শুনুন,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘হীরা ও ডলার তো পাবেনই না, ওদের হাতে প্রাণটাও খোয়াবেন। যদি ভেবে থাকেন এই বয়সে খুন হতে আপত্তি নেই, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে শায়লার বোধহয় আপত্তি আছে। কী, শায়লা?’

'আমি বাঁচতে চাই, কারণ আমি না বাঁচলে আরেকজন মারা যাবে,' শান্ত, অথচ আশ্চর্য দৃঢ়কণ্ঠে বলল শায়লা।

'ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে? কিন্তু কেন?' বৃদ্ধ খাদেমুল দাউদ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'আমরা তো ওদের কোনও ক্ষতি করব না, বরং প্রত্যেককে এত টাকা দেব যে পাঁচ-সাত বছর বসে খেতে পারবে, তা হলে কী কারণে...'

'এরকম পরিস্থিতিতে মেরে ফেলাই নিয়ম, দাদু। মারে দুটো কারণে,' বলল রানা। 'নিজেদের অপকর্ম গোপন রাখার জন্যে। 'আর, যাতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কেউ না থাকে।'

'হায় খোদা! এখন কী হবে!' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন দাদু।

'কী আবার হবে,' বলল রানা। 'ওদেরকে জানিয়ে দিন অপারেশনটা বাতিল করে দিয়েছেন আপনি।'

মুখ থেকে হাত নামিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন খাদেমুল দাউদ। 'সমস্ত তথ্য এরইমধ্যে জানা হয়ে গেছে ওদের। কাজটা আমি করব না বললে খুশি হবে ওরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নিজেরাই করার সিদ্ধান্ত নেবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর জনান্তিকে বিড় বিড় করল, 'দেখা যাচ্ছে, ভাল গ্যাঁড়াকলেই জড়িয়েছেন আপনারা।'

নয়

মঙ্গলবার।

খুব সকালে ফার্মহাউস থেকে একা বেরিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে সৈকতে চলে এসেছে রানা। বালির উপর অসংখ্য লাল কাঁকড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত রাতে বৃষ্টি হওয়ায় ভিজে রয়েছে সৈকতের বালি। আকাশটা এখনও মেঘে ঢাকা।

সাগর ফাঁকা পড়ে আছে। ভাল বাতাস আছে, ঢেউগুলো বেশ বড়। একটু দূরে জোড়া হেডল্যান্ড দেখতে পেয়ে লঞ্চটার কথা মনে পড়ে গেল রানার। দুটোর মাঝখান দিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটবার পর ডানপাশে ছোট একটা জেটি দেখা দেখতে পেল। শেষ মাথায় ঢেউ-এর দোলায় দুলছে লঞ্চটা। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এগিয়ে এসে জেটিতে চড়ল রানা, তারপরও কাউকে দেখতে না পেয়ে লাফ দিয়ে লঞ্চের ডেকে নেমে হুইলহাউসের দিকে এগোল।

লঞ্চটা দেখতে পুরনো হলেও, ভিতরটা বেশ ঝকঝকে তকতকে। পিছনে, ডেকে আওয়াজ হতে ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল হুইলহাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে শায়লা

আলাউয়ি।

ঘুরে তার দিকে এগোল রানা। হাতের ট্রেঞ্চকোটটা ওর উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরে শায়লা বলল, 'ভাবলাম এটা আপনার লাগতে পারে।'

'ধন্যবাদ।' দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি এরইমধ্যে পড়তে শুরু করেছে, তাড়াতাড়ি ওটা পরে নিল রানা। 'লঞ্চটা পুরনো।'

ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে মাথা ঝাঁকাল শায়লা। 'সেটা লোকদেখানো। শেফাইম থেকে একা চালিয়ে নিয়ে এসেছেন এটা দাদু।'

'অপারেশনটা সেরে দ্রুত পালাবার দরকার হলে দাদু কোথায় যাবেন?'

'শেফাইমে। ওখানকার সেফ হাউসটা শতকরা নব্বুই ভাগ নিরাপদ। মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকা যায়। লঞ্চটাকে লুকিয়ে রাখার আরও ভাল জায়গা আছে সেখানে।'

'আপনার ভূমিকাটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হলো না,' বলল রানা। 'অক্সফোর্ড থেকে কী নিয়ে যেন পাস করেছেন?'

'পলিটিকাল সায়েন্স।'

'তা নিশ্চয়ই একজন বুড়ো মানুষকে কাঁচা একটা কাজে প্ররোচনা দেয়ার জন্যে নয়?'

হেসে ফেলল শায়লা। 'ইংল্যান্ড থেকে মাস দেড়েক হলো ফিরেছি আমি। আর এই ট্রেন ডাকাতির চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে তার আগে থেকেই। আমি ফিরেছি মুক্তাদির আলাউয়ি, আমার চাচার কাছে – সেদোত ইয়াম-এ। শুধু যে একটা স্লটারহাউস চালান তিনি, তা নয়, নিজের শিপ ফার্মও দেখাশোনা করেন। তবে তাঁর চাকরি ও ব্যবসা, দুটোর অবস্থাই করুণ। আমার বাবা ও চাচা

ইয়াসির আরাফাতের পাশে থেকে ইজরায়েলি সৈন্যদের বিরুদ্ধে একসময় যুদ্ধ করেছেন। তো আমার এই চাচাই মাস দুয়েক আগে ব্যাঙ্কার'স ট্রেনে করে আমাদের ডলার ও হীরা পাচারের কথা কীভাবে যেন জানতে পেরে দাদুকে বলেছেন।'

'কেন তিনি বলতে গেলেন?'

'কারণ আমার চাচা বাস্তব দুনিয়ায় বাস করেন না। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, আল্লাহ জাদুর মত কিছু একটা করবেন, অমনি কয়েকদিনের মধ্যে ইজরায়েল ধ্বংস হয়ে যাবে, গোটা দেশের দখল পেয়ে যাবে ফিলিস্তিনি মুসলমানরা।'

হাসি চাপল রানা।

'ট্রেনে করে ডলার আর হীরা আসবে শুনে চাচা ধরে নিয়েছেন তিনি যেহেতু পাপী বান্দা, আল্লাহর জাদু বাস্তবে রূপ নিতে পারে একমাত্র দাদুর মাধ্যমে।'

'বুঝেছি।'

'সবটুকু নয়,' বলল শায়লা। 'কিছু খ্রিস্টান বন্ধু আছে, তাদের পাল্লায় পড়ে মুক্তাদির চাচা সারাক্ষণ মদ খাচ্ছেন আর বকবক করছেন। কেউ জানে না কখন কাকে কী বলে ফেলবেন তিনি।'

রানাকে সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'সত্যিই, তা হলে চিন্তার বিষয়।'

'কিন্তু কিছু করার নেই।' অসহায় দেখাল শায়লাকে।

একটু পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'নিজের ব্যাপারটা আপনি কি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছেন?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল শায়লা। 'দেশে ফিরেছিলাম দিন পনেরোর জন্যে,' বলল সে। 'কিন্তু অদৃশ্য একটা জালে জড়িয়ে গেছি, সেটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারছি না।'

'কী সেই অদৃশ্য জাল? নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে?'

'আমার চাচী তাঁর একমাত্র ছেলেকে রেখে মারা গেছেন। আমার এই ভাইটির নাম ইসহাক, ইসহাক আলাউয়ি। ছোটবেলায় কী একটা অসুখের ঠিকমত চিকিৎসা না হওয়াতে কিছুটা প্রতিবন্ধী সে। এতদিন কেউ তাকে দেখার ছিল না। আগেই বলেছি, আমার চাচা সারাক্ষণ মাতাল হয়ে থাকেন। এখন আমিই ইসহাকের দেখাশোনা করি।'

'বয়স কত?'

'সতেরো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'মায়া জিনিসটা অনেক সময় মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। দুঃখিত, আপনার ব্যক্তিগত ফিলিংস নিয়ে আমার মন্তব্য করাটা ঠিক হলো না।'

'আমি কিছু মনে করিনি,' মৃদুকণ্ঠে বলল শায়লা। 'বিপদ যে ডেকে আনা হচ্ছে, আমার চেয়ে কে আর তা বেশি জানে। কিন্তু এ-ও সত্যি যে, ওকে এখানে ফেলে রেখে কোথাও আমার যাওয়া হবে না।' একটু থেমে গলার আওয়াজ নিচু করে আবার বলল, 'আমাকে আমার ঋণ শোধ করতে হবে।'

'মানে?'

'আমার জন্মের পর পরই মারা গিয়েছিলেন আমার মা,' বলল শায়লা। 'সেই থেকে আমাকে মানুষ করেছেন আমার ওই চাচী। অনেক যত্নে, অনেক আদরে। আমার লেখাপড়াও তাঁরই দান।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা জানতে চাইল, 'সেদোত ইয়াম-এ বোধহয় অপারেশনটার হেডকোয়ার্টার বানানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, চাচার ফার্মহাউসে।'

'ওখানকার সেট-আপ সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে পারেন?' প্রশ্ন করল রানা।

‘জটিল কিছু নয়। দাদু দুজন বেপরোয়া টাইপের লোককে ভাড়া করেছেন। তাদেরকে বেশ কিছুদিন আগেই ভাড়া করা হয়েছে, হপ্তাখানেক হলো চাচার ফার্মে এসে উঠেছে তারা।’

‘কেমন লোক তারা?’

‘রগচটা, স্বার্থপর – গুণ্ডা-পাণ্ডারা যেমন হয় আরকী। তাদের মধ্যে কুদ্দুস কোতোওয়াল খুবই বিপজ্জনক বলে আমার ধারণা। রীতিমত ভয় লাগে তাকে, মাথাটা যেন সারাক্ষণ খেলাচ্ছে। তার সঙ্গী গোফরান জামালুকে স্রেফ ভোঁতা একটা হাতিয়ার বলতে পারেন।’

‘এদেরকে পেলেন কোথায় দাদু? কোত্থেকে ভাড়া করলেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘আমার ধারণা উকিল টমসনের সাহায্যে এদেরকে ভাড়া করা হয়েছে,’ বলল শায়লা।

‘উকিলের সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছে?’

মাথা নাড়ল শায়লা। ‘দাদুর হয়েছে, তবে মাত্র একবার, তাও আমি আসার আগে।’

‘যোগাযোগ রাখা হয় কীভাবে?’

‘তালমি-র একটা ঠিকানায় চিঠি আসে,’ বলল শায়লা। ‘গলির ভেতরে ওটা একটা বুকস্টল। আমিই গিয়ে নিয়ে আসি ওগুলো।’

‘টমসন তা হলে এই জায়গাটার কথা জানে না?’

‘না।’ তিক্ত হাসি দেখা গেল শায়লার ঠোঁটে। ‘এমনকী আমার মুক্তাদির চাচাও এখানে কখনও আসেননি। কুদ্দুস কোতোওয়াল কয়েকবারই আমার পিছু নিতে চেষ্টা করেছে, একবারও সুবিধে করতে পারেনি।’

‘মোস্তফা বলে এক লোক আছে, আল মোস্তফা,’ বলল রানা।

'আমি জেল থেকে বেরিয়ে যার সঙ্গে দেখা করি। তার সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'আমি যতদূর জানি, বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছিল তাকে। কাজটা শেষ হবার পর তার সঙ্গে সম্পর্কও শেষ।'

'টমসনকে কত টাকা দেয়া হয়েছে?'

'খরচ বাদে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এধরনের লোক এত কম টাকায় সন্তুষ্ট হয় না। তার আরও টাকা দরকার।'

ভুরু কোঁচকাল শায়লা। 'মানে?'

'দাদুর বিরুদ্ধে টমসন আর মোস্তফা কিছু একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে,' বলল রানা, লক্ষ করল বৃষ্টিটা আরও বাড়ছে। 'চলুন, ফেরা যাক।'

রানার আস্তিন খামচে ধরল শায়লা। 'কী করব আমরা? কিছু একটা পরামর্শ দেবেন না?'

'দেয়ার মত পরামর্শ মাথায় আসছে না,' বলল রানা। 'এই বয়সে এরকম একটা বিপজ্জনক কাজে জড়ানো উচিত হয়নি দাদুর। তবে জেনেশুনে তাঁকে তো আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারি না।'

'কী করবেন বলে ভাবছেন?' যেন ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল শায়লা।

রানার বলতে ইচ্ছে করল, প্রতিবন্ধী চাচাতো ভাইয়ের মায়ায় পড়ে আপনি যেভাবে নিজের বিপদকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন, এমনটি সাধারণত দেখা যায় না। ব্যাপারটা জানার পর মনে হচ্ছে এটা দেখা বোধহয় আমার কর্তব্য: আপনাদের কারও কোনও

বিপদ যেন না হয়। তবে মুখে বলল, 'ভাবছি ডাকাতিটা হয়তো আমাকেই করতে হবে।'

টেবিলে বসে বড় একটা স্কেল ম্যাপের ভাঁজ খুলেছেন খাদেমুল দাউদ। দরজা খোলার শব্দ শুনেও মুখ তুলে তাকালেন না। তবে বললেন, 'এসো, রানা।'

এগিয়ে এসে তাঁর সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। ম্যাপটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'একটা প্রশ্নের জবাব পাচ্ছি না, দাদু। আপনি কেন? পিএলও-র তরুণ যোদ্ধারা কোথায়? ঘরের কোণে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে?'

'ইজরায়েল সরকার ঘোষণা করেছে আমাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার নগদ পুরস্কার দেয়া হবে,' বললেন দাদু। 'চারদিকে অভাব আর অভাব, ইহুদিরা কাজ দিলে ফিলিস্তিনিদের খাবার জোটে, এরকম অবস্থায় কার মনে কী আছে কী করে বলব, তাই আমি আর তাদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছি না।'

'কিন্তু যাদেরকে দিয়ে কাজটা করাতে যাচ্ছেন, তারা তো অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের মানুষ,' বলল রানা। 'তাদেরকে আপনি বিশ্বাস করছেন কীভাবে?'

'ওরা দুজনেই জেল পলাতক খুনি,' বললেন বৃদ্ধ দাউদ। 'নিজেদের বিপদ সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তাদের? তা ছাড়া, কাজটা ভালভাবে সারতে পারলে ওদেরকে আমি ত্রিশ হাজার ডলার দেব বলেছি, সেটাও কম টাকা নয়।'

'আর একটা প্রশ্ন। আমাকে জেল থেকে বের করে আনতে

কত টাকা লাগল?'

ম্যাপ থেকে ঝট করে মুখ তুললেন খাদেমুল দাউদ। 'তা তোমার না জানলেও চলবে।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, দাদু।'

কাঁধ দুটো একটু উঁচু করলেন পিএলও-র বয়োবৃদ্ধ নেতা। 'এই ধরো হাজার বিশেক ডলার।'

'এত টাকা কোথায় পেলেন আপনি?'

'টাকাটা আমার নয়,' বললেন দাদু, 'শায়লার। নাবলুস শহরে ওর বাবার রেখে যাওয়া বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে ও। ওর প্ল্যান ছিল এই টাকায় চাচাতো ভাই ইসহাককে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে প্রতিবন্ধীদের কোনও স্কুলে ভর্তি করে দেবে। ওর টাকাটা আমি ধার নিয়েছি...'

'ট্রেন থেকে আপনাদের টাকা উদ্ধার করে দেনাটা শোধ করে দেবেন, এই আশায়, তাই না?' মাথা নাড়ল রানা। 'কাজটা আপনি মোটেও ভাল করেননি, দাদু।'

'এখন বুঝতে পারছি, সত্যিই কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে,' হতাশ কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'এখন আমাকে তুমি কী করতে বলো?'

'আপনাকে কিছুই করতে হবে না,' বলল রানা। 'সব আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারি আমি। যা যা আমার জানা দরকার, সব বলে যান। সেট-আপ দেখতে আজই একবার মুক্তাদির আলাউয়ি-র বাড়িতে যাব আমি।'

হাত তুলে দোয়া করলেন দাদু। 'খোদা তোমার সকল আশা পূরণ করুন, রানা।'

আধঘণ্টা পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন খাদেমুল দাউদ। বমি করার চেষ্টা করছেন, অথচ গলা থেকে কিছুই বেরুচ্ছে না। তাঁর

বিরতিহীন কাশির আওয়াজ শুনে কিচেন থেকে ছুটে এল শায়লা। হতভম্ব রানার সাহায্য চাইল সে, দুজন ধরাধরি করে শুইয়ে দেয়া হলো তাঁকে। ইতিমধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বৃদ্ধ।

'চিন্তার কিছু নেই,' রানাকে বলল শায়লা, দাদুর চোখে-মুখে পানির ছিটা দিচ্ছে। 'এখনই জ্ঞান ফিরে আসবে। তবে টেস্ট-এর রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেছেন, খুব বেশি হলে আর ছ'মাস বাঁচবেন।'

'মানে?'

'দাদুর লিভারে ক্যানসার। শেষ পর্যায়ে, এখন আর চিকিৎসা করে কোনও লাভ নেই, কষ্ট বাড়বে কেবল।'

মঙ্গলবার বিকেলের ঘুমটা বেশ খানিক আগে ভাঙলেও সিলিঙের দিকে তাকিয়ে নারীদেহের নানান বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কুদ্দুস কোতোওয়াল। ঘরের ভিতরটা গাঁজার ধোঁয়ায় ভরে আছে। সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়ে বিছানা থেকে নামল সে, ট্রাউজারের চেইন খুলে জানালা দিয়ে উঠানে প্রস্রাব করল।

ঘুরে দরজার দিকে এগোচ্ছে, শুনতে পেল বাইরে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ ও চেঁচামেচি হচ্ছে। কবাট খুলে সাদা চুনকাম করা প্যাসেজে বেরিয়েছে মাত্র, মুক্তাদির-এর প্রতিবন্ধী ছেলে ইসহাক ছুটে এসে ধাক্কা খেল তার সঙ্গে।

ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে ছেলেটার চোখ দুটো, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। তার পিছু নিয়ে ছুটে আসছে গোফরান জামালু।

জামালুকে প্রকাণ্ড এক বলদ বললেই হয়। ইসহাককে ধরার জন্য পেশল হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। দুই হাত দু'দিকে মেলে তার পথরোধ করল কোতোওয়াল। 'কী হচ্ছে এ-

সব?’

‘শালার বেটা শালা আমার সব সিগারেট সরিয়ে ফেলেছে। বালিশের তলায় তিন প্যাকেট লুকিয়ে রেখেছিলাম, একটাও নেই।’

‘ওগুলো তুমি কাল রাতে জুয়ায় বসে আমার কাছে হেরেছ,’ বলল কোতোওয়াল। ‘গাঁজা খেয়ে ভুলে গেছ সব।’

‘ছোকরাটাকে বাঁচাবার জন্যে এসব তুমি বানাচ্ছ, কুদ্দুস!’ কোতোয়ালকে এক ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিয়ে খপ করে ইসহাককে ধরে ফেলল জামালু। কিন্তু নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে প্যাসেজের আরেক মাথার দিকে ছুটল ছেলেটা। তার পিছু নিতে যাবে জামালু, কিন্তু পারল না।

কেন পারল না তা জামালুও বলতে পারবে না। কারণ ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেছে, মস্তিষ্কে তার কোনও ছাপ পড়েনি। সেজন্য পরে কিছু মনেও করতে পারবে না সে।

পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে ইসহাকের ঘাড়টা ধরতে যাচ্ছিল জামালু, আধ সেকেন্ডেরও কম সময় পর অনুভব করল – বাতাস কেটে উড়ছে সে, পড়তে যাচ্ছে খোলা উঠানে। পড়ার পর ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে সিধে হতে যাবে, গলায় চেপে বসল বুট পরা একটা পা। আবার যখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হলো, দেখল কঠিন ও গম্ভীর একটা মুখের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সে।

জীবনে কাউকে ভয় পেতে শেখেনি গোফরান জামালু। এই মুহূর্তেও ভয় পাচ্ছে না। তবে নিজের গুণ আরেকজনের মধ্যে দেখে অবাক হয়েছে সে।

‘ওঠো!’ বলল রানা।

ওর পিছনে ইসহাকের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শায়লা।

রানার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে প্রতিবন্ধী ছেলেটা; তার যেন হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কী এক ভয়ে সাহস পাচ্ছে না।

ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় হেসে উঠল কুদ্দুস কোতোওয়াল। 'ভারি ইন্টারেস্টিং একটা সিন,' বলল সে, মেহেদি লাগানো লালচে চুলে আঙুল চালাচ্ছে আর টলমলে জামালুকে সিধে হতে দেখছে। 'আমি কুদ্দুস, আল শাহরিয়ার, কুদ্দুস কোতোওয়াল। আমিও তোমার মত জেল পালানো কয়েদি। আর এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটির নাম গোফরান জামালু। তার বেয়াদবি তোমাকে মাফ করতে হবে। স্রষ্টা তাকে যথেষ্ট মগজ দেননি।'

'কোন্‌দিন না আমি তোমার মুখে গোবর ভরে দিই,' হিস হিস করে বলল জামালু, তারপর ভারী পায়ের থপ থপ আওয়াজ তুলে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

'আমার চাচা কোথায়?' জানতে চাইল শায়লা।

'সেই সকালে সাপ্লাই আনতে ট্রাক নিয়ে কায়সারিয়া-য় গেছে। মদের দোকান খোলা থাকা পর্যন্ত ফিরবে বলে মনে হয় না,' বলল কোতোওয়াল। ঠোঁটে সামান্য বিদ্রূপাত্মক হাসি নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, তাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল রানা। পাথরের তৈরি বাড়ি। লিভিং রুমটা বেশ বড়।

জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে জামালু, হাতের গাঁজা ভরা সিগারেট থেকে কটুগন্ধী ধোঁয়া উঠছে।

তাকে গ্রাহ্য করছে না রানা। ঘুরে তাকাতে দেখল, ওর পিছু নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকছে শায়লা আর কোতোওয়াল। 'ছেলেটা কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'পাহাড়ে খেলতে গেল,' জানাল শায়লা। 'বাড়ির কথা মনে পড়লে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে, তা না হলে সন্ধে হয়ে যাবে। আপনাকে সালাম দিতে বলে গেছে।'

'কটা বেডরুম?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল রানা।

'তিনটে। নীচে একটা, ওপরে দুটো। ওপরের একটা গেস্টরুম, সেটা আমি ব্যবহার করি। আরেকটায় ইসহাককে নিয়ে চাচা ঘুমান।'

'আমরা নীচের ঘরে শুই,' বলল কোতোওয়াল।

'এত খবর নিচ্ছে, ব্যাপারটা কী?' জানলার কাছ থেকে গজগজ করছে জামালু। 'আমাদেরকে খেদাবার মতলব?'

'খেদাতে যদি চাই, মানে যখন চাইব, স্রেফ ঘাড় ধরে বের করে দেব,' তার দিকে ফিরে শান্ত সুরে বলল রানা। কোতোওয়ালকে কাঁধের সামান্য ঘষা দিয়ে কিচেনের দিকে এগোল ও, ওর পিছু নিয়েছে শায়লা।

'হুঁহ্, হাতে বড় একটা দাঁও রয়েছে বলে,' ঘৃণার সঙ্গে বলল জামালু, 'তা না হলে এরকম দশটা আল শাহরিয়ারকে পিটিয়ে তক্তা বানানো আমার জন্যে কোনও ব্যাপারই নয়।'

'কথাটা আমাকে না বলে ওকে কেন বলছ না?'

'সময় হোক, বলব ঠিকই।'

'তার আগে খবর দিয়ো আমাকে, দেখতে চাই কে কাকে তক্তা বানায়।'

কিচেন টেবিলটার কিনারায় বসে পা ঝুলিয়ে দিল রানা।

'বিকেলের নাস্তায় ভুনা কলিজা চলবে? সঙ্গে ডিম পোচ আর যবের আঠার রুটি?' জানতে চাইল শায়লা।

'চলবে। চা, না কফি? কফি হলে ভাল হয়।'

‘দুঃখিত, চা।’

খেতে বসে রানা বলল, ‘ইসহাককে আমার কিন্তু অসুস্থ বলে মনে হলো না।’

‘অন্য সবার চেয়ে একটু ধীর। যে-কোনও কথা বুঝতে একটু সময় নেয়। সমস্যা হলো, চাচা ওর সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করে।’

‘ওর আসলে আদর দরকার,’ বলল রানা। ‘দেখি, যতটা পারা যায় আমি ওকে সঙ্গ দিতে চেষ্টা করব।’

ওদের নাস্তা খাওয়া শেষ হয়েছে, কিচেনে ঢুকল কোতোওয়াল। ‘দাদু কেমন আছেন?’

‘ভাল,’ বলল রানা।

বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল কোতোওয়াল। ‘আমাকে বোকা বানিয়ে লাভ নেই, ব্রাদার। হপ্তা দুয়েক আগে আমরা যখন তাকে তালমি-তে দেখলাম, সারাক্ষণ খকখক করে কাশছিলেন, সিধে হয়ে দাঁড়াবার শক্তিও ছিল না।’

‘কী বলতে চাও?’

‘বলতে চাই, যে-ধরনের অপারেশনের কথা ভাবা হচ্ছে তার ধকল সামলাবার শক্তি বুড়া মিয়ার নেই। কিছুটা শক্ত-সমর্থ একজনকে দরকার আমাদের।’

‘জানি,’ বলল রানা। ‘সেজন্যেই এসেছি আমি।’

‘এলেই হলো?’ দোরগোড়া ভরাট করে দাঁড়িয়ে আছে গোফরান জামালু, রাগে লালচে হয়ে আছে শুকনো ক্ষতে ভরা মুখ। ‘কে ডেকেছে তোমাকে? কেন ভাবছ তোমার মাতবুরি আমরা মেনে নেব? এমনও তো হতে পারে, আমার আর কোতোওয়ালের অন্যরকম প্ল্যান আছে।’

‘আমি যেন শুনলাম তোমরা দুজন ভাড়া খাটতে এসেছ,’ কোতোওয়ালকে বলল রানা। ‘মাথা পিছু পনের হাজার মার্কিন ডলার পাবে।’

‘চুক্তিতে সে কথাই বলা হয়েছে, হ্যাঁ।’

‘তা হলে ভাড়াটে হেলপারকে মুখ বুজে থাকতে বলো।’

‘তবে রে, শালা, হারামজাদা–’

মারমুখো হয়ে এক পা সামনে বাড়ল জামালু, সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কোতোওয়াল, ‘তোমার গালাগাল থামাও, জামালু। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ফায়দা নেই।’ রানার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘জামালু খুব সহজেই খেপে ওঠে। তার কারণও আছে। দুই হপ্তা হয়ে গেল দাদুর সঙ্গে আমরা দেখা করতে পারছি না। মোবাইল ফোনে একবার যাও পেলাম, কথার মাঝখানে লাইন কেটে দিয়ে সেটাও বন্ধ করে রেখেছেন। শুধু বিদেশ থেকে আসা এই শায়লা মেয়েটির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এমনকী তার চাচা পর্যন্ত জানে না কোথায় আছেন দাদু।’

‘তাতে সমস্যা কী? সবচেয়ে আগে দেখতে হবে দাদুর নিরাপত্তা। সময় হলে ঠিকই তাঁকে দেখতে পাবে তোমরা।’ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। ‘তোমাদের অন্য রকম প্ল্যানটা যেন কী?’

‘লিভিংরুমে আমার একটা ম্যাপ আছে,’ বলল কোতোওয়াল। ‘চলো ওখানে গিয়ে বসা যাক।’

লিভিংরুমে ঢুকে দেরাজ থেকে বড়সড় একটা ম্যাপ বের করল সে, ভাঁজ খুলল টেবিলের উপর। ‘এখানে, এই হলো হাইফা বন্দর। জাহাজ থেকে ডলার ভর্তি বস্তা নামিয়ে তোলা হবে ব্যাঙ্কার’স ট্রেনে। ট্রেন ছোটে এই লাইন ধরে – দর, বিনাইমিনা, পারদেস হাননা, হাডেরা, মা’উর, আহিটাভ ও বির এস সিক্কা-কে

ছুঁয়ে পৌঁছায় শুয়েকাহ্।'

'আমি তোমাদের প্ল্যানটা শুনতে চাইছি।'

'ব্যাঙ্কার'স ট্রেন আগামী রোববারে রওনা হবে,' বলল কোতোওয়াল। 'শুয়েকাহ্ আর আহিটাভ-এর মাঝখানের একটা স্টেশনে কাজটা করতে চাই আমরা।'

'কীভাবে কী করবে ব্যাখ্যা করো।'

'ট্রেনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিজস্ব গার্ড থাকবে বারোজন। পুলিশ থাকবে পাঁচজন, সৈন্য থাকবে পাঁচজন। মোট বাইশজন। এখন আবার শোনা যাচ্ছে ওই ট্রেনে দামি কী একটা কার্গোও থাকবে। সেগুলো পাহারা দেবে নয়জন প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড। দাঁড়াল একত্রিশ। আরও আছে ট্রেনের দুজন ড্রাইভার, একজন রেলওয়ে গার্ড। সব মিলিয়ে চৌত্রিশজন। কাজেই আমাদেরও অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশজন দরকার।'

'পাগল নাকি!' বলে হেসে উঠল রানা।

'এর মধ্যে হাসির কী হলো?' জানতে চাইল জামালু, হেলেদুলে লিভিংরুমে ঢুকল সে। চোখ-মুখ দেখে মনে হলো অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে।

'ওখানে তোমরা ডাকাতি করতে যাবে, নাকি যুদ্ধ করতে?' জানতে চাইল রানা। 'এতগুলো লোক নিয়ে মুভ করাটাই তো হবে নেহায়েত বোকামি। চারপাশে ইহুদি বসতি, তারা দেখলেই সন্দেহ করবে, আর সন্দেহ হলেই ফোন করে জানিয়ে দেবে আর্মড পুলিশকে। তা ছাড়া, অপারেশন শুরুর অন্তত একদিন আগে ব্রিফ করতে হবে তাদেরকে। এতগুলো লোককে বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'তুমি বিদেশী, তোমাকে যদি বিশ্বাস করা যায়...' শুরু করল

জামালু।

'এই, চোপ!' ধমকে উঠল কোতোওয়াল। 'শাহরিয়ার ঠিকই বলছে।' ঘাড় সিধে করে রানার দিকে তাকাল সে। 'তা হলে কজন লোক দিয়ে কাজটা সারতে চাই আমরা?'

'খুব বেশি হলে আটজন, তার বেশি নয়,' বলল রানা। 'আমরা এখানে তিনজন আছি, আর দরকার পাঁচজন। এই পাঁচজনকে হতে হবে প্রফেশনাল – যারা নিজেদের কাজ বোঝে।'

'কী কাজে প্রফেশনাল?'

'সেটা বলতে পারব প্ল্যানটা চূড়ান্ত হবার পর,' বলল রানা। 'তোমাদের প্ল্যানটা এখনও আমার পুরোপুরি শোনা হয়নি।'

'আসলে আমাদের প্ল্যানের বৈশিষ্ট্য ছিল লোকসংখ্যা,' বলল কোতোওয়াল। 'তা যদি কমিয়ে আটজন করা হয়, ওটা আর কোনও কাজে আসবে না।'

'তবু শুনি কীভাবে কী করবে ভেবেছিলে।'

'আহিটাভের পর বির এস সিক্কা-য় থামবে ট্রেন। ত্রিশজন দু'ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে হামলা চালাব আমরা, ব্যবহার করব রাইফেল, গ্রেনেড, স্মোক বম্ব ও পিস্তল। দুজন স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো আর্মার্ড কারটাকে দখল করবে। বাকি তিনজন স্টেশন মাস্টার আর রেল কর্মচারীদের খতম করবে।'

'আর্মার্ড কারটা কোত্থেকে আসবে?'

'ওটা আসবে কয়েকটা ব্যাঙ্কের জন্যে ডলার ভর্তি কিছু বস্তা নিতে,' বলল কোতোওয়াল। 'ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক থাকে, একজন ড্রাইভার, আরেকজন গার্ড।'

'ট্রেনটা কখন থামে ওখানে?' জানতে চাইল রানা। 'আর স্টেশনে কখন পৌঁছায় আর্মার্ড কার?'

'ট্রেন কখন আসবে তার কোনও ঠিক নেই। নির্দিষ্ট সময় দুপুর দুটো হলেও, অনেক সময় ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট এদিক ওদিক হয়ে যায়। কী জানি, হয়তো নিরাপত্তার কারণে এরকম করা হয়। আর্মার্ড কারটা একটার সময় চলে আসে।'

'অস্ত্র ও গোলাবারুদ কী যোগাড় হয়েছে?'

'কিছু আছে, বাকিটা যোগাড় করতে হবে।'

'কী কী আছে?'

'রাইফেল আছে সাতটা। পিস্তল পাঁচটা। গ্রেনেড দুই ডজন। স্মোক বম্ব ছয়টা।'

'যথেষ্ট,' বলল রানা। 'আর শুধু লাগতে পারে খানিকটা জেলিগনাইট, দু'একটা ডিটোনেটর, আর নার্ভ গ্যাস ভর্তি গোটা দুই ভায়াল। তবে তোমাদের এই প্ল্যানে চলবে না।'

'তার মানে আমাদের চেয়ে ভাল প্ল্যান আছে তোমার কাছে?' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল জামালু। 'শোনা যাক কী সেটা!'

'এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনও প্ল্যান নেই,' বলল রানা। 'আগে সব দেখতে ও বুঝতে হবে আমাকে। আশা করি কাল জানাতে পারব কীভাবে কী করতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, আমরাও দেখতে চাই কত ভাল প্ল্যান সেটা,' বলল জামালু।

'তা দেখো,' বলল রানা। 'এখন দয়া করে আরও কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করো আমাকে।'

'এক মিনিট,' বলল কোতোওয়াল। 'জেলিগনাইট ও ডিটোনেটর জোগাড় করা সহজ, কিন্তু নার্ভ গ্যাস পাওয়া খুব কঠিন হবে।'

'জোগাড় হলে ভাল,' বলল রানা, 'তা না হলে ওটা ছাড়াই

কাজ চালাতে হবে। এবার বলো, ট্রেনটা সম্পর্কে কী জানো তোমরা। কত বড় ওটা? ইঞ্জিন কটা? ডলারের বস্তা কোথায় রাখা হয়?'

'আটটা বগি,' বলল কোতোওয়াল।

'একটা ইঞ্জিন,' জানাল জামালু।

'ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগা বগিতে থাকবে ডলারের বস্তা,' বলল কোতোওয়াল। 'সব মিলিয়ে বাইশজন গার্ড থাকবে ওটার ঠিক পিছনের বগিতে। রেলওয়ের গার্ড থাকবে লেজের দিকে, একেবারে শেষ বগিটায়।' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় আবার মুখ খুলল সে, 'আরও আছে! দামী যে কার্গোর কথা শুনছি, তা নিশ্চয়ই প্রথম বগিতে থাকবে, কারণ গত বছর এই ট্রেনে করে যখন একটন সোনা পাঠানো হয়েছিল তখনও সোনার সঙ্গে একই বগিতে ছিল অতিরিক্ত গার্ডরা। বাকি সবাই, অর্থাৎ বাইশজন, থাকবে ঠিক পেছনের বগিটায়।'

'পিছনের বাকি ছ'টা বগিতে কী থাকে?' জানতে চাইল রানা।

'একটা মেইল ট্রেনে যা থাকার কথা তাই...'

এই সময় ঝক্কড়মার্কা একটা ক্যাটল ট্রাক গোঁ-গোঁ করে গেট দিয়ে উঠানে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দেয়াল থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়াল সেটা। ক্যাবের দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে প্রায় খসে পড়ল এক লোক।

টলতে টলতে জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কোতোওয়াল বলল, 'মানুষ একখান! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কায়সারিয়ায় এমন কোনও মদের দোকান নেই যেখানে তার পায়ের ধুলো পড়েনি। আল্লাই জানেন কাকে কী জানিয়ে দিয়ে এসেছে।'

‘তোমার সাহস তো কম নয়! আমি না একবার বলেছি,’ ঝট করে কোতোওয়ালের দিকে ফিরে কঠিন সুরে বলল শায়লা, ‘আমার সামনে আমার চাচা সম্পর্কে কোনও খারাপ মন্তব্য করবে না?’

‘ইয়ে... মানে... জানি, শুনতে তোমার খারাপ লাগে, কিন্তু যা সত্যি...’ শায়লার চোখে আগুন জ্বলে উঠছে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি চুপ করে গেল সে, তারপর মাথা নিচু করে বলল, ‘ঠিক আছে, আর বলব না।’

প্যাসেজের দরজা খোলার শব্দ হলো, সেদিক থেকে ভেসে এল ফিলিস্তিনিদের দেশাত্মবোধক গান, কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। লিভিংরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল আধবুড়ো লোকটা, উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল। মাথার টুপিটা নোংরা। অযত্নলালিত দাড়ি প্রায় জট পাকিয়ে আছে।

‘নতুন মুখ দেখছি,’ বলল মুক্তাদির আলাউয়ি।

পরিচয় করিয়ে দিল শায়লা। ‘চাচা, ইনি দাদুর কাছ থেকে আসছেন, আল শাহরিয়ার। শাহরিয়ার, আমার চাচা...’

রানার দিকে তর্জনী তাক করল মুক্তাদির আলাউয়ি। ‘খান আল আসকার, কেমন? বাপের বেটা, ওখান থেকে পালানো চাট্টিখানি কথা নয়।’ ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। ‘না, চাট্টিখানি কথা নয়। আটটিখানি কথাও নয়। ষোলোটিখানি...’

রানা ভাবল, এরকম মাতাল অবস্থায় লোকটা ট্রাক চালিয়ে ফিরল কীভাবে? কুশলাদি বিনিময়ের পর রানা জানতে চাইল, ‘শুনলাম আপনি কায়সারিয়ায় গিয়েছিলেন। শহরে আমার সম্পর্কে শুনলেন কিছু?’

চোখ পিট পিট করে কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করল

মুক্তাদির আলাউয়ি, তারপর ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোল পাকানো একটা খবরের কাগজ বের করল। ‘পেছনের পৃষ্ঠার নীচের দিকে দেখো, বাবা। তোমার কথা লিখেছে।’

ভাঁজ খুলে রিপোর্টটা বের করল রানা। বারো লাইনের একটা খবর ছাপা – আবিল আহুদ ওরফে আল শাহরিয়ার নামে এক কয়েদি খান আল আসকার জেলখানা থেকে পালিয়ে গেছে গত রোববার রাতে। জেলখানার চারদিকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত ঘেরাও দিয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে খবরের সঙ্গে কোনও ফটো ছাপা হয়নি।

কাগজটা ছুঁড়ে টেবিলে ফেলল রানা, তারপর মুক্তাদির আলাউয়ির দিকে ঘাড় ফেরাল। ‘এখন থেকে আমার অনুমতি ছাড়া কায়সারিয়া বা আর কোথাও যাবেন না আপনি। বুঝতে পারছেন?’

‘ঠিই-ই-ই-ক আছে, নাই-ই-ই গেলাম।’

‘এই একই নিয়ম তোমাদের জন্যেও, আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেউ কোথাও যেতে পারবে না।’ শায়লার চাচাকে পাশ কাটিয়ে লিভিংরুম থেকে প্যাসেজে, সেখান থেকে উঠানে বেরিয়ে এল রানা। ক্যাটল ট্রাকটার পাশে দাঁড়িয়ে উপত্যকার নীচে তাকাল, বহু দূর কায়সারিয়ার দিকে।

পিছনের পাথুরে স্ল্যাবে জুতো শব্দ হলো। ঘাড় ফেরাতে কোতোওয়াল আর জামালুকে দেখতে পেল দোরগোড়ায়।

‘শায়লা বলছিল, আধ মাইল পর রাস্তাটা থেমে গেছে, উপত্যকায় ওঠার ঠিক আগে?’ বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল কোতোওয়াল। ‘ওদিকটায় ভাঙাচোরা কিছু কটেজ ও পুরানো একটা লেড মাইন আছে। ভৌতিক পরিবেশ, গা ছমছম করে। আমি মাত্র একবারই গেছি ওদিকে।’

'যাই, ওদিকটা আমি একটু ঘুরে দেখে আসি,' বলে রাস্তা ধরে এগোল রানা।

ওকে রাস্তার বাঁক ঘুরতে দেখল তারা, ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে উপত্যকার মাথায়। ওর উদ্দেশে থুথু ছিটাল জামালু, হিসহিস করে বলল, 'শালাকে আমার কাঁচা চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে!'

'হজম করতে পারবে কি না সেটাও ভেবে দেখতে হবে,' বলল কোতোওয়াল। 'তার আগে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।'

লিভিংরুমে ফিরে এল তারা। টেবিলে বসে ঢুলছে মুক্তাদির আলাউয়ি, হাতে একটা ছোট বোতল। 'তোমার ভাইঝি কোথায়?' জানতে চাইল কোতোওয়াল।

'আমার জন্যে নাস্তা বানাতে কিচেনে গেল।'

'মোস্তফার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

আধবুড়ো মাতাল মাথা ঝাঁকাল। 'কায়সারিয়ার হোটেল বাগদাদিয়া-য় উঠেছে সে। বলেছি কাল কোনও একসময় তুমি তাকে ফোন করবে।'

'আমার পক্ষে কী করে তা সম্ভব?'

'উপত্যকার নীচে, মেঠো পথ যেখানে মেইন রোডে মিশেছে, সেখানে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান আছে।'

টেবিলের কিনারায় বসল কোতোওয়াল, ভুরু কুঁচকে ম্যাপটা দেখছে। 'জানতে পারলে ভাল হত শাহরিয়ার লোকটা আসলে কী করতে চায়।'

'নিজেই এখনও জানে না...'

জামালুকে বাধা দিয়ে মুক্তাদির বলল, 'ও শাহরিয়ার নয়।'

'জানি, ওর আরেকটা নাম আছে, আবিল আহুদ...'

'ও আবিল আহুদও নয়।'

‘মানে?’ এবার একযোগে জানতে চাইল তারা দুজন।

‘প্রতিটি হিব্রু ভাষার পত্রিকায় ওর ফটো ছাপা হয়েছে,’ বলল মুক্তাদির। ‘সেই ফটোর সঙ্গে তার এই চেহারার কোনও মিল নেই। খবরে বলা হয়েছে, ওর আসল নাম মাসুদ রানা, ইজরায়েলের ভয়ঙ্কর শত্রু। কেউ ওর খবর দিতে পারলে তাকে দেয়া হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। আর জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে পুরস্কার পাবে পাঁচ লক্ষ ডলার।’

‘কিন্তু জেল পালানো কয়েদি আমরা, পুরস্কারের টাকা নেব কীভাবে?’ জানতে চাইল জামালু। ‘নিতে গেলেই তো চিনে ফেলবে, সঙ্গে সঙ্গে আবার নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে চোদ্দ শিকের ভেতরে।’

‘না, এরকম ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়,’ বলল কোতোওয়াল। ‘যদিও, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা অবশ্যই করা যায়। তবে সেজন্যে কিছু সময় দরকার হবে।’

‘আমি তোমাদের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছি না,’ বলল মুক্তাদির। ‘কাজেই ওকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কারের টাকাটা অনায়াসে ঘরে তুলতে পারি আমি।’

‘এখনই নয়,’ বুদ্ধি দিল কোতোওয়াল। ‘এ ব্যাটার মাথায় ঘিলু আছে বলে মনে হচ্ছে। ওকে দিয়ে প্রথমে আমরা ট্রেন ডাকাতিটা করিয়ে নেব। ডলার আর হীরা সব আগে নিজেদের দখলে আনি, তারপর ওকে ইজরায়েলি মিলিটারির হাতে তুলে দেব। একা তোমাকে দিয়ে হবে না, তোমার সঙ্গে প্রফেশনাল লোকজন থাকতে হবে।’

সরাসরি বোতল থেকে দুই ঢোক হুইস্কি খেয়ে বার কয়েক ঢেকুর তুলল মুক্তাদির, তারপর বলল, ‘শালা ঘুঘু দেখেছে, ঘুঘুর

ফাঁদ কেমন তা দেখেনি।'

খপ করে বুকের কাছে তার শার্ট চেপে ধরল কোতোওয়াল। 'এই মদ খাওয়া তোমাকে ছাড়তে হবে, অন্তত অপারেশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তোমার আচরণ আমাকে নার্ভাস করে তুলছে। মনে রেখো, মাসুদ রানা বোকা নয়। আমাদের কারও সামান্য ভুল হলেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলবে সে। ব্যস, সেই সঙ্গে মাথা পিছু দু'তিন কোটি ডলার ক্লিন বেরিয়ে যাবে হাত ফস্কে।'

বাতাসের ছোঁয়া লাগল তার ঘাড়ে, মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শায়লা, হাতে একটা ট্রে। ভিতরে ঢুকল সে, নির্লিপ্ত চেহারা, চাচার সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখল ট্রেটা।

'ফের যদি দেখি আড়াল থেকে আমাদের কথা শুনছ,' হুমকি দিয়ে বলল জামালু, 'তার পরিণতি কিন্তু ভাল হবে না!'

তাকে গ্রাহ্য না করে চাচাকে শায়লা বলল, 'কেক আর স্যান্ডউইচ। আরও লাগলে কিচেন থেকে নিয়ে খেয়ো।' কামরা ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

একটু পর তাকে উঠানে দেখতে পেল তারা, গেটের দিকে যাচ্ছে। 'কী মনে হয়, আমাদের কথা শুনে ফেলেছে?' জানতে চাইল জামালু।

কোতোওয়ালের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। 'খুব সম্ভব। ওর ওপর একটা চোখ রাখতে হবে। শাহরিয়ার, ওরফে মাসুদ রানার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে, ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল লাগছে না।'

ফার্মহাউসের উপর, ঢালের মাথায়, একটা বোল্ডারের উপর বসে চিন্তা করছে রানা। ওর সামনে যত দূর দৃষ্টি যায় একটার পর

একটা ঢেউ খেলানো পাহাড়সারি।

'ভারি সুন্দর দৃশ্য, তাই না?' বলল শায়লা, বোল্ডারটায় উঠে এসে রানার পাশে খানিকটা দূরত্ব রেখে বসল।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'নীচে খারাপ কিছু ঘটছে।'

'কোতোওয়াল আর জামালুর কথা বলছেন?'

'আমার চাচার কথাও বলছি। ওরা জোট পাকিয়েছে। প্যাসেজ থেকে ওদের কিছু কথা আমার কানে এসেছে। মোস্তফার কথা কী যেন বলছিল। সে এখন কায়সারিয়ায়।'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

ভুরু কোঁচকাল শায়লা। 'আপনি অবাক হচ্ছেন না।'

'অবাক হবার কোনও কারণ নেই। মোস্তফা আর উকিল টমসনকে গোপন পরামর্শ করতে দেখে এসেছি আমি। নতুন আর কী শুনলেন আপনি?'

'কোতোওয়াল কাল তাকে ফোন করবে, মেইন রোডের ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে। আমার ধারণা কাজটা সম্পর্কে আপনার মতামত না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।'

'হুঁ।'

'আরেকটা কথা,' বলল শায়লা। 'ওরা বলছিল, ভুল-ভাল করলে আপনি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবেন, সেই সঙ্গে মাথাপিছু দু'তিন কোটি ডলার বেরিয়ে যাবে তাদের হাতের মুঠো থেকে।'

হাসল রানা। 'যা ভেবেছি। সবটুকুই খেতে চায়।'

'এখনও আপনাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখবেন।' রানার মুখে উষ্ণ হাসি।

‘ভাবতে ভাল লাগছে যে আমি একা নই।’

শায়লার মুখটা সামান্য লালচে হয়ে উঠল।

দশ

বুধবার।

রাতে বৃষ্টি হয়নি, তারপরও সকালে শীত শীত করছে। বাড়ির পিছনের মাঠে হালকা কুয়াশা ঝুলে থাকতে দেখল রানা। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে তিন-চার মাইল দূরের ছোট শহর হেফজি বাহ্-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

চিলেকোঠায়, একটা ক্যাম্প বেডে রাত কাটিয়েছে রানা। কিচেনে বসে শায়লা আর ইসহাকের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরেছে ও, বাকি কারও তখনও ঘুম ভাঙেনি। ভাল ঘুম হওয়ায় শরীরটা তাজা লাগছে, এই মুহূর্তে শায়লার জন্য অপেক্ষা করছে ও। গোলাঘর থেকে গাড়িটা বের করে আনতে গেছে সে।

ওর পিছনে বাড়ির দরজা খুলে গেল। মুক্তাদির আলাউয়ির চিৎকার শোনা গেল। ‘শালার বেটা!’ ছেলেকে গালি দিচ্ছে সে। ‘অকর্মার ধাড়ি! ভেড়াগুলোকে না পেলে এ-বাড়িতে আর ফেরার দরকার নেই তোর, যা!’

শরীরটাকে বাঁকা করে বাপের একটা লাথি এড়াল ইসহাক, তারপর খিঁচে দৌড় দিল, জ্যাকেটটা পতাকার মত উড়ছে পিছনে।

রানাকে পাশ কাটাবার সময় চট করে একবার তাকাল সে। তার চোখের সাদা জমিন হলদেটে হয়ে আছে, শিরাগুলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সরু মুখটা দেখে মনে হয় ভূতে পাওয়া কোনও দুর্ভাগা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল সে। তার প্রতি দরদে টনটন করে উঠল রানার বুকটা।

'ওই ছেলের জ্বালায় মরে গেলাম আমি, মিস্টার শাহরিয়ার,' কাছে এসে বলল মুক্তাদির আলাউয়ি।' কোমরে শার্ট গুঁজছে সে। 'আপনারা দেখছি সকাল সকাল বেরুচ্ছেন।'

'কাজও অনেক,' বলল রানা। 'কোতোওয়াল আর জামালু এখনও ঘুমাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'এরকম নিকৃষ্ট মানুষদের কাছ থেকে আর কী আশা করেন আপনি? হয় ঘুম, না হয় কারও অনিষ্ট করার চিন্তা, এই দুটোই তো কাজ ওদের।'

টয়োটা নিয়ে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এল শায়লা। গাড়ি থামতে দরজা খুলে তার পাশে উঠে বসল রানা, জানালার কাঁচ নামিয়ে মদ্যপ লোকটার উদ্দেশে বলল, 'ট্রাক, মরিস বা কাভারড্ ভ্যান নিয়ে কোথাও যাবার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যান। চাবিগুলো আমার কাছে। কোতোওয়ালকে বলবেন, দুপুরে ফিরব আমি।'

মুক্তাদিরের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল শায়লা।

নেভি ব্লু রঙের স্কি প্যান্ট পরেছে সে, গায়ে চড়িয়েছে ভারী শিপস্কিন-এর জ্যাকেট, মাথায় জড়ানো সিল্ক স্কার্ফ। ফরসা মুখটা বেদানার মত রাঙা হয়ে উঠল, কারণটা হলো বারবার তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে রানা।

'আপনার চাচা পাহাড়ের ওদিকে তাড়িয়ে দিল ছেলেটাকে,'

বলল রানা। 'ভেড়া-ছাগল না আনতে পারলে ফিরতে মানা করে দিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল শায়লা। 'পাঁচ-সাতটা করে স্থানীয় বাজারে বেচছে চাচা। নিয়ে আসার লোক নেই, ওগুলো প্রায় রাতেই পাহাড়ে থেকে যায়। মাঝে-মধ্যে ওগুলোকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।'

'ইসহাকের একটা শিপডগ দরকার না?'

'ছিল একটা। পুরানো মাইন শাফটে পড়ে গত মাসে মারা গেছে। ওগুলোর কোনও কোনওটা দুশো ফুট গভীর।'

হাডেরা হয়ে তালমি এল' আযার-এ এল ওরা। এরপর রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে মা'উর, সিদি ইযহাক, আহিটাভ, বির এস্ সিক্কা ও তুলকারাম পর্যন্ত এগিয়ে স্টেশনগুলো দেখল। আরও সামনে, সেই শুয়েকাহ্ স্টেশনটাও দেখে এল।

এখানে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গাড়িতে বসে থাকল রানা, শায়লা গেল ট্রেন-এর শেডিউল পাওয়া যায় কি না দেখতে। দশ মিনিট পর ফিরল সে, হাতে একটা কমপিউটর প্রিন্টআউট। সেটায় চোখ বুলাবার সময় ভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না রানা। কোন্ ট্রেন কখন রওনা হয়ে ঠিক ক'টার সময় কোথায় পৌঁছাবে এ-সব তথ্য তো জানা যাচ্ছেই, ম্যাপ ছেপে রুটগুলোও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাড়িটা বিরাট এক শপিং মলের পার্কিং এরিয়ায় রেখে পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওরা, রেললাইন ধরে বির এস সিক্কা স্টেশন থেকে তালিম এল' আযর স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর একটা শাখা লাইন দেখতে পেল রানা, শুরু হওয়ার পর সমান্তরাল রেখা ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে

আবার মূল লাইনের সঙ্গে এক হয়েছে। স্টেশনের কাছাকাছি এই শাখা লাইন রাখার উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজনে যাতে ইঞ্জিনকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায়। লাইন দুটোর দু'পাশে পাহাড়ী ঢাল, প্রায় খাড়া ভাবে উঠে গেছে। তবে ঢালগুলো ন্যাড়া নয়, ছোটবড় নানান সাইজের বোল্ডার ছড়িয়ে আছে চারদিকে, ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে ঘন কাঁটাঝোপ।

কাজ সেরে সেদোত ইয়াম-এ ফিরতে বিকেল হয়ে গেল ওদের। ফার্মহাউসের কাছাকাছি পৌঁছে জানতে চাইল শায়লা, 'কাজটা কি করা সম্ভব, মিস্টার রানা?'

'আপনি আমাকে মিস্টার না বললেই আমি খুশি হব,' বলল রানা।

'আমিও খুশি হব আপনি যদি আমাকে আপনি না বলেন।'

'বেশ, বলব না,' বলল রানা। 'তবে তুমিও আমাকে তুমি বলবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, শায়লা, কাজটা করা সম্ভব।' হাসছে ও। 'তবে দাদুর সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে আমাকে।'

চোরাকাদা এড়িয়ে জলাভূমির মাঝখানটা চষে বেড়াচ্ছেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বখতিয়ার খিলজি আর তাঁর সঙ্গীরা। প্রত্যেকের পায়ে রাবার বুট থাকায় রক্ষে, তা না হলে এতটা গভীর কাদা থেকে পা তোলা সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

ইজরায়েলের কিছু এলাকা সমুদ্রসারফেস-এর চেয়েও নিচু, এটা জানা আছে পুলিশ সুপারের, কিন্তু উপত্যকার ঢাল ও মাথাও যে কাদার তৈরি হতে পারে তা তাঁরও জানা ছিল না।

এক জায়গায় থেমে সার্জেন্টের দিকে ফিরলেন খিলজি। 'এ-ধরনের পরিবেশে একজন মানুষ কতক্ষণ টিকতে পারে?'

‘শুনলে আপনি অবাক হবেন, সার,’ বলল সার্জেন্ট নেতানেয়াহু। ‘অনেক সময় সাতদিনও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। ক্লাসিক কেসটা বছর পাঁচেক আগের। তখন শীতকাল, কয়লাখনিতে কাজ করতে বেরিয়ে এক কয়েদি পালাল। পনের দিন ধরা দেয়নি সে।’

‘কী করে তা সম্ভব হলো?’

‘জেলখানা থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কটেজে লুকিয়ে ছিল। এটাই হলো সমস্যা। জেলখানার চারদিকের জলাভূমিতে এ-ধরনের জায়গার কোনও অভাব নেই। বছরের বেশিরভাগ সময় ওগুলো খালি পড়ে থাকে, অথচ সারাক্ষণ নজর রাখা সম্ভব নয়।’

উপত্যকার নীচে নেমে এসে নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন খিলজি। ওটার পিছনে পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আল শাহরিয়ার পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দৃশ্যটা যেন আরও ক্লান্ত করে তুলল তাঁকে।

কার ও জিপের কাছাকাছি চলে এসেছেন, কুয়াশার ভিতর থেকে একটা ল্যান্ডরোভারকে এগিয়ে আসতে দেখলেন খিলজি। রাস্তার পাশে থামল ওটা, নীচে নেমে পুলিশ সুপারের দিকে এগিয়ে এল মোসাদ এজেন্ট মিরাজ তারিকি।

‘ওদিকটায় কোনও ক্লু পেলেন?’

মাথা নাড়ল তারিকি। ‘আপনার হেড কনস্টেবলের ধারণা, পরবর্তী পদক্ষেপ হওয়া উচিত বাড়ি বাড়ি তল্লাশি। এলাকায় প্রচুর পরিত্যক্ত কুঁড়ে খালি পড়ে আছে, যে-কোন একটায় লুকিয়ে থাকতে পারে।’

‘কিন্তু এ গ্যারান্টি কে দেবে, যেগুলোয় এরইমধ্যে তল্লাশি

চালানো হয়ে গেছে তার একটায় গিয়ে ঢুকবে না সে?'

সার্জেন্ট নেতানেয়াহু বলল, 'ব্রিজ পার হয়ে এবার আমাদের পাথরের বাড়িটা একবার দেখা দরকার, সার। কয়লাখনির পরিবহন ঠিকাদারের ভাই আল মোস্তফা জেল খাটা আসামী, এক রাখাল দু'একজন লোককে ওই বাড়িটায় আসা-যাওয়া করতে দেখেছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখা দরকার,' বলল তারিকি। 'আমার কাছে একটা খবর আছে। মোসাদ হেডকোয়ার্টার জানিয়েছে জেলখানার ভেতর যে উকিল আবিল আহ্দ ওরফে শাহরিয়ার ওরফে মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার কোন অস্তিত্বই নেই।'

পুলিশ সুপার বললেন, 'আচ্ছা! তার মানে এটা সাধারণ কোনও পালানোর ঘটনা নয়। গোটা ব্যাপারটা পরিকল্পিত। তা না হলে ভুয়া একজন উকিল কী কারণে আল শাহরিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে আসবে?'

'এর আরেকটা মানে, সার.' বলল সার্জেন্ট নেতানেয়াহু, 'টমসন নিশ্চয়ই জানত জেল থেকে বেরুবার কৌশল জানা আছে আল শাহরিয়ারের।'

'এভাবে দুয়ে দুয়ে চার মেলালে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মোসাদ এজেন্ট লেভি মুভিনকে এই শাহরিয়ারই খুন করেছে,' বলল মোসাদ এজেন্ট মিরাজ তারিকি। 'আমাদের ধারণাই সত্যি হতে চলেছে, এই লোক মাসুদ রানা না হয়ে যায় না।'

'সন্দেহ নেই, সাংঘাতিক মানুষ,' বললেন পুলিশ সুপার। 'এতক্ষণে ইজরায়েল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

'উঁহুঁ, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না,' বলল তারিকি। 'এত তাড়াতাড়ি যদি চলেই যাবে, তা হলে আবিল

আহুদের পরিচয় নিয়ে ইজরায়েলে ঢুকল কেন সে?' মাথা নাড়ল ঘন ঘন। 'কোনও একটা কাজে এসেছে লোকটা, সেটা শেষ না করে ফিরবে না।'

'সেক্ষেত্রে অন্ধকারে না হাতড়ে সূত্র ধরে এগোনো উচিত,' বললেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি। 'সার্জেন্ট, আপনি জেরুজালেমে চলে যান, খোঁজ নিয়ে দেখুন উকিল টমসন সম্পর্কে কী জানা যায়। ভুয়া উকিলের চরিত্রে যারা অভিনয় করে, সাধারণত দেখা যায় অতীতে তারা প্র্যাকটিস করত। নানা কারণে গত কয়েক বছরে যাদের প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স কেড়ে নেয়া হয়েছে তাদের তালিকার ওপর চোখ বুলাতে ভুলবেন না। আরেকটা কথা, নেতানেয়াহু!'

'ইয়েস, সার?'

'টপ প্রায়োরিটি। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

কোলের উপর ছড়ি নিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছেন খাদেমুল দাউদ। চোখ দুটো আধবোজা, যেন ঘুমিয়ে পড়বেন। চিবুক থেকে জরাগ্রস্ত চামড়া ঝুলছে।

উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা।

শায়লা কিচেনে ব্যস্ত, ওদের জন্য বিকেলের নাস্তা তৈরি করছে।

'শেষ কবে আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন, দাদু?' জানতে চাইল ও।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন বৃদ্ধ। 'আমার ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না, রানা। দেখে যত খারাপ মনে হচ্ছে আসলে আমার অবস্থা অতটা খারাপ নয়। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে

আলোচনা করা দরকার।'

'বেশ। কী মনে হলো আপনার?'

'তোমার প্ল্যানটা?' কর্কশ শব্দে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ দাউদ। 'তোমার কাছ থেকে যেমনটি আশা করা যায়, কোল্ড নার্ভ ও সিমপ্লিসিটির মিশ্রণ দেখতে পাচ্ছি আমি। ট্রেন ডাকাতি নয়, ট্রেন হাইজ্যাক – এককথায়, মার্ভেলাস!'

'এই এলাকা সম্পর্কে আমার ধারণা কম,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাই, প্ল্যানটা প্র্যাকটিকাল হয়েছে কি না।'

'এটা ব্যর্থ হবার আমি তো কোনও উপায় দেখছি না।'

'কোনও খুঁত?'

'চল্লিশ মিনিট পর ওই লাইন ধরে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসবে,' বললেন খাদেমুল দাউদ। 'হাইজ্যাক করা ট্রেনকে তোমরা যদি পেছনদিকে ছোটাও, সংঘর্ষ...'

'সংঘর্ষ হবার কোনও ভয় নেই,' বলল রানা। 'প্যাসেঞ্জার ট্রেন রওনা হবে হাইফা থেকে, তালমি এল' আযার-এ পৌঁছাতে ওটার যে সময় লাগবে বির এস সিক্কা থেকে ওই একই জায়গায় আমাদের পৌঁছাতে সময় লাগবে তার অর্ধেক, কারণ দূরত্বটাও প্রায় অর্ধেক।'

'তা হলে সব ঠিকই আছে। ট্রেনটা কে চালাবে তা কিন্তু তুমি বলোনি।'

'দরকার হলে আমি চালাব,' বলল রানা। 'তবে দু'তিনজন সহকারী দরকার হবে আমার। তাদের মধ্যে অন্তত একজনকে ফায়ার আর্মস চালাতে জানতে হবে, আরেকজনকে হতে হবে ট্রেন সম্পর্কে অভিজ্ঞ – এই যেমন বগি জোড়া লাগাতে পারে, প্রয়োজনে চালাতেও পারে...

‘প্যালেস্টাইনে আর্মস আবার কে চালাতে না জানে,’ বলে হেসে উঠলেন দাদু। ‘দেখা যাচ্ছে আমার বডিগার্ডদের কথা মনে রেখেই প্ল্যানটা তৈরি করেছ তুমি। ওরা তিনজনই রেলওয়ের কর্মচারী ছিল। আমি ওদেরকে অস্ত্র চালানো শিখিয়েছি। ওদেরকে তুমি নিতে পার।’

‘আপনি এখানে একা থাকবেন?’

‘একা থাকতে আমার কোনও সমস্যা নেই। তা ছাড়া, শায়লা তো আছেই।’

‘শায়লাকেও আমার দরকার হবে, দাদু,’ বলল রানা।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ দাউদ। ‘ওকে আমি কোনও অ্যাকশনে পাঠাতে পারি না, রানা।’

‘একজন বুড়ি, এক পাল ভেড়া নিয়ে রেললাইন পার হচ্ছে, ঠিক যখন কাছাকাছি চলে এসেছে ব্যাঙ্কার’স ট্রেন,’ বলল রানা। ‘অনেক চেষ্টা করছে সে, কিন্তু ভেড়াগুলোকে লাইন থেকে নামাতে পারছে না... ট্রেনের ড্রাইভার স্পিড কমাতে বাধ্য হবে, সেই সুযোগে ওটার পেছনের বগিতে উঠে পড়ব আমরা।’

‘বেশ।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দাদু। ‘বোঝা যাচ্ছে ওর সাহায্য তোমার খুব দরকার। তবে, রানা...’ এটুকু বলে থেমে গেলেন তিনি।

‘তবে, দাদু?’

‘শায়লার ব্যাপারে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তুমি ওকে অ্যাকশনে রাখতে চাইছ বলে আমি শর্ত দিচ্ছি, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। হয়তো সময়ের আগে হয়ে যাচ্ছে, তবে কথাটা এক সময় তোমাকে আমার বলতেই হত।’

‘এত ভূমিকা করার দরকার নেই, দাদু। আপনি যা খুশি

নির্দ্বিধায় বলুন।’

‘দোয়া করি নিরাপদেই এই নরক থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি,’ বললেন খাদেমুল দাউদ। ‘যখন যাবে, যদি সম্ভব হয়, শায়লাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। এটা তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ।’

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘ওর সমস্যাটা শুনেছি। আপনি না বললেও ওদেরকে বের করে নিয়ে যেতাম, দাদু।’

‘ওদেরকে?’

‘শায়লা আর ইসহাক,’ বলল রানা। ‘অসহায় ভাইটির প্রতি তার এত বেশি মায়া যে তাকে ছাড়া কোথাও যাবে না শায়লা।’

‘আল্লাহ মেহেরবান!’ চোখ বুজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন দাদু।

‘তা হলে ঠিক হলো,’ বলল রানা, ‘আপনার দুজন বডিগার্ডকে নেব আমরা। রুস্তম আর জিগলুকে। তবে মুহাদিয়াকেও পরে দরকার হবে আমার।’

‘বেশ, তাই হবে।’ মাথা ঝাঁকালেন দাদু।

এগারো

বুধবার, শেষ বিকেল।

‘প্ল্যানটা আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি,’ টেবিলে বসা ও

লিভিংরুমের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো সবার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করল রানা।

দাদুর ফার্মহাউস থেকে আসার সময় রুস্তম ও জিগলুকে নিয়ে এসেছে ওরা। আসার পথে গাড়িতে তাদেরকে ব্রিফ করেছে রানা, জানিয়ে দিয়েছে বন্ধুবেশে শত্রুদের পরিচয়। এই মুহূর্তে দরজার দু'পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছে কোতোয়াল আর জামালুর উপর। তারা দুজন বসেছে রানার মুখোমুখি দুটো চেয়ারে, মাঝখানে মুক্তাদির আলাউয়িকে নিয়ে। শায়লা বসেছে রানার পাশে।

রানার প্ল্যানটা এরকম:

ডাকাতি নয়, ট্রেনটাকে হাইজ্যাক করা হবে। অপারেশন শুরু হবে বির এস সিক্কার মাইল দুয়েক আগে, কারণ ওখানে ট্রেন ঘুরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে। শেষ হবে তালমি এল আযরা-র দক্ষিণ প্রান্তে।

রোববারে ইহুদিদের বেশ কয়েকটা হাট বসে, প্রতিটি হাটে প্রচুর শুয়োর ও ভেড়া বেচাকেনা হয়। সকাল দশটার দিকে শায়লাকে নিয়ে প্রথমে রওনা হবে মুক্তাদির আলাউয়ি। ওদের ক্যাটল ট্রাকে দশ-বারোটা ছাগল ও ভেড়া থাকবে। বির এল সিক্কা স্টেশনের মাইল দুয়েক আগে, জঙ্গলের ধারে, ভেড়া-ছাগল ও শায়লাকে নামিয়ে দেবে সে।

ভেড়ার পাল নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করবে শায়লা। ব্যাঙ্কার'স ট্রেন যখনই আসুক, সেটাকে আসতে দেখলে ওগুলোকে নিয়ে লাইনের উপর উঠে পড়বে সে। বাঁক ঘোরার সময় ট্রেনের বগিগুলো দেখতে পাওয়া যাবে, ওগুলোর সংখ্যা আট হলে ধরে নিতে হবে ওটাই মেইল, অর্থাৎ ব্যাঙ্কার'স ট্রেন।

শায়লাকে নামিয়ে দিয়েই কাছাকাছি কোনও হাটে চলে যাবে মুক্তাদির আলাউয়ি, দশ-বারোটা শুয়োর কিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাবে তালমি এল আযার-এর দক্ষিণ প্রান্তে, রেললাইনের ধারে, শহর যখন আর ঠিক দু'মাইল দূরে।

শায়লাকে নিয়ে তার চাচা বেরিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর ভাঙাচোরা, তোবড়ানো মরিস ভ্যানে চড়ে রওনা হবে রানা ও কোতোওয়াল। বিপজ্জনক লোকটাকে যতক্ষণ পারা যায় নিজের পাশে রাখতে চাইছে রানা, তার উপর যাতে একটা চোখ রাখা যায়। সঙ্গী জামালুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখাটাও উদ্দেশ্য।

জামালু থাকবে রুস্তম আর জিগলুর সঙ্গে। তারা শায়লার চেয়ে দু'ঘণ্টা আগে রওনা দেবে, বির এস সিক্কায় পৌঁছাবে পায়ে হেঁটে। ট্রেনের গার্ডকে সামলাবে জামালু আর রুস্তম, তারপর চলে আসবে ইঞ্জিন সংলগ্ন বগির মাথায়। ওখানে রানা ও কোতোওয়াল থাকবে, ট্রেনের ড্রাইভারকে কাবু করবার কাজে ওদেরকে সাহায্য করবে তারা।

গার্ডের কাছে রেডিও ফোন আছে, লক্ষ রাখতে হবে সেটা যেন কিছুতেই ব্যবহার করতে না পারে সে। তবে বিনা প্রয়োজনে কাউকে খুন করা যাবে না।

ট্রেন চালাবে রানা, ওকে সাহায্য করবে কোতোওয়াল। পুলিশ, সিকিউরিটি গার্ড ও সৈনিকদের সম্ভাব্য হামলার জবাব দেবে রুস্তম আর জামালু।

হাতের কাজ শেষ হলে ট্রেন থেকে নেমে যাবে রুস্তম আর জিগলু। নেমে কোথায় যাবে বা কী করবে সেটা শুধু ওরা আর রানা জানে, আর কাউকে জানানো হয়নি। শুধু বলা হলো, ওরা দুজন ব্যাকআপ টিম হিসাবে থাকবে।

জিগলু-র কাজ ট্রেনটাকে দু'ভাগ করা। ইঞ্জিন ও পাশের বগিটা রেখে ট্রেনের বাকি অংশ আলাদা করে ফেলা হবে। চেষ্টা করা হবে ট্রেন সচল থাকার সময়ই কাজটা যাতে করা যায়। তা করা সম্ভব হলে বেশিরভাগ সশস্ত্র প্রতিপক্ষ রয়ে যাবে ইঞ্জিনবিহীন বগিগুলোর একটায়। প্রথম বগিতে ডলারের বস্তার সঙ্গে যদি হীরা ভর্তি ব্রিফকেস থাকে, শুধু তা হলেই ওটায় কিছু প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড থাকবে। ইঞ্জিনসহ প্রথম বগি আলাদা করে ফেলার পর উল্টোদিকে ছুটবে ট্রেন, অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে যাবে।

যাবে তালমি এল' আযার-এর দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত, থামবে শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে থাকতে। ওখানে ট্রাক ভর্তি খড় ও শুয়োর নিয়ে অপেক্ষা করবে মুক্তাদির। ট্রেন থামিয়ে নামবে ওরা, ডলারের বস্তা ও ব্রিফকেস [যদি থাকে] তোলা হবে ট্রাকে, লুকানো হবে খড়ের গাদার ভিতরে। সবার পরনে নোংরা কাপড়চোপড় থাকবে, যেন হাট থেকে ফিরছে দেহাতি লোকজন। ওরা সবাই গলা ফাটিয়ে হিব্রু ভাষার গান গাইতে গাইতে সেদোত ইয়ামে ফিরবে।

এক পর্যায়ে গোফরান জামালু জানতে চাইল, ভাগ-বাটোয়ারা কীভাবে হবে?

ভাগ-বাটোয়ারা নয়, মজুরি, শুধরে দিয়ে বলল রানা। না, ওর বিবেচনায় ত্রিশ হাজার ডলার কম হয়ে যায়, কোতোওয়াল আর জামালুকে দেওয়া হবে পঁচিশ হাজার করে, মোট পঞ্চাশ হাজার ডলার। আর হীরা পাওয়া গেলে মজুরি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। রানা আরও জানাল, মুক্তাদির আলাউয়ি আরও বেশি পাবে, তবে সেটা কত তা নির্ধারণ করবেন দাদু।

সব শেষে রানা বলল, ‘কারও কোনও প্রশ্ন আছে?’

কোতোওয়ালের দিকে তাকাল জামালু। ‘কেমন লাগল তোমার?’

মাথা চুলকাচ্ছে কোতোওয়াল। ‘আমার তো ভালই লাগছে,’ বলল সে। ‘স্বীকার করছি, শাহরিয়ারের ঘিলু আছে। আমি রাজি, চুক্তিমত কাজ করতে আমি রাজি।’

‘তা হলে আমিও,’ বলল জামালু।

‘তবে সামান্য একটু খুঁত আছে,’ বলল কোতোওয়াল।

‘সময় থাকতে বলে ফেলো, শুধরে নেয়া যাবে,’ তাগাদা দিল রানা।

‘ট্রেনে ড্রাইভার আর তার সহকারীর পরনে ইউনিফর্ম থাকে। আমরা সিভিল ড্রেসে থাকলে আশপাশের লোকজনের সন্দেহ হতে পারে। বেশ কিছুটা পথ লোকালয়ের ভেতর দিয়ে পিছু হটব আমরা। ভাগ্য খারাপ হলে কোনও রেলকর্মী কিংবা পুলিশের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে।’

‘তোমার কথায় যুক্তি আছে,’ বলল রানা। ‘তবে ড্রাইভার আর তার সহকারীকে কাবু করার পর তাদের ইউনিফর্ম আমরা ব্যবহার করতে পারব না কেন?’

‘পারব, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওদেরকে ইঞ্জিনরুমের মেঝেতে উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখতে হবে।’

‘না, তা হবে না,’ বলল রানা। ‘অজ্ঞান করার পর কম্বল কিংবা তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হবে তাদেরকে।’

‘ও, আচ্ছা, হ্যাঁ।’ আবার মাথা চুলকাল কোতোওয়াল। ‘আরেকটা কথা।’

‘বলো।’

'তুমি বলেছিলে জেলিগনাইট ও নার্ভ গ্যাস দরকার,' বলল কোতোওয়াল। 'কায়সারিয়ার এক লোককে চিনি আমি, বললে হয়তো ব্যবস্থা করতে পারবে সে।'

'হাতে সময় আছে, কাল সকালে আমার গাড়ি নিয়ে একবার ঘুরে আসো তোমরা দুজন,' বলল রানা। 'জিনিসটা পেলে খুব ভাল হয়। আরও একটা জিনিস দরকার হবে – বস্তা। যে ক্যানভাসের ব্যাগে ডলার থাকবে সেগুলো নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অভ ইজরায়েল-এর সম্পত্তি হবে, দেখলেই যাতে চেনা যায়। কাজেই ওগুলো নিয়ে চলাফেরা করা উচিত হবে না। বড় আকারের চটের বস্তা লাগবে কয়েকটা। পুরানো হলেই ভাল হয়। ব্যাগের সব ডলার ওই বস্তায় ভরে নেব আমরা।'

এই সময় উঠান থেকে ঘোড়ার চিঁহিঁ-হিঁ ডাক ভেসে এল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সবাই। দেখা গেল গোলাঘরের ভিতর থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসছে আত্মভোলা ইসহাক, ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে আপনমনে গান গাইছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল সে, গাড়িতে পাহাড়ের মত স্ত ূপ হয়ে আছে শুকনো খড়। সময়টা গোধূলি, আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, প্রতিবন্ধী ছেলেটা গরু-ছাগল ও ভেড়ার খাবার নিয়ে পাহাড়ে যাচ্ছে। এই দায়িত্ব কেউ তাকে দেয়নি, কাজটা নিজের গরজেই করে সে। ও জানে, অবোলা জীবদেরও খিদে লাগে।

জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল কোতোওয়াল। 'ধন্যবাদ, শাহরিয়ার।' খুশি হয়ে উঠেছে সে। 'শহরে গেলে একটু ঘুরে বেড়ানোও হবে।'

'উঁহুঁ,' আপত্তি করল রানা। 'কোথাও আড্ডা মারা চলবে না। কাজ সেরে সোজা ফিরে আসবে তোমরা। আর তোমাকে বলছি,'

ঘাড় ফিরিয়ে জামালুর দিকে তাকাল ও, আরেকটা গাঁজা ভরা সিগারেট ধরাচ্ছে সে, 'এই নেশাটা ছাড়তে হবে তোমাকে, অন্তত কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও, শাহরিয়ার, আমি আমারটায় দিই।' রাগ রাগ একটা ভাব দেখিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল জামালু।

সিগারেট ধরাল কোতোওয়াল। 'একটা ব্যাপারে খুঁত খুঁত করছে মনটা। কাজ সেরে আমরা এখানে ফেরার পর কী ঘটবে?'

রানার মনে পড়ল, শায়লা আর ওর পালানোর কী উপায় করা যায় তা নিয়ে মুক্তাদির আলাউয়ির সঙ্গে গোপনে আলোচনা করেছে ও। আলোচনা শুরুর আগে মাতাল লোকটাকে বিশেষভাবে বারণ করে দিয়েছে, এ-ব্যাপারে কোতোওয়াল আর জামালু যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কাভারড্ ভ্যানে ফলস বটম লাগিয়ে দেবে মুক্তাদির, সেখানে লুকিয়ে থাকবে রানা আর শায়লা। মুক্তাদির নিজে ভ্যান চালিয়ে বন্দরে পৌঁছাবে, মিশরগামী জাহাজে তুলে দেবে ওদেরকে। ওদের সঙ্গে যে তার ছেলে ইসহাকও যাবে, এটা এখনও জানানো হয়নি তাকে।

'সোমবারটা আমরা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব এখানে, তারপর যে-যার পথ ধরব,' কোতোওয়ালের প্রশ্নের জবাবে বলল রানা।

'মিষ্টি ভাগ হবে কখন?'

'হবে না,' বলল রানা। 'লুঠের ভাগ নয়, তোমরা তোমাদের পাওনা পাবে। পাবে ঠিক পনেরোদিন পর, শেফাইমে, যার মধ্যস্থতায় তোমাদেরকে ভাড়া করা হয়েছে তার কাছ থেকে। চুক্তিতে ঠিক যেমন বলা হয়েছে।'

'তা বলা হোক। খুশির দিনে এখানেই দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিলে ক্ষতি কী?'

'তুমি আমাকে হতাশ করলে, কুদ্দুস কোতোওয়াল। আমি ভেবেছিলাম তোমার মাথায় কিছুটা ঘিলু আছে।' মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা চুক্তিটাকে সম্মান করব।'

'তোমার আর কী, কেটে পড়ার রাস্তা নিশ্চয়ই ঠিক করে রেখেছ,' বলল কোতোওয়াল। 'কিন্তু আমার আর জামালুর কী হবে?'

'কেন, এক কী দু'হপ্তা লুকিয়ে থাকবে এখানে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে বেরিয়ে যেয়ো।'

মাথা ঝাঁকাল কোতোওয়াল। 'দেখি, তা-ই হয়তো করতে হবে।' হাত দুটো উপরদিকে খাড়া করে আড়মোড়া ভাঙল সে। 'খেতে বসার আগে যাই একটু হেঁটে আসি।'

কোতোওয়াল চলে যাওয়ার পর হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে সশব্দে ঘষল মুক্তাদির। 'আল্লাহ ফিলিস্তিনিদের রক্ষা করুন। আমরা একটা আদর্শের জন্যে লড়াই করছি, নিশ্চয়ই কামিয়াব হব। আমিও একবার কিচেন থেকে ঢুঁ মেরে আসি, দেখি গাঁজাখোর জামালুটা আমার বোতলগুলো খালি করে ফেলছে কি না।'

সবশেষে বাড়ির চারদিকে টহল দিতে বেরুল রুস্তম আর জিগলু।

কামরা খালি হয়ে যেতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা।

দেখাদেখি শায়লাও দাঁড়াল, বলল, 'আসলে কোথায় গেল কোতোওয়াল? মোস্তফাকে ফোন করতে?'

'সেটাই দেখতে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'চারদিকে নজর রেখো

তুমি, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

উঠানে বেরিয়ে এসে রানা দেখল চারদিক এরইমধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি শুরু না হলেও, আকাশ জুড়ে জমাট বাঁধছে মেঘ। নাভীর কাছে ট্রেঞ্চকোটটার বেল্ট বেঁধে নিয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠল ও। উপত্যকার মাথায় আবছামত দু'পেয়ে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে আন্দাজ করল, ওটাই কোতোওয়াল। কায়সারিয়ার মেইন রোডে পৌঁছাতে হলে ওদিক দিয়েই যেতে হবে তাকে।

আধ ঘণ্টা পর ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ইতিমধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে রানা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তায় কোতোওয়ালকে অনুসরণ করতে ওর কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

আরও চল্লিশ মিনিট পর জলাভূমি ও মাঠ পেরিয়ে সাগর ঘেঁষা মেইন রোডে উঠল কোতোওয়াল। এদিকে একটা ফিলিং স্টেশন ও পাবলিক টেলিফোন বুদ আছে। দূর থেকেই দেখা গেল ফিলিং স্টেশনটা সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে। তবে অত দূর গেল না কোতোওয়াল, রাস্তা পেরিয়ে ফোন বুদে ঢুকল সে।

রাস্তার এপারে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। একবার শুধু একটা ট্রাক ছুটে গেল কায়সারিয়ার দিকে, তারপর সব আবার নীরব ও স্থির হয়ে গেল। আলোকিত বুদে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল কোতোওয়াল।

তার ফোন শেষ হওয়ার প্রায় বিশ মিনিট পর অস্পষ্টভাবে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা। কায়সারিয়ার ওদিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। দশ-পনের সেকেন্ড পর একটা মিনি-কার ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার কিনারায়, জানালা খুলে বাইরে মুখ বের করল আল মোস্তফা।

দরজা খুলে ঝটপট তার পাশে উঠে বসল কোতোওয়াল। দূরত্ব মাত্র বিশ ফুট হলেও কী আলাপ হচ্ছে শোনার কোনও উপায় নেই। দু'এক মুহূর্ত পর পিছিয়ে অন্ধকারে সরে গেল রানা, তারপর ঘুরে ফার্মহাউসের পথ ধরল।

আরেকবার জানা গেল, লোকগুলোর উদ্দেশ্য ভাল নয়। কিন্তু উকিল টমসনকে দেখা যাচ্ছে না কেন? কোথায় সে, কী করছে? আড়ালে থেকে সে-ই কি এদেরকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে? সম্ভব, কারণ লোকটাকে দেখে অ্যাকটিভ টাইপের মনে হয়নি ওর।

পরদিন বৃহস্পতিবার শায়লা আর ইসহাককে নিয়ে পাহাড়ে উঠল রানা, তিনজন মিলে সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত পিকনিক করল। সেই একেবারে প্রথমদিন থেকেই রানার দারুণ এক ভক্ত হয়ে উঠেছে ইসহাক। ছেলেটার মধ্যে যেন অলৌকিক কিছু আছে। মুখ খোলারও আগে কীভাবে যেন সে বুঝতে পারে, ওকে ডাকবে রানা। রানা অবাক হয়ে দেখে, তার কথা শুধু ভেবেছে ও, অমনি কোত্থেকে ছুটে চলে এসেছে ওর সামনে।

ইতিমধ্যে আরও সহজ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে রানা আর শায়লার সম্পর্ক। দুজনের মধ্যেই পরস্পরকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে শরীরে। তবে দুজনেই যে যার লাগাম টেনে ধরে রেখেছে, পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা মনে রেখে আবেগ ও জৈবিক চাহিদাকে সামান্যতম প্রশ্রয় দিচ্ছে না।

পাহাড়ে পাহাড়ে একাকী গরু-ছাগল ও ভেড়া চরায় ইসহাক, শাসন করবার কেউ নেই, আপন খেয়ালে কোত্থেকে কোথায় চলে যায়। এরকম একদিন পরিত্যক্ত একটা খনির ভিতর ঢুকে

পড়েছিল সে। খনির ভেতর সরু খাল আছে, সেই খাল ঢুকেছে চওড়া গুহার ভিতর। গুহাটা আসলে টানেল। বেশ বড় একটা ভেলা বানিয়ে সেই আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের ভিতর দিয়ে তিন মাইল পর্যন্ত গেছে ইসহাক। খাল, অর্থাৎ জলমগ্ন টানেলটা সাগরে মিশেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে একটা জেটিও আছে।

রানার খুব কৌতূহল হওয়ায় টানেলটা সত্যি সাগরে মিশেছে কি না ওদেরকে দেখাতে নিয়ে গেল ইসহাক।

হাতে সময় থাকায় দাদুর সেফ হাউস থেকেও একবার ঘুরে এল ওরা। দাদু ভালই আছেন। আসার সময় মুহাদিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে এল রানা।

সন্ধ্যার খানিক আগে ফার্মহাউসে ফিরল ওরা। উপত্যকা থেকে নীচে নামার সময় টয়োটাকে দেখা গেল, গেট দিয়ে ফার্মহাউসের উঠানে ঢুকছে। কোতোওয়াল আর জামালুকে দেখতে পেল রানা। জামালু সোজা বাড়ির ভিতর ঢুকল, কোতোওয়াল ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

'সেই সকালে বেড়াতে বেরিয়ে এখন ফেরা হলো?' খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক সুরে জিজ্ঞেস করল কোতোওয়াল। প্রশ্নটা রানাকে করা হলেও, নির্লজ্জ ভঙ্গিতে শায়লার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

'কোনও সমস্যা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল কোতোওয়াল। টয়োটার পিছনের বনেট তুলে মোটা চটের কয়েকটা খালি বস্তা দেখাল। 'কিন্তু জেলিগনাইট পাওয়া যায়নি।'

'নার্ভ গ্যাস?'

মাথা নাড়ল কোতোওয়াল। 'এক লোক বলেছে একটা দিন

সময় দিলে চেষ্টা করে দেখবে যোগাড় করতে পারে কি না।'

'তার মানে কাল আবার যেতে চাও?' রানা গম্ভীর।

'উপায় কী?' ঠোঁটে অকারণ হাসি নিয়ে রানাকে দেখছে কোতোওয়াল। 'তবে যদি ওটা না হলে চলে তো আলাদা কথা।'

'ওটা দরকার,' বলল রানা।

'তা হলে তো কাল একবার যেতেই হয়,' হেসে উঠে ঘুরল কোতোওয়াল, বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

শুক্রবার সকালে অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোথায় কী আছে দেখতে চাইল রানা।

ওদেরকে নিয়ে গোলাঘরে ঢুকল মুক্তাদির আলাউয়ি। গোলাঘরটা বিরাট। মেঝেতে একটা ট্র্যাপ-ডোর আছে, সেটা খুলতে দেখা গেল ভিতরে কাঠের একটা লম্বা বাক্স রয়েছে। এত ভারী, ধরাধরি করে তুলতে কয়েকজনকে হাত লাগাতে হলো।

বাক্সটা থেকে বেরুল সাতটা একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল, পাঁচটা পিস্তল, দুই ডজন গ্রেনেড, স্মোক বম্ব ছয়টা। প্রতিটি রাইফেল ও পিস্তলের অ্যাকশন চেক করল রানা। প্রায়-নতুন অস্ত্র, তেল দিয়ে যত্ন করে রাখা হয়েছে।

কার কাছে কী অস্ত্র থাকবে, আগে থেকেই ওদেরকে জানিয়ে রাখল রানা। শায়লার কাছে কিছুই থাকবে না, কারণ ব্যবহার করতে জানে না সে। অস্ত্র দেওয়া হবে না মুক্তাদির আলাউয়িকেও, কারণ মদ্যপানজনিত কারণে যে লোকের হাত সারাক্ষণ কাঁপছে তার দ্বারা সেমসাইড হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

রানা, কোতোওয়াল, জামালু, রুস্তম, জিগলু আর মুহাদিয়া – এই ছয়জনের কাছে একটা করে অটোমেটিক রাইফেল থাকবে। পিস্তল থাকবে রুস্তম, জিগলু, মুহাদিয়া, রানা ও জামালুর কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল কোতোওয়াল। ‘কেন, আমি কী অপরাধ করলাম? আমার কাছে পিস্তল থাকবে না কেন?’

‘তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, ট্রেন চালাতে সাহায্য করবে আমাকে,’ বলল রানা। ‘আত্মরক্ষার জন্যে রাইফেলই যথেষ্ট। কিন্তু রুস্তম, জিগলু, মুহাদিয়া আর জামালুকে সৈনিক ও পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হতে পারে, কাজেই ওদের কাছে পিস্তল থাকাটাও জরুরি।’

‘তোমার যুক্তিতে মস্ত একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছি আমি,’ গম্ভীর সুরে বলল কোতোওয়াল। ‘যে লোক আমার সঙ্গে ট্রেন চালাবে তার পিস্তল দরকার হবে কেন? একই যাত্রায় দু’রকম ফল হবে কেন?’

নিঃশব্দে হাসল রানা। ‘তার কাছে পিস্তল থাকবে এই কারণে যে অপারেশনটায় সে-ই নেতৃত্ব দেবে।’

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কোতোওয়াল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। ‘বোঝা গেল কুদ্দুস কোতোওয়ালের দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে,’ আপনমনে বিড়বিড় করল সে।

রানার কাছে একটা পিস্তল আছে, তারপরও আরেকটা দরকার বলে মনে করছে ও।

পিস্তল কোতোওয়ালের কাছেও আছে, তবে সেটা রানাকে জানতে দিতে চায় না সে।

স্মোক বম্বগুলো থাকল রুস্তম আর জিগলুর কাছে। রানা বলল, ছয়জনের কাছে ছয়টা গ্রেনেড থাকবে, বাকিগুলো গোলাঘরে রেখে যাবে ওরা।

আজও সবাইকে নিষেধ করে দিল রানা, একান্ত প্রয়োজন না

হলে গুলি করার বা গ্রেনেড ফাটাবার দরকার নেই। কারণ গুলি ও গ্রেনেডের শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলের দিকে ছুটে আসবে ইজরায়েলি মিলিটারি ও আর্মড পুলিশ – আর্মার্ড কার নিয়ে সারাক্ষণ শহরের ভিতর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা।

বাধ্য না হলে কাউকে খুনও করা যাবে না।

জামালুকে নিয়ে আবার শহরে যাবে, দুপুরের দিকে লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে কোতোওয়াল। এই সময় ভিতরে ঢুকল রানা। জামালুর কাজ আছে এখানে, একথা বলে রুস্তম আর জিগলুর সঙ্গে কোতোওয়ালকে শহরে যাওয়ার পরামর্শ দিল ও। বগি আলাদা করবার যন্ত্রপাতি আনতে হবে, ওরা দুজনও শহরে যাচ্ছে।

চেহারা দেখে বোঝা গেল, রানার উপর ভীষণ খেপে উঠছে কোতোওয়াল, তবে কোনও প্রতিবাদ না করে টয়োটা নিয়ে চলে গেল সে। রানার নির্দেশ পেয়ে রুস্তম আর জিগলু আগেই গাড়িতে উঠে বসে ছিল।

'কী কাজ আমার?' টয়োটা গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যেতেই চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল গোফরান জামালু।

'কোনও কাজ নেই,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমি চাইছি না অ্যাকশন শুরু হবার মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা আগে দুজন জেল পলাতক কয়েদি শহরে ঘুর ঘুর করতে গিয়ে পুলিশের চোখে ধরা পড়ে যাক।'

'তুমি শালা দেখছি আচ্ছা লোক!' হিসহিস করে বলল জামালু। 'সত্যি কথাটা কোতোওয়ালকে বললে না কেন? ওকে ভয়

পাও বুঝি?’

অকস্মাৎ ঝাপসা মত কিছু একটা দেখা গেল, দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে অনুসরণ করতে পারল না রানা। পরমুহূর্তে পটকা ফাটার মত একটা আওয়াজ হলো। দেখা গেল ছিটকে লিভিংরুমের মেঝেতে পড়ে গেছে জামালুর প্রকাণ্ড শরীরটা, তার দিকে শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে মুহাদিয়া।

‘দাদু আমাকে বলে দিয়েছেন, এই ভদ্রলোক প্যালেস্টাইনের মস্ত বড় একজন বন্ধু,’ ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বলল সে। ‘তাঁকে সার বলতে হবে, আর খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন তাঁর অসম্মান না করে।’ ঝুঁকল সে, শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে খাড়া করল জামালুকে। দৈত্যটার মুখে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে। ‘আবার যদি সারকে গালি দাও, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলব। কী বললাম মাথায় ঢুকল?’

এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। হঠাৎ একটা ঘূর্ণিতে পরিণত হয়েছিল মুহাদিয়া। ওর মত জামালুও দেখতে পায়নি তাকে, ফলে বাধা দেওয়ার সুযোগও পায়নি। তাকে চড় মারার পর ঘূর্ণিটা স্থির হয়।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দুজনকে ছাড়িয়ে দিল রানা। আক্রোশে যেভাবে ফুঁসছিল জামালু, দুজনের একজন মারাত্মকভাবে আহত হতে পারত। এমনকী মারাও যেতে পারত।

পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় প্রশ্ন করল মুহাদিয়া, ‘আমি তা হলে রওনা দিই, সার?’

‘হ্যাঁ, এখন গেলে সন্ধের আগে ফিরতে পারবে,’ বলল রানা। ‘কী কী আনতে হবে মনে আছে তো?’

‘আছে, সা...’

'এই সারটা তোমাকে বাদ দিতে বলেছি, ভুলে গেছ? শাহরিয়ার ভাই বলবে।'

'জী, শাহরিয়ার ভাই।'

'বেশ কটা আইটেমই অবৈধ, কারও কাছে পাওয়া গেলে মিলিটারি-পুলিশ ইন্টারোগেশন সেলেই মেরে ফেলবে; কাজেই খুব বেশি ঝুঁকি নিতে নিষেধ করছি তোমাকে। পেলে ভাল, না পেলে সোজা ফিরে আসবে, যার তার কাছে যাবার দরকার নেই।'

'জী।'

'মরিস ভ্যানটা নিয়ে যাও।' ভ্যানের চাবিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

সন্ধের আগেই ফিরে এল ওরা তিনজন। রুস্তম আর জিগলু তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করতে পেরেছে। রানার নির্দেশে দুটো ফ্লেয়ারও যোগাড় করে এনেছে তারা। সংকেত দেওয়ার কাজে লাগবে ওগুলো।

কোতোওয়াল রিপোর্ট করল, গ্যাস বোমা পায়নি সে, তার বদলে নিয়ে এসেছে গ্যাস ভর্তি একটা ক্যান। ক্যানের গায়ে লেবেল ছিল, কিন্তু বিপদে পড়বার ভয়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, ফলে অ্যারোসল ক্যান-এর মত দেখতে কন্টেইনারে আসলে কী আছে ব্যবহার করার আগে বোঝার কোনও উপায় নেই।

'এরকম ক্যানে আজকাল টিয়ার গ্যাসও বিক্রি হচ্ছে,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল কোতোওয়াল। 'আমাকে বলা হয়েছে পিওর নার্ভ গ্যাস, সারিন। সেজন্যেই তো এত দাম।'

'কত?'

‘পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার,’ বলল কোতোওয়াল। ‘দাম বেশি চাইল বলেই তো মাত্র একটা ক্যান আনলাম।’

‘পেমেন্ট?’

‘লোকটা আমার দোস্ত, পরে দিলেও চলবে।’

মুহাদিয়ার ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। তবে প্রয়োজনীয় প্রতিটি আইটেমই আনতে পেরেছে সে। কী এনেছে তা অবশ্য কাউকে দেখানো হলো না।

শুক্রবার দুপুরে জেরুজালেম হয়ে রামাল্লা-য় পৌঁছালেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি। তাঁর জন্য টিকিট ব্যারিয়ারে অপেক্ষা করছিল সার্জেন্ট নেতানেয়াহু। স্টেশনের লাগোয়া একটা রেস্তোরাঁয় বসল দুজন।

পুলিশ সুপারকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। ‘মুস্তাফার কোনও খবর পাওয়া গেল?’

‘কাল আপনাকে তার ফটো পাঠাবার পর আরেকটা ঠিকানা পেয়েছি, হানা দিয়ে দেখতে হবে সেখানে মোস্তফা আছে কি না,’ বলল সার্জেন্ট। ‘জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়, সার।’

‘এই ঠিকানার কথা ভুলে যান, সার্জেন্ট,’ মৃদুকণ্ঠে বললেন খিলজি।

‘আপনি তাঁর খোঁজ পেয়েছেন, সার?’

‘সে একটা সবুজ স্যালুন ভাড়া করেছিল, সেটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় কায়সারিয়ার কাছে সৈকতে পাওয়া গেছে। ফটো দেখাতে গ্যারেজের মালিক চিনতে পেরেছে তাকে।’

‘কোথায় খান আল আসকার, কোথায় কায়সারিয়া! এর মানে কী, সার?’

'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও, আমাদেরকে মেনে নিতে হবে – আল শাহরিয়ার এলাকা ছেড়ে পালাতে পেরেছে। আজ চারদিন, সার্জেন্ট।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পুলিশ সুপার। 'উকিল টমসন সম্পর্কে কিছু জানা গেল?'

'তার ব্যাপারে খোঁজ নিতে ঘিশ্যামকে লাগিয়েছি,' বলল সার্জেন্ট। 'জানা গেছে, জেফার টমসনের আসল নাম মাইকেল হিউবার্ট। তবে আরও অনেক নাম আছে তার। অনৈতিক তৎপরতার কারণে বার কাউন্সিল তার প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স সারাজীবনের জন্যে বাতিল করে দিয়েছে। সেই থেকে বারবার নাম বদলে নানা অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে লোকটা।'

'দেখা যাক ঘিশ্যাম আর কী জানাতে পারে।'

এই সময় রেস্তোরাঁয় ঢুকে ওদের দিকে এগিয়ে এল ড্রাইভার। 'রেডিওতে মিস্টার তারিকি, সার। মোসাদ এজেন্ট।'

মাথা ঝাঁকালেন পুলিশ সুপার। 'আপনি গিয়ে শুনে আসুন, সার্জেন্ট। হয়তো ভাল কোনও খবর দেবেন ভদ্রলোক।'

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট। পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল সে। 'এটা, সার, কাকতালীয় হতেই পারে না! একা শুধু মোস্তফাকে নয়, উকিল টমসনকেও কায়সারিয়ার আশপাশে দেখা গেছে। মিস্টার তারিকির ধারণা, আল শাহরিয়ার ওরফে মাসুদ রানা এখনও ইজরায়েলেই লুকিয়ে আছে, তাকে ঘিরেই চলছে এই সব পাতি ক্রিমিনালদের অশুভ তৎপরতা।'

'সেইরকমই মনে হচ্ছে বটে,' বললেন পুলিশ সুপার। 'তবে মাসুদ রানা সম্পর্কে আমি যে ধারণা পেয়েছি তাতে ব্যাপারটা কিন্তু মেলে না। এরকম আজেবাজে লোকের সঙ্গে চলাফেরা করার লোক সে নয়।'

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী, সার?'

'সোজা হেডকোয়ার্টারে চলুন,' বললেন সুপার। 'কায়সারিয়ার ওদিকটায় তদন্ত চালাতে হলে লিখিত অনুমতির দরকার হবে।'

'চেষ্টা করলে আজ রাত দশটার মধ্যে আমরা কায়সারিয়ায় পৌঁছাতে পারব, সার।'

'চলুন, আগে শুনি, হেডকোয়ার্টার কী বলে।'

প্রথমেই নজর কাড়বে প্রজাপতি আকৃতির গোঁফ জোড়া। ছোটখাট একজন লোক, চোখে-মুখে ধূর্ত ভাব। তবে অস্পষ্ট ডোরাকাটা কাপড়ের সুটটা ভালভাবে ছাঁটা। মাথায় বোলার হ্যাট পরেছে। উকিল টমসন নাম বদল না করা পর্যন্ত নিজের চেহারা বা বেশভূষা বদল করে না।

সেদোত ইয়াম থেকে হেফজি বাহ্-এর দিকে যাওয়ার তিনটে উপায় আছে – সৈকতের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, আর উপত্যকার নীচের ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে। এই এবড়োখেবড়ো, আঁকাবাঁকা রাস্তার প্রায় শেষ মাথায়, ঘন ঝোপের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

গ্যারেজ থেকে ভাড়া করা তার ছোটখাট গাড়িটা পিছনের ফাঁকা জায়গায় পার্ক করে রেখেছে টমসন। এই মুহূর্তে এখানে তার উপস্থিতি স্রেফ একটা কাকতালীয় ব্যাপার।

আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, পাহাড় টপকে কোতোওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে গেছে আল মোস্তফা, সেদোত ইয়াম ও হেফজি বাহ্-এর মাঝের রাস্তায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল টমসন। এই সময় হঠাৎ রানা আর শায়লাকে দেখতে পেয়েছে সে, টয়োটা চেপে হেফজি বাহ্-র দিকে যাচ্ছিল। তার

কাছে খবর আছে, এদিকেই কোথাও আত্মগোপন করে আছেন দাদু। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। সে ধরে নিল আল শাহরিয়ার নিশ্চয়ই দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

দেরি না করে টয়োটার পিছু নিল টমসন। তবে রাস্তাটা নির্জন হওয়ায় সারাক্ষণ অনেক দূরে থাকল সে। পথটা আঁকাবাঁকা হওয়ায় চুপিসারে অনুসরণ করতে তার কোনও সমস্যা হলো না।

রানার ধারণা ছিল না কেউ ওদের পিছু নিতে পারে। ট্রেন হাইজ্যাকিং-এ হাত দেওয়ার আগে শেষ একবার দাদুর সঙ্গে দেখা করবার সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করে নেয় ও। ট্রেনে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশজন সশস্ত্র লোক থাকবে, তার তুলনায় নিজেরা মাত্র সাতজন খুব কম হয়ে যায়। সাতজনের মধ্যে আবার তিনজনকে বিশ্বাস করা যাবে না। সমস্যাটা নিয়ে দাদুর সঙ্গে কথা বলতে চায় ও।

রানার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল শায়লার সঙ্গ পাওয়া। তবে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুল করেনি ও। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কাভারড্ ভ্যান, মরিস ভ্যান ও ক্যাটল ট্রাকের চাবি নিজের সঙ্গে রেখেছে, তা সত্ত্বেও সারাক্ষণ একটা চোখ রেখেছে ভিউ মিররে। কিন্তু টমসন অতিরিক্ত সর্তক থাকায় তার গাড়িটাকে দেখতে পায়নি ও।

যতই সতর্ক হোক, খুনোখুনি-মারামারি একেবারেই পছন্দ করে না উকিল টমসন। সেজন্য গা বাঁচিয়ে চলার নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয় তাকে। রানার টয়োটাকে গেট দিয়ে একটা ফার্মহাউসে ঢুকতে দেখে রাস্তা ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়কে পাশ কাটাল সে, গাড়িটা আড়ালে রেখে ফিরে এল ফার্মহাউসের কাছাকাছি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, মাত্র আধ ঘণ্টা পর শায়লাকে নিয়ে দাদুর সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে এল রানার

টয়োটা। ইঞ্জিনের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মহাউসে ঢুকে পড়ল সে।

গেট ও দালানের দরজা খোলাই পেল টমসন। প্যাসেজ হয়ে লিভিংরুমের দিকে যাচ্ছে। কামরাটার দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ফাঁকটায় একটা চোখ রেখে ভিতরে তাকাল সে।

একটা আরামকেদারায় বসে পাইপ টানছেন খাদেমুল দাউদ। ধোঁয়া ছাড়ার সময় খক খক করে কাশলেন কিছুক্ষণ। কবাট ঠেলে কামরার ভিতর ঢুকল উকিল।

এমনভাবে চমকে উঠলেন দাদু, যেন ভূত দেখছেন। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল তাঁর চোখ দুটো। কর্কশ গলায় বললেন, 'তুমি শয়তান এখানে কী করছ?'

'ভাবলাম আপনার সঙ্গে আলাপটা সেরেই ফেলি, দাদু।' এগিয়ে এসে হ্যাট থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়ল সে, তারপর যত্ন করে টেবিলের উপর রাখল।

'কীসের আলাপ?' ধমকে উঠলেন দাদু। 'কাজের বিনিময়ে টাকা দেয়া হয়েছে তোমাকে, ব্যস, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, আবার কীসের আলাপ?'

'তেল আবিব ও জেরুজালেমে আমার অনেক বন্ধু আছে, দাদু।' একটা চেয়ার টেনে বসল টমসন। 'তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।' হাসল সে। 'পিএলও-র নেতারা বলছেন, মিস্টার ইয়াসির আরাফাত মারা যাবার পর থেকে পার্টিতে আপনার কোনও ভূমিকা নেই। অনেক ব্যাপারেই আপনি সত্যি কথা বলছেন না, মিস্টার দাউদ। ভাবছি আল শাহরিয়ার এসব জানতে পারলে কী বলবে।'

বারো

এসে গেল টান টান উত্তেজনায় ভরা সেই দিনটা। রোববার।

বির এস্ সিক্কার মাইল দুয়েক আগে শুরু হলো ওদের অপেক্ষার পালা। সকাল আটটা থেকে কয়েক দলে ভাগ হয়ে মুক্তাদির আলাউয়ির ফার্মহাউস থেকে রওনা হয়ে পাহাড়ী ঢালে, বোল্ডারের আড়ালে, বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে জড়ো হয়েছে ওরা আটজন। ওদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নীচ দিয়ে চলে গেছে রেললাইনটা।

এই মুহূর্তে রানার দেখিয়ে দেওয়া পজিশনে, লাইনের দু'ধারে, ঢালের গায়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে সবাই – কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। এক দল আরেক দলকে দেখতে না পেলেও, নিজেদের পজিশন থেকে রেললাইনের বাঁকটা তারা সবাই দেখতে পাচ্ছে। কমবেশি সিকি মাইল দূরে ওটা। এখন তারা পজিশন ছেড়ে কিছুটা নেমে এলেও, কোনও ট্রেন আসতে দেখলে আরও উপরদিকে উঠে যাবে সবাই, আড়াল নেবে বড় আকারের বোল্ডারের পিছনে – খুব কঠিনভাবে এই নির্দেশটা মেনে চলতে বলে দিয়েছে রানা।

ইতিমধ্যে দুটো ট্রেন পাশ কাটিয়েছে ওদেরকে। দুটোই প্যাসেঞ্জার ট্রেন – একটা গেছে তালমি এল' আযার-এর দিকে, আরেকটা বির এস্ সিক্কার দিকে। সবাই খুব সাবধানে ছিল, ট্রেন দুটো থেকে কেউ যাতে ওদেরকে দেখতে না পায়। কাল রাতেই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রানার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত আড়াল থেকে কেউ বেরুবে না।

অপেক্ষার পালা প্রায় শেষ। ঘড়িতে এখন দুটো বাজতে মাত্র সাত মিনিট বাকি। শেডিউল ঠিক থাকলে বেলা ঠিক দুটোর সময় বির এস সিক্কা স্টেশনে পৌঁছবার কথা ব্যাঙ্কার'স ট্রেনের। অর্থাৎ আর মাত্র চার-পাচ মিনিট বাকি আছে, তারপরেই বাঁক ঘুরতে দেখা যাবে ওটাকে।

রানা অবশ্য কাল রাতেও ওদেরকে শেষবারের মত ব্রিফ করবার সময় সাবধান করে দিয়েছে, যে-কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সবাইকে।

ব্যাঙ্কার'স ট্রেন হয়তো আধ ঘণ্টা লেট করবে আজ। কিংবা শেষ মুহূর্তে শেডিউল বাতিল করা হলো, হয়তো আজ ট্রেনটা আসবেই না; গত তিন বছরে এরকম দু'বার ঘটেছে। হামাস-এর বেপরোয়া জঙ্গিরা রেললাইন কোথাও উপড়ে ফেলতে পারে। লাইনের কোথাও মানুষ কাটা পড়লে অস্বাভাবিক দেরি হতে পারে।

এ-সব কিছুই ঘটল না। ওদের বুকের রক্ত ছলকে দিয়ে হঠাৎ যান্ত্রিক গর্জন শোনা গেল। দুটো বাজার ঠিক তিন মিনিট আগে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো হেলিকপ্টার গানশিপ। তবে আশপাশে থামল না, বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল দূরে।

ঠিক দুটোর সময় শোনা গেল লাইন ধরে চাকা ছুটে আসার

পরিচিত ও প্রত্যাশিত অতিব্যস্ত ঝিক-ঝিক-ঝিক-ঝিক শব্দ। ইঞ্জিন গর্জাচ্ছে, একটু পরেই বাঁক নিতে দেখা গেল ট্রেনটাকে।

তবে আটটা নয়, ছয়টা বগি। আশ্চর্য অলসগতিতে এগিয়ে আসছে। চোখে বিনকিউলার সেঁটে তাকিয়ে আছে রানা, একবার দৃষ্টি বুলিয়েই বুঝতে পারল মেইল নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন ওটা।

ট্রেন যত কাছে আসছে ততই ওদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হার্টবিট। কারণ ওটা সাধারণ কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেন নয়। ছয়টা বগিতে গিজগিজ করছে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সৈনিক।

সময় থাকতে পাহাড়ী ঢালের আরও উপর দিকে উঠে এল ওরা। অস্ত্র, গ্রেনেড ও স্মোক বম্ব নিয়ে তৈরি হয়ে থাকল। ট্রেন ভর্তি দক্ষ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে পারবে না ওরা, আক্রান্ত হলে দৌড়ে পালাতে হবে; তবে পালাবার আগে গ্রেনেড চার্জ ও গুলি করে যতটা সম্ভব দুর্বল করে নিতে হবে প্রতিপক্ষকে, তা না হলে ধাওয়া করে ধরে ফেলবে।

ট্রেনটা পাশ কাটাচ্ছে ওদেরকে, রানা শুনতে পেল পাশে দাঁড়ানো কোতোওয়াল ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। ওর মনে প্রশ্ন জাগল, প্রথমে হেলিকপ্টার গানশিপ, এখন আবার সৈন্য ভর্তি ট্রেন, ব্যাপারটা কী? পুরস্কারের লোভে মিলিটারি পুলিশকে সব জানিয়ে দেয়নি তো লোকটা?

সৈন্য বোঝাই ট্রেন চলে যাওয়ার পর আবার নীরব হয়ে গেল পরিবেশটা। বারবার হাতঘড়ি দেখছে কোতোওয়াল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।

সময় যেন সলতেতে আগুন দেওয়া ডিনামাইট। কী এক আশঙ্কায় এখন শুধু উত্তর নয়, লাইনের দক্ষিণ দিকেও একটা চোখ রেখেছে ওরা। কে জানে, সৈন্যদের নিয়ে ট্রেনটা যদি ফিরে আসে!

দুটো দশ। সোয়া দুটো। দুটো বিশ। দুটো পঁচিশ। তারপর ঠিক দুটো ত্রিশে আবার শোনা গেল – ঝিক-ঝিক-ঝিক-ঝিক! গাঁক! গাঁক!

বোল্ডার ও কাঁটাঝোপের পিছন থেকে ওরা দেখল এতক্ষণে ব্যাঙ্কার'স ট্রেন আসছে। না, এবার কোনও সন্দেহ নেই। ওই তো আটটা বগি নিয়ে বাঁক ঘুরছে... কিন্তু একি!

ব্যাঙ্কার'স ট্রেনকে টেনে নিয়ে আসছে একটা নয়, দুটো লোকোমোটিভ ডিজেল ইঞ্জিন – একটা সামনে, আরেকটা পিছনে।

'আল্লাই জানে কোন্ শালার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ!' কার উদ্দেশে যেন খেঁকিয়ে উঠল কোতোওয়াল। 'কাজে হাত দেয়ার পর একের পর এক শুধু বিপদের আলামত দেখতে পাচ্ছি।'

'চুপ থাকো, চিন্তা করতে দাও আমাকে,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা, তাকিয়ে আছে উত্তরে নয়, দক্ষিণে – ওদিকের আঁকাবাঁকা ও ঢালু পাহাড়ী পথ থেকে বেরিয়ে এসেছে লাঠি হাতে কুঁজো এক বুড়ি, বয়সের ভারে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে তার।

বুড়ি একা নয়। তার সামনে-পিছনে রয়েছে ছানা-পোনা সহ দশ-বারোটা ছাগল ও ভেড়া। কয়েকটা ছাগলের গলায় রশি বাঁধা, রশির প্রান্তগুলো বুড়ির অপর হাতে ধরা। ওগুলোকে নিয়ে রেললাইনে নেমে এল সে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবারও তাকাল না, যেন ট্রেনটা সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। বুড়ি হয়তো কানে কম শোনে!

মনে মনে শায়লার প্রশংসা করল রানা, তার টাইমিংটা পারফেক্ট হয়েছে। ছদ্মবেশ ও অভিনয়ও খুবই ভাল।

শায়লাকে রানার বলা আছে, যদি দেখে যে ট্রেন থামছে না,

তা হলে হোঁচট খাওয়ার ভান করে লাইনের বাইরে পড়ে যেতে হবে, তবে সম্ভব হলে তারপরও যেন ছানাগুলোকে লাইনের উপর ধরে রাখতে চেষ্টা করে সে।

'গাঁক! গাঁক!'

অধৈর্য ধমক, হর্ন দিচ্ছে ব্যাঙ্কার'স ট্রেন। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে না শায়লা। ছাগল, ভেড়া ও ছানাগুলো অস্থির হয়ে উঠলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

আবার হুইসেল বাজাল ট্রেনের ড্রাইভার। তবে এবার ব্রেক করছে সে। ট্রেনের স্পিড ধীরে ধীরে কমছে।

আগেই খেয়াল করেছে রানা, সামনের বগিটার দরজা তো বটেই, সবগুলো জানালাও বন্ধ। এতক্ষণ ওটার ভিতরে আলো জ্বলছিল, হঠাৎ কালো হয়ে গেল কাঁচ লাগানো জানালাগুলো। তার মানে ভিতরে লোক আছে।

ভিতরে ওরা কি তা হলে হীরা ভর্তি ব্রিফকেস পাহারা দিচ্ছে?

'আগের প্ল্যানে কাজ হবে?' জানতে চাইল কোতোওয়াল। 'আমরা রওনা হবার পর দ্বিতীয় ইঞ্জিন নিয়ে ধাওয়া করবে না ওরা?'

রানা কিছু বলছে না, যেন তার কথা শুনতে পায়নি। হঠাৎ করে চাকার সঙ্গে লাইনের ঘর্ষণের শব্দ এত বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যে রি-রি করে উঠল গা। খুব জোরে ব্রেক করে ট্রেনটাকে দ্রুত থামাতে চাইছে ড্রাইভার। কেন?

'গাঁক! গাঁক! গাঁক! গাঁক!'

'ইয়া আল্লাহ্!' আঁতকে উঠল কোতোওয়াল। তার বিস্ফারিত চোখ দুটো প্রায় দাঁড়িয়ে পড়া ট্রেনের ছাদের দিকে স্থির হয়ে আছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, 'তুমি ওদেরকে

বেরিয়ে আসার সংকেত দিচ্ছ না কেন?'

দরদর করে ঘামছে রানা। বোল্ডার ও কাঁটাঝোপের পিছন থেকে সে-ও দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা। ট্রেনের দ্বিতীয় বগির জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে পাঁচ-সাতটা রাইফেলের নল। নিশ্চয় উল্টোদিক থেকেও এই একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ, সৈন্য ও সিভিল ড্রেস পরা ব্যাঙ্ক গার্ডরা ত্রিশ-চল্লিশ ফুট দূরের পাহাড়ী ঢালে ছড়িয়ে থাকা বোল্ডারগুলোর চারপাশে চোখ বুলিয়ে টার্গেট খুঁজছে। আরেক দল জানালায় পা দিয়ে উঠে যাচ্ছে ছাদে।

যে-কোনও কারণেই হোক, লাইনের উপর শায়লা ও ছাগল-ভেড়ার উপস্থিতি তাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। সন্দেহ হওয়ার আরেকটা কারণ, ঠিক যেখানে সমান্তরাল আরেকটা লাইন রয়েছে সেখানেই থামানো হচ্ছে ট্রেনটাকে। তারা ধরে নিয়েছে নিশ্চয়ই এখানে অ্যামবুশ পাতা হয়েছে।

এক কী দুই সেকেন্ড পর শুরু হলো রক্তারক্তি কাণ্ডটা।

ডিজেল ইঞ্জিনটা ঢাকা নয়, ওটার ছাদ বলে কিছু নেই, সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ডরা প্রথম বগির ছাদে চলে এসে ইঞ্জিনের উপর দিয়ে সামনের লাইন দেখছে। বেশ অনেকটা দূরে দেখতে পাচ্ছে শায়লাকেও।

গাঁক! গাঁক! আবার সতর্ক করা হলো বুড়িকে।

বজ্রপাতের মত আওয়াজ করল ইজরায়েলি সৈন্যদের উজি সাব মেশিনগান, প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল পুলিশ ও ব্যাঙ্ক গার্ডদের অটোমেটিক রাইফেল।

হোঁচট খেল শায়লা, ছিটকে পড়ে গেল দুই হাত দূরে। তবে পুরোপুরি লাইনের বাইরে পড়েনি সে – অর্ধেকটা এখনও লাইনের

উপর রয়ে গেছে। ছাগল ও ভেড়াগুলো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। এক সেকেন্ড পর একপশলা বুলেট ছিন্নভিন্ন করল ওগুলোকে। ধপ্ ধপ্ করে লাশগুলো পড়ল শায়লার নিঃসাড় শরীরের উপর। লাল রক্তের ধারা বইছে লাশগুলোর চারপাশে।

শায়লার রক্তাক্ত দেহ থেকে ষাট কী সত্তর ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। দু'পশলা গুলিবর্ষণের পর নীরবতা নেমে এল। হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র, ট্রেনের ছাদ ও বগির জানালা দিয়ে দু'পাশের পাহাড়ী ঢালে চোখ বুলাচ্ছে বাইশজন প্রহরী।

স্থির হয়ে আছে পাহাড়ী ঢাল। বোল্ডারগুলোকে ঘিরে থাকা কাঁটাঝোপগুলোর একটা পাতাও নড়ছে না। কাউকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ইজরায়েলিরা।

এক মিনিট কাটল। তারপর দু'মিনিট। একে একে আরও তিন মিনিট। সৈন্যরা ভাবছে, তাদের সন্দেহটা তা হলে মিথ্যে ছিল। এখানে কোনও অ্যামবুশ পাতা হয়নি। গুলি করে মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে তারা।

পরপর চার বার হর্ন বাজল।

এটা বোধহয় এক ধরনের সংকেত। এমন হতে পারে সৈন্যদের কমান্ডিং অফিসার ইঞ্জিনরুমে আছে, তার নির্দেশে হুইসেল বাজিয়ে সংকেত দিচ্ছে ড্রাইভার। কারণ, দেখা গেল হুইসেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ট্রেন থেকে নীচে লাফ দিচ্ছে সৈন্যরা, তাদের দেখাদেখি পুলিশ আর ব্যাঙ্ক গার্ডরাও।

'কেমন বোকার মত নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে,' বিড়বিড় করল কোতোওয়াল, কাঁটাঝোপের সরু ফাঁক দিয়ে প্রহরীদের দেখছে সে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল একবার। ভাবল, শালার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!

সম্পূর্ণ শান্ত রানা, স্থির, নিষ্কম্প। ও যেন জানত ট্রেন থেকে নীচে নেমে আসবে প্রহরীরা।

রানার হিসাবে এখনও সংকেত দেওয়ার সময় হয়নি। মাত্র আট-দশজন প্রহরী নীচে নেমে ইঞ্জিনকে পাশ কাটিয়ে শায়লার দিকে এগোচ্ছে, বাকিরা এখনও দ্বিতীয় বগির জানালা আর দরজার সামনে ইতস্তত করছে।

এই সময় হঠাৎ শায়লাকে নড়ে উঠতে দেখা গেল। চমকে উঠল রানা। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে হাতের ফ্লেয়ারটায় আগুন ধরাল ও।

দুপুরের রোদ ঝলমলে আকাশে সাদা ধোঁয়ার চওড়া ফিতে তৈরি করে উপরে উঠে গেল ফ্লেয়ার। তুঙ্গে উঠে বিস্ফোরিত হলো, পটকা ফাটার মত শব্দ হলো কয়েকটা।

সেই সঙ্গে কাঠফাটা দুপুরে রেললাইনের ধারটা কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠল।

রানার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাইছে শায়লা। কিন্তু হঠাৎ সজোরে ব্রেক করে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ায় সব গুলিয়ে ফেলেছে সে।

রানা বলেছিল ট্রেন না থামলে হোঁচট খেয়ে লাইনের বাইরে পড়তে হবে তাকে, আর ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়লে শান্তভাবে হেঁটে লাইন ছেড়ে পাহাড়ী পথ ধরে আড়ালে চলে যাবে। যখন যেটা করা দরকার তার ঠিক উল্টোটা করতে যাচ্ছে সে।

হোঁচট খাবে, এই সময় শুরু হলো গুলিবর্ষণ। একটা বুলেট তার হাতের লাঠিতে লাগায় মাঝখান থেকে ভেঙে গেল সেটা। বাতাসে ফুলে ওঠা ছেঁড়া ও নোংরা স্কার্টেও লাগল কয়েকটা

বুলেট। ঝাঁকি খেল শায়লা, ছিটকে পড়ে গেল লাইনের উপর।

পড়ার পর শায়লা ভাবল, গুলি তো লেগেইছে, প্রশ্ন হলো আমি বাঁচব নাকি মারা যাব? তারপর নিজেকে অভয় দিতে চেষ্টা করল, গুলি বোধহয় লাগেনি। কিন্তু তা হলে নিতম্বে তীক্ষ্ণ কিছু বেঁধার মত অনুভূতি হচ্ছে কেন? কেন ডান হাঁটুটা ভাঁজ করতে পারছে না? এত গরম রক্ত বইছে কেন ওর চারপাশে?

তারপর ভাবল, এমন কি হতে পারে এসব আসলে ছাগল-ভেড়াগুলোর রক্ত? বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে বেশ কয়েকটাই তো ওর গায়ে পড়ে আছে।

দু'এক পশলা গুলি হওয়ার পর থেমে গেছে। তারপর বেশ কয়েক মিনিট নীরব হয়ে থাকল পরিবেশটা। এই সময়টায় নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে শায়লা, তাকে সত্যিই কোনও গুলি লাগেনি। মনটাকে শক্ত করল সে। দৃপ্ত শপথের মত মনে মনে উচ্চারণ করল, যেভাবেই হোক বাঁচতে হবে তাকে, বাঁচতে হবে নিজের জন্য, বাঁচতে হবে ইসহাককে এই নরক থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর, মুহূর্তের জন্য এ-ও ভাবল সে – মাসুদ রানার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রোমান্টিক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর দুনিয়াটাকে হঠাৎ করে তার খুব লোভনীয় লাগতে শুরু করেছে।

ঠিক এই সময় পাথুরে জমিনে বুটজুতোর শব্দ পেল শায়লা। ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। ভাবল, সর্বনাশ, সৈনিকরা তাকে ধরতে আসছে। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল শায়লা। প্রচণ্ড বেগে গা ঝাড়া দিল সে, পশুগুলোর লাশ সরিয়ে লাফ দিয়ে সিধে হলো, তারপর এদিক ওদিক না তাকিয়ে নাক বরাবর লাইন ধরে ছুটল। জানে এভাবে একশো গজ ছোটার পর ডান দিকে ঘুরে যেতে হবে

তাকে, তারপর কিছুদূর গেলেই মুক্তাদির চাচাকে পাবে সে, ক্যাটল ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

এক মুহূর্ত পর গুলির শব্দ ঢুকল কানে, একসঙ্গে গর্জে উঠেছে কয়েকটা রাইফেল। মনে আরও একটু জোর পেল সে। এতক্ষণে বোধহয় ওদের দলের লোকেরা হামলা শুরু করেছে। ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল শায়লা। সবার জন্যই প্রার্থনা করছে সে, তবে চোখের সামনে ভেসে আছে মাত্র একজনের ছবি – মাসুদ রানা!

প্রথমে ফ্লেয়ার, তারপর গুলি, ট্রেনের সামনে চলে আসা সৈন্যরা শায়লার কথা ভুলে ঘুরে দাঁড়াল, কোণঠাসা ইঁদুরের মত আড়াল খুঁজছে। কিন্তু নীচে নেমে ট্রেনের সামনে চলে আসায় কোথায় লুকাবে তারা এখন? রানার প্ল্যান-এর এটা একটা বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে, লাইনের দু'ধারেই অনেকটা দূর পর্যন্ত পজিশন নিয়ে আছে ওর লোকজন। ইজরায়েলি সৈন্য আর ব্যাঙ্ক গার্ডদের স্রেফ কচুকাটা করছে তারা – মুহাদিয়া আর রুস্তম।

ডালে বসা পাখির মত সহজ শিকার ছাদের লোকগুলোও। জামালু আর জিগলুর রাইফেল তাদেরকে ঝাঁঝরা করে দিল।

অ্যাকশনে যোগ দিয়েছে কোতোওয়ালও, তবে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। দ্বিতীয় বগিতে এখনও কিছু প্রহরী রয়েছে, তাদেরকে লক্ষ্য করে রাইফেল চালাল সে। তার বুলেট কাউকে লাগল কি না বোঝা গেল না, তার আগেই কালো একটা বল ঢুকে পড়ল বগিতে। এক মুহূর্ত পর বিস্ফোরিত হলো বগিটা।

ওটা ছিল একটা গ্রেনেড, ছুঁড়েছে জামালু। চোখের পলক ফেলতে যা দেরি, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল প্রহরীদের বগিতে। সেখানে কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ চারপাশে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল কোতোওয়াল। আশপাশে রানাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না সে। এই সময় হঠাৎ গাঢ় সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল সামনের ইঞ্জিনটা। চোখের কোণে ধরা পড়ায় সেদিকে ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল সেই ঘন ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল, ইঙ্গিতে তাগাদা দিল পিছু নেওয়ার।

রানা যতটা তৎপর, তারচেয়ে মোটেও কম তৎপর নয় জিগলু আর রুস্তম।

স্মোকস্ক্রিন তৈরি করে এত দ্রুত ইঞ্জিনরুমে উঠে পড়ল রানা, দুই সঙ্গীকে নিয়ে তখনও পুরোপুরি পালিয়ে যেতে পারেনি ড্রাইভার। ইচ্ছে করলে তিনজনকেই গুলি করে ফেলে দিতে পারত ও, দিতও, কিন্তু দেখল শায়লা আর তার চাচা মুক্তাদির যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে যাচ্ছে তারা – কাজেই মারার কোনও প্রয়োজন নেই।

কেউ কিছু বলেনি, দ্বিতীয় ইঞ্জিনটা দেখবার পর থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠেছে জিগলু আর রুস্তম। গোলাগুলির পালা শেষ হওয়া মাত্র তারা দুজন দু'দিক থেকে গার্ড রুম ও পিছনের ইঞ্জিনটার দিকে ছুটল। গার্ড রুম ও ইঞ্জিনের কাছাকাছি এসে এক হলো তারা। রানার মত তারাও দেখল, পরিস্থিতি বিপজ্জনক বুঝতে পেরে গার্ড ও ড্রাইভার যে যার জায়গা ছেড়ে পালাচ্ছে। কালবিলম্ব না করে ট্রেনের মাথায় চড়ল তারা, সামনের দিকে ছুটছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বগির মাঝখানে ঝুপ করে নামল তারা, কাপলিং-এ দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বের করে

কাপলিং বিচ্ছিন্ন করতে এক মিনিটও লাগল না তাদের। কাজটা শেষ হতেই পকেট থেকে হুইসেল বের করে লম্বা ফুঁ দিল রুস্তম।

এই সংকেতের জন্যই অপেক্ষা করছিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল ও। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনের কন্ট্রোল প্যানেল-এ চোখ বুলিয়ে কোথায় কী আছে দেখে নিয়েছে ও। পুরানো মডেলের ইঞ্জিন, লিভার ও ব্রেক অপারেট করতে জানলে যে-কেউ চালাতে পারবে।

মাত্র একটা বগি নিয়ে বির এস্ সিক্কার দিকে এগোল ব্যাঙ্কার'স ট্রেন। তবে মাত্র দুশো গজ। তারপর থামল ট্রেন, পিছু হটে শাখা লাইনে চলে এল। সমান্তরাল লাইন ধরে ট্রেনের বড় ও বিধ্বস্ত অংশটাকে পাশ কাটাল রানা।

পিছনদিকে ছুটছে ইঞ্জিন। তালমি এল' আযর-এর দিকে যাচ্ছে ওরা। স্পিড ক্রমশ বাড়াচ্ছে রানা।

মুহাদিয়ার কাছ থেকে পাওয়া হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ও। দুটো বেচে ঊনচল্লিশ মিনিট।

ট্রেন হাইজ্যাক করতে মাত্র নয় মিনিট লেগেছে ওদের।

তবে এখনও অনেক বিপদ ওত পেতে আছে সামনে। সন্দেহ নেই ড্রাইভার ও গার্ড জায়গামত পৌঁছে দিয়েছে ট্রেন হাইজ্যাকিং-এর খবর।

এটা ইজরায়েল; যেখানে থেকে একটা সুঁই পর্যন্ত সরাবার উপায় নেই, সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ নগদ মার্কিন ডলার ও অমূল্য হীরা নিয়ে পালাতে চাইছে ওরা।

কেউ বলতে পারে না কী আছে কপালে!

তেরো

গাঁক! গাঁক!

ভেঁপু বাজিয়ে ছুটছে ট্রেন। হাতঘড়ির উপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা। একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। ভাবছে, মুহাদিয়া এখনও রিপোর্ট করছে না কেন?

ইঞ্জিনের পিছনে একটাই বগি, সেটার ছাদে শুয়ে কিনারা থেকে ঝুঁকে জানালার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে মুহাদিয়া। পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় পিছন থেকে তাকে ধরে রেখেছে রুস্তম। জামালু আর জিগলু ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, নজর রাখছে চারদিকে।

'ঠিক আছে, নাগাল পেয়েছি, হাতুড়িটা দাও এবার,' বলল মুহাদিয়া। তার হাতে লম্বা হাতলওয়ালা একটা হাতুড়ি ধরিয়ে দিল রুস্তম। সেটা দিয়ে দুই কি তিনটে বাড়ি মারতেই জানালা কাঁচ ঝনঝন আওয়াজ করে ভেঙে গেল।

পরক্ষণে পিস্তল থেকে ঠাস ঠাস গুলি বেরুবার শব্দ হলো কয়েকটা।

'ওরে বাপরে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে জাতসাপ ফণা তুলে

আছে!' ঝট্ করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে হেসে উঠল মুহাদিয়া। 'দাও, ক্যানটা দাও।'

নার্ভ গ্যাস ভর্তি ক্যানটা তার হাতে গুঁজে দিল রুস্তম। এ-ধরনের ক্যান খোলার আগে গ্যাস-মাস্ক পরার নিয়ম থাকলেও, তা যোগাড় করতে পারেনি কোতোওয়াল। ক্যানের মাথায় দুটো বোতাম আছে, লাল ও সবুজ রঙের। সবুজটায় চাপ দিয়ে ঠেলতে হবে, ঠেলে ঠেকাতে হবে লাল বোতামটার গায়ে। পাঁচ সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হবে ক্যানের মাথা। বদ্ধ জায়গার ভিতর মারাত্মক গ্যাসটা ছড়াতে দশ থেকে পনের সেকেন্ড সময় লাগবে। কোনও রঙ নেই, অর্থাৎ অদৃশ্য গ্যাস এটা, কারও শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢোকা মাত্র জ্ঞান হারাবে সে। বাতাসের সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যেতে সময় নেবে তিন মিনিট। এ-সব তথ্য কোতোওয়ালের কাছ থেকে জানা গেছে। কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কাঁচ ভাঙা জানালার ভিতরে ক্যানটা ঢোকাবার সময় আরও একবার গুলি হলো। তবে ক্যানটা ভিতরে ছুঁড়ে দিয়েই মাথা ও কাঁধ ছাদের কিনারা থেকে উপরে তুলে নিয়েছে মুহাদিয়া, ফলে কোনও বিপদ হলো না।

ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে তিন মিনিটের জায়গায় পুরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। তারপর চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে আবার নীচের দিকে ঝুঁকল মুহাদিয়া, তাকে ধরে রাখল রুস্তম ও জিগলু। একটু ঝুঁকি নিতে হলো মুহাদিয়াকে, ভাঙা জানালার সামনে একটা হাত নামাল সে।

কেউ গুলি করছে না।

আরও পনের মিনিট পর চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনরুমে ঢুকে

রানাকে রিপোর্ট করল মুহাদিয়া, সঙ্গে এসেছে জামালু – চোরের মত একাধারে সতর্ক ও চঞ্চল লাগছে তাকে। 'ব্যাঙ্কার'স বগিতে দুটো ব্রিফকেস পাওয়া গেছে। ওগুলো দুজন সিকিউরিটি গার্ডের কবজির সঙ্গে চেইন দিয়ে আটকানো ছিল। হাত না কেটে চেইন কেটেছি আমরা।'

'ভাল করেছ,' বলল রানা।

'ডলার ভর্তি মস্ত ব্যাগ আছে দুটো,' বলল মুহাদিয়া। 'একেকটার ওজন দুই মণের কম নয়। ব্যাগ থেকে বের করে ডলারের ব্যান্ডিলগুলো বস্তায় ভরা হয়েছে।'

'একটা বান্ডিল খুলে দেখতে চাইলাম,' অভিযোগের সুরে বলল জামালু, কোনও কারণ ছাড়াই চড়া গলায় কথা বলছে। 'কিন্তু আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল ওরা!'

'আমার সঙ্গে চলো, দেখি কে বাধা দেয়,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল কোতোওয়াল। 'জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে এত বড় একটা কাজ করলাম, এ কেমন কথা যে খুলে দেখতে পারব না ভেতরে কী আছে?'

যেন তার কথা শুনতে পায়নি, এমন সুরে রানাকে আবার রিপোর্ট দিতে শুরু করল মুহাদিয়া, 'চাবি না থাকায় ব্রিফকেস কাটতে হয়েছে। ভেতর থেকে বেরিয়েছে বিভিন্ন সাইজের কাটা হীরা, সব মিলিয়ে তিন কেজির মত ওজন হবে। দুটো চামড়ার হ্যান্ডব্যাগে ভরে একটা বস্তায় ঢোকানো হয়েছে। আমরা যখন এই কাজটায় ব্যস্ত ছিলাম, জামালু তখন ডলারের একটা বান্ডিল প্যান্টের পকেটে ভরার চেষ্টা করছিল। দেখতে পেয়ে রুস্তম সেটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।'

'ডাহা মিথ্যে কথা!' খেঁকিয়ে উঠল জামালু। 'আমি আসলে

বান্ডিলের সাইজটা দেখতে চাইছিলাম...'

'এধরনের আজগুবি কৈফিয়ত আমিই যেখানে বিশ্বাস করতে পারছি না, ওদেরকে বিশ্বাস করাবে কীভাবে?' জামালুকে জিজ্ঞেস করল কোতোওয়াল। 'শেষ পর্যন্ত ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে গেলে তুমি?'

'এখানে শাহরিয়ার ভাই একা, আর তোমরা দুজন, এটা ঠিক স্বাস্থ্যকর বলে মনে করছি না,' বলল মুহাদিয়া। 'জামালু, চলো, বগিতে ফিরি।'

'ঠিক আছে, আমার নামও গোফরান জামালু, দেখিয়ে দেব এই অপমানের প্রতিশোধ কীভাবে নিতে হয়,' গজ গজ করতে করতে মুহাদিয়ার পিছু নিয়ে ইঞ্জিনরুম থেকে বেরিয়ে গেল দৈত্যাকার লোকটা।

আরও বিশ মিনিট পর প্রথম রেল ক্রসিংটা পার হলো ওরা। দূর থেকেই দেখতে পেল রানা, ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গুমটিঘর থেকে বেরিয়ে এল গার্ড, এক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকার পর তাড়াহুড়ো করে রাস্তার উপর ব্যারিয়ার নামাল সে।

ব্যারিয়ার দুটোর মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে ট্রেন, রানা দেখল দু'পাশে বেশ কিছু যানবাহন অপেক্ষা করছে। কারও মধ্যে বিশেষ কোনও চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না। একা শুধু গুমটিঘরের গার্ডের চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। একে তো এই সময় কোনও ট্রেন আসার কথা নয়, তার উপর ইঞ্জিনটা উল্টোদিকে ছুটছে! শুধু কী তাই, ড্রাইভার ও তার সহকারীর পরনে ইউনিফর্মও নেই!

কোনও রকম বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই চারটে বাজার সাত মিনিট আগে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। তালমি এল' আযর

স্টেশন দু'মাইল দূরে থাকতে ট্রেন থামাল রানা।

পাহাড়ী এলাকার ব্যস্ত একটা রাস্তার কিনারায় ক্যাটল ট্রাক নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করবার কথা শায়লা ও মুক্তাদির আলাউয়ির।

এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, তাই অনেকটা নির্ভয়ে পাহাড়ী গ্রামটার ভিতর দিয়ে হেঁটে এল ওরা। মাথায় একটা করে দুই মণী বস্তা নিয়ে ছুটছে জিগলু আর জামালু, তাদের পাশে পাহারায় আছে মুহাদিয়া আর কোতোওয়াল। সামনে রয়েছে রানা, পথ দেখাচ্ছে ওদেরকে। রিয়ার গার্ড হিসাবে আছে রুস্তম।

লাইনের উপর ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এলে শক্ররা জেনে ফেলবে কোথায় নেমেছে ওরা, তাই নামার আগে ওটাকে আবার সচল করে রেখে এসেছে রানা। তালমি এল' আযর স্টেশনের দিকে ছুটছে ওটা। বিপদ টের পেয়ে কেউ থামাতে পারলে ভাল, তা না হলে যতক্ষণ ডিজেল থাকবে ততক্ষণ ছুটতেই থাকবে ওটা।

কোথায় অপেক্ষা করতে হবে তা ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে শায়লা আর মুক্তাদিরকে, ঠিক সেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেল।

চওড়া রাস্তা জুড়ে যেন হাট বসে গেছে, চারদিকে ফেরিওয়ালা আর ক্রেতাদের ভিড়, তারই মাঝখানে দশ-বারোটা শুয়োরের বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের ক্যাটল ট্রাক, ছানাগুলো সম্ভবত খিদের জ্বালায় সারাক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

দৃশ্যটা একেবারেই বেমানান, বিশেষ করে মুসলমানদের এলাকায়। তবে ট্রাকে শুয়োর থাকায় একটা লাভ হলো। আশপাশে এত লোক, অথচ কেউ ওদের দিকে ভাল করে তাকাল

না। এর একমাত্র কারণ – ঘৃণা।

অতীতে মুসলমানরা অত্যাচারিত ইহুদিদেরকে অনেক সাহায্য করেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তিত রাজনৈতিক কারণে এই দুই ধর্মের লোক পরস্পরকে এখন দু'চোখে দেখতে পারে না।

ট্রাক আরোহী পুরুষদের মাথায় রয়েছে খুলি কামড়ে ধরা ছোট আকৃতির সুতি টুপি। এধরনের টুপি শুধু ইহুদিরাই ব্যবহার করে।

লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠল রানা। প্রথমে জামালু, তারপর জিগলুর মাথার বোঝা ধরে নামাল ট্রাকের মেঝেতে। মুহাদিয়া সাহায্য করছে ওকে, দুজন মিলে দ্রুত হাতে খড়ের গাদায় লুকিয়ে ফেলল বস্তা দুটো।

ক্যাবে বসেছে মুক্তাদির একা। সাংঘাতিক অধৈর্য হয়ে উঠল সে, বারবার জানতে চাইছে ট্রাক ছাড়বে কি না।

'দশ মিনিট পর,' ক্যাব ও ক্যারিয়ারের মাঝখানে ছোট্ট জানালা আছে, সেটার কাছে মুখ নিয়ে তাকে বলল রানা। তারপর মুহাদিয়ার দিকে ফিরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

রানার নীরব নির্দেশ পেয়ে ট্রাক থেকে লাফ দিল মুহাদিয়া। ক্যাবকে পাশ কাটিয়ে হনহন করে এগোল সে, তার পিছু নিল রুস্তম আর জিগলু।

'কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছে ওরা?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল জামালু।

'সামনে যাচ্ছে, কোথাও কোনও বিপদ দেখতে পেলে ফিরে এসে আমাদেরকে সাবধান করে দেবে,' বলল রানা।

প্রথম তিন মিনিট নিরুপদ্রবেই কাটল। তারপর খড়ের গাদার ভিতর একটা হাত ঢোকাতে শুরু করে জামালু বলল, 'হাতে

বোধহয় বস্তা ঠেকছে। এসো, একটা বান্ডিল বের করে দেখি ডলারগুলো নতুন না পুরানো...'

তার লম্বা করা হাতের উল্টোপিঠে জুতোর কিনারা ঘষে দিল রানা। ব্যথা পেয়ে চমকে উঠল জামালু। অন্ধ হয়ে গেল রাগে।

ট্রাকের মেঝেতে একটা হাঁটু গাড়ল জামালু, রানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে হিংস্র হায়েনার মত খেঁকিয়ে উঠল। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল সে। দেখল, ওর কপাল বরাবর গোল একটা অন্ধকার চোখ চেয়ে রয়েছে। পিস্তলটা যেন ভোজবাজির বলে এইমাত্র গজিয়েছে রানার হাতে।

'একা শুধু দাদু ওই বান্ডিল খুলবেন।' হাতটা লম্বা করল রানা, ফলে জামালুর দুই চোখের মাঝখানে কপালটা স্পর্শ করল পিস্ত লের মাযল। 'ভুলেও যদি ফের ওদিকে হাত বাড়াও, সাবধান করব না, স্রেফ তোমাকে খুন করব। কথাটা মনে রেখো।'

দশ মিনিট পর ট্রাক ছাড়ার অনুমতি দিল রানা।

আরও আধ ঘণ্টা পর ইহুদিদের এলাকায় ঢুকল ওদের গাড়ি। একটা গান ধরল শায়লা। হিব্রু ভাষায় ইজরায়েল-এর মাহাত্ম্য কীর্তন করে লেখা দেশাত্মবোধক গান, সুরটা সত্যি খুব ভাল। রানার নির্দেশে একে একে সবাই গাইতে শুরু করল তার সঙ্গে। এমনকী, এক সময় ওদের মনে হলো, শুয়োরের বাচ্চাগুলোও যেন ওদের সঙ্গে গলা মিলাতে চেষ্টা করছে।

নতুন কোনও তথ্য পাওয়ার আশায় কায়সারিয়া পুলিশ স্টেশনে এসেছেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি, সঙ্গে রয়েছে সার্জেন্ট নেতানেয়াহু। দুঃসংবাদটা এখানেই দেওয়া হলো তাঁদেরকে।

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন খিলজি। 'হ্যাঁ, এটা তার যোগ্য

একটা কাজ, তাকে মানিয়ে যায়। বিশ কোটি ডলারের হীরা আর চল্লিশ মিলিয়ন ডলার নগদ, বেশ বড় দাঁও।'

সার্জেন্ট হতভম্ব। 'সার, ব্যাপারটা প্রমাণসাপেক্ষ নয়? কেন আমরা ধরে নিচ্ছি মাসুদ রানারই কাজ এটা?'

'আজ পর্যন্ত ইজরায়েলে কখনও কোনও ট্রেন হাইজ্যাক হয়েছে বলে শুনেছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন পুলিশ সুপার। 'প্রথম থেকেই চিন্তা করছিলাম, বিনা কারণে ইজরায়েলে ঢুকবে না সে, নিশ্চয়ই বড়সড় কিছু করতে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, ঠিক তাই!'

ওদের ড্রাইভার এসে খবর দিল, 'তালমি থেকে রেডিও মেসেজ, সার।'

ছুটল সার্জেন্ট। দশ মিনিট পর ফিরে এল সে। 'মিস্টার তারিকি তালমি এল' আযর-এর একটা ঠিকানা পেয়েছে, যে ঠিকানাটা মোস্তফা ছাড়াও কিছু লোক ব্যবহার করত। গলির ভেতর একটা বুকস্টল। ওখানে জমা হত চিঠিগুলো, একটা মেয়ে এসে নিয়ে যেত।

'মেয়েটির ইংরেজি খুব ভাল। বুকস্টল-এর মালিক তার নাম জানে না, তবে শপিং এরিয়ায় মুক্তাদির আলাউয়ি নামে এক লোকের সঙ্গে তাকে দু'একবার ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। সেদোত ইয়াম-এ একটা স্লটারহাউস আছে, সেটার মালিক কিংবা ম্যানেজার মুক্তাদির।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে পুলিশ সুপার বললেন, 'সেদোত ইয়াম পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন মুক্তাদির আলাউয়িকে তারা চেনে কি না। চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও গাড়িতে বসি।'

পুলিশ কার-এ এসে বসল ওরা।

রেডিও ফোনে সেদোত ইয়াম পুলিশ স্টেশন-এর সঙ্গে

যোগাযোগ করা হলো। কথা বলছে সার্জেন্ট নেতানেয়াহু। ‘সেদোত থানা খুব ভালভাবে চেনে মুক্তাদিরকে, সার। লোকটা মদ্যপ।’

‘সে কি একা থাকে?’

প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করে অপরপ্রান্তের কথা শুনল সার্জেন্ট, তারপর সুপারকে বলল, ‘তার একটা প্রতিবন্ধী ছেলে আছে, সার। আর এই মাস কয়েক হলো বিদেশ থেকে এসেছে তার এক ভাইঝি, নাম শায়লা আলাউয়ি।’

‘হুম।’

‘আরও খবর আছে, সার,’ বলল সার্জেন্ট। ‘উকিল টমসম হেফজি বাহ্‌তে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ইয়াম পুলিশ জানতে চাইছে তাকে নিয়ে কী করবে তারা।’

‘আমাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক কাজ রয়েছে,’ বললেন পুলিশ সুপার। ‘ওদেরকে বলো তাকে যেন কায়সারিয়া থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি সময় ও সুযোগ মত তার সঙ্গে কথা বলব।’ একটু থেমে আবার বললেন, ‘এখানকার দারোগাকে বলো চব্বিশজন আর্মড পুলিশ দরকার হবে আমাদের।’

‘জী, সার।’

কোনও বিপদ ছাড়াই এক এক করে ছোট দু’তিনটে শহরকে পিছনে ফেলে এল ওরা। রাস্তায় দু’চারটে মিলিটারি পুলিশ ভর্তি ভ্যান ও জিপ দেখেছে, আরোহীদের হাতে অটোমেটিক কারবাইন আর উজি সাব-মেশিনগান তো আছেই, প্রত্যেকের মুখে গ্যাস-মাস্কও আছে। তবে ওদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়নি তারা।

রানা ধারণা করল, ট্রেনে নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, এটা

জেনে ফেলেছে তারা, সেজন্যই এই সাবধানতা।

বড় শহর হাডেরায় ঢুকেও বেরিয়ে আসতে হলো, কারণ উল্টোপথের ড্রাইভারদেরকে বলতে শোনা গেল, সামনে মিলিটারি পুলিশের রোড ব্লক আছে।

ছোট্ট জানালা দিয়ে মুক্তাদিরকে নির্দেশ দিল রানা, 'ট্রাক ঘুরিয়ে নিন।'

'ঘুরিয়ে কোন্‌দিকে যাব?' জানতে চাইল শায়লার চাচা।

ম্যাপের উপর চোখ বুলিয়ে রানা জানাল, 'উত্তর-পুব দিকে চলুন। পারদেস হাননা ও হোরবাট কেসারি হয়ে সেদোত ইয়ামে পৌঁছাবার চেষ্টা করুন।'

বিপদের ভয়ে ট্রাকটা যখন ঘুরিয়ে নিচ্ছে ওরা, উল্টোদিক থেকে আসা মিলিটারি পুলিশ ভর্তি একটা ভ্যান ওদের পিছু নিল। ইউনিফর্ম ও গ্যাস মাস্ক পরা সাত-আটজন এমপি রয়েছে ভ্যানটায়। কী দেখে সন্দেহ হয়েছে বলা মুশকিল, তাদের প্রায় সবাই সতর্ক, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক পাল শুয়োরের মাঝখানে বসে থাকা দেহাতী ইহুদিদের দিকে।

ভ্যানটা কখনও পাশে চলে আসছে, কখনও ওভারটেক করে সামনে চলে যাচ্ছে, আবার কখনও স্পিড কমিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এভাবে মিনিট বিশেক কাটল।

'আমার একটা পরামর্শ আছে,' রানার কানের কাছে মুখ তুলে নিচু গলায় বলল কোতোওয়াল।

'কী?' জানতে চাইল রানা, চেহারায় উদ্বেগ।

'মুক্তাদিরকে বলি স্পিড বাড়িয়ে ভ্যানটাকে খসিয়ে ফেলুক,' বলল কোতোওয়াল। 'তারপর আমার বিশ্বস্ত এক বন্ধুর নিরাপদ আস্তানায় গিয়ে লুকাই। জায়গাটা কাছেই।'

মনে মনে হাসি পেলেও গম্ভীর হয়ে থাকল রানা। 'ওদেরকে খসানো এত সহজ মনে করছ কেন?'

'তোমার তিন বন্ধুকে ডাকো,' চাপা রাগের সঙ্গে বলল জামালু। 'এই বিপদের সময় কোথায় তারা? সংখ্যায় সমান সমান হলে মিলিটারি পুলিশদের লাশ ফেলে দিয়ে নিজেদের পথে চলে যেতে পারতাম আমরা।'

'আমাদের মত আরাম করে বসে নেই তারা,' বলল রানা। 'জরুরি কাজেই ব্যস্ত আছে।'

'যাক,' হঠাৎ স্বস্তির বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শায়লা বলল, 'ভ্যানটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ফিরেই গেছে।'

বিদ্রূপ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কোতোওয়াল, সামনে ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে দেখে সামলে নিল নিজেকে।

এতক্ষণে ওদের সবার খেয়াল হলো, পারদেস হাননার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে ওরা। তারপর একটা ধাক্কা খেয়ে উপলব্ধি করল, একশো গজ সামনে রোড ব্লক।

এবার আর ট্রাক ঘুরিয়ে নেওয়ারও উপায় নেই, কারণ পিছনে যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে গেছে। রানা দেখল লাইনটা ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা মিলিটারি পুলিশের সেই ভ্যানটা।

অলসগতিতে, একটু একটু করে এগোচ্ছে গাড়ি।

'কিছু একটা করো!' ট্রাকের মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝপ করে রানার পাশে বসে পড়ে ফিস ফিস করল জামালু। 'রোড ব্লকে প্রতিটি গাড়ি সার্চ করা হচ্ছে! খড় সরালেই দেখতে পাবে...'

'চুপ!' চাপা গলায় তাকে ধমক দিল রানা। 'আমাকে চিন্তা করতে দাও।'

‘দুই তিনটে গ্রেনেড চার্জ করে পেছনের ভ্যানটাকে উড়িয়ে দেয়া যায়,’ বলল কোতোওয়াল।

‘তাতে লাভ?’

‘লাভ দুটো,’ ব্যাখ্যা করল কোতোওয়াল। ‘পেছনের লাইন ভেঙে যাবে, পালানোর একটা পথ পাব আমরা। ভ্যানের মিলিটারি পুলিশগুলো পটল তোলায় আমাদেরকে বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না।’

মনে মনে স্বীকার করল রানা, কোতোওয়ালের কথায় যুক্তি আছে। ও বলল, ‘আরেকটু চিন্তা করে দেখতে দাও আমাকে।’

তবে তার আর সময় পাওয়া গেল না। যে-কোন কারণেই হোক সামনের রোড ব্লক থেকে হঠাৎ করে চার-পাঁচটা গাড়িকে ছেড়ে দেওয়ায় একটা ফাঁক তৈরি হলো, সেটা পূরণ করার জন্য অন্যান্য যানবাহনের সঙ্গে ক্যাটল ট্রাককেও এগোতে হলো, ফলে রোড ব্লক হঠাৎ করে খুব কাছে চলে এল।

কোতোওয়াল বিড়বিড় করে বলল, ‘দেরি হয়ে গেছে।’

কথাটা ঠিক। এখন গ্রেনেড ফাটিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে রোড ব্লকের মিলিটারি পুলিশও বাধা দেওয়ার সুযোগ পাবে।

‘তোমার ভুলের জন্যে মরতে যাচ্ছি আমরা!’ বলল জামালু। ‘তখন যদি কোতোওয়ালের কথা শুনতে, ওর বন্ধুর আস্তানায় যেতে রাজি হতে, তা হলে…’

তারপর সময় যেন তার গতি হারিয়ে ফেলল। এখন থেকে সব কিছু স্লো মোশনে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

পিছনের ভ্যানটা যানবাহনের লাইন ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, এতক্ষণে সফল হলো ওটার ড্রাইভার। ছুটে এসে সজোরে ব্রেক করল সে, দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের ক্যাটল ট্রাকের ঠিক

পাশে। ঝপ্ ঝপ্ করে নীচে নামল ছয়জন মিলিটারি পুলিশ। তাদের চারজনের হাতের উজি সাব-মেশিনগান রানা, কোতোওয়াল, জামালু ও শায়লার দিকে তাক করা।

চারজনই তারা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকের পিছনে, উজির মাযল মুহূর্তের জন্যও তাদের টার্গেট থেকে সরেনি।

বাকি দু'জনের একজন সামনে এগিয়ে হ্যাঁচকা টানে ক্যাব-এর দরজা খুলে ফেলল, তারপর টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করে আনল মুক্তাদির আলাউয়িকে। পাছায় কষে একটা লাথি মেরে ওকে ট্রাকের পিছন দিকে হাঁটিয়ে আনল লোকটা, আরেক লাথিতে বাধ্য করল ট্রাকের উপর উঠতে। তার পিছু নিয়ে নিজেও উঠল।

অপর লোকটা ক্যাবে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসেছে।

প্রথমেই খড়ের গাদায় তল্লাশি চালাল মিলিটারি পুলিশ। ওদের লুকানো রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড ও ডলারের বস্তা খুঁজে পেতে এক সেকেন্ডও লাগল না তাদের। শুয়োর ছানার ভিড়ে নড়াচড়ার জায়গা নেই, তাই এই মুহূর্তে কারও দেহ-তল্লাশি চালানো হলো না।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া হলো রানা, কোতোওয়াল, জামালু, মুক্তাদির ও শায়লার হাতে।

রোড ব্লকের মিলিটারি পুলিশ হাতের কাজ বন্ধ করে গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত আগ্রহ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেখছে। মুখে গ্যাস মাস্ক থাকায় কোনও কথা হচ্ছে না, তবে বিরাট একটা সাফল্য অর্জিত হওয়ায় ইশারায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে কার্পণ্য করছে না তারা। তাদের কাঁধের ব্যাজে লেখা রয়েছে – হাডেরা ক্যান্ট, অর্থাৎ হাডেরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এখানে ডিউটি দিতে এসেছে তারা। আর ভাগ্যবান দলটা এসেছে হাইফা ক্যান্ট থেকে,

ডলার ও হীরা ওখান থেকেই তো ট্রেন যোগে পাঠানো হচ্ছিল জেরুজালেম ও তেল আবিবে। কাজেই আপাতত সেখানেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সব, সব ঠিক আছে কি না দেখার পর আবার যেখানে পাঠাবার পাঠানো হবে।

ওঁয়া ওঁয়া সাইরেন বাজিয়ে সামনে থাকল মিলিটারি পুলিশের প্রায় খালি ভ্যানটা। তার পিছু নিয়ে ছুটল বেদখল হয়ে যাওয়া ক্যাটল ট্রাক। রোড ব্লকের এমপি-রা স্যালুট করে বিদায় জানাল তাদেরকে।

এরপর সামনে আরও দুটো রোড ব্লক পড়ল। দুটোই নামে মাত্র, ব্যারিয়ার এরইমধ্যে তুলে ফেলা হয়েছে। সন্দেহ নেই, টেলিফোনে আগেই খবর পৌঁছে গেছে যে হাইফা ক্যান্ট-এর মিলিটারি পুলিশ লুঠ হওয়া ডলার ও হীরা এরইমধ্যে উদ্ধার করে ফেলেছে, রোড ব্লকের আর কোনও প্রয়োজন নেই।

চোদ্দো

হোরবাট কেসারি থেকে পশ্চিমদিকে রওনা হলো ওদের ক্যাটল ট্রাক ও মিলিটারি ভ্যান। কাছাকাছি শহর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা, রাস্তার দু'দিকে মাথা তুলে আছে সারি সারি পাহাড়। একেবারে নির্জন এলাকা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় আরও নীরব ও ভৌতিক লাগছে।

অর 'আকাইভা ও বিনাইয়ামিনা হয়ে হাইফা যাওয়ার পথ থেকে অনেকক্ষণ হলো সরে এসেছে ওরা। তিনজন মিলিটারি পুলিশ মুখ থেকে গ্যাস মাস্ক খুলে ফেলতেই বন্দিরা হাসতে শুরু করল। বন্দিরা মানে মুক্তাদির, জামালু আর কোতোওয়াল। রানা ও শায়লাকে ঠিক বন্দি বলা যাবে না, কারণ ওদের হাতে হ্যান্ডক্যাফ পরানো হলেও, ব্যাপারটা ছিল নেহাতই লোকদেখানো – দুজনের কারও হ্যান্ডকাফই লক করা হয়নি।

ইজরায়েলিদের হাতে ধরা পড়েনি, অর্থাৎ প্রাণটা এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে, তাতেই যারপরনাই আনন্দে আত্মহারা জামালু আর কোতোওয়াল, কারও কারও হ্যান্ডকাফে তালা দেওয়া হয়নি, ব্যাপারটা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগলেও কেউ তারা প্রসঙ্গটা তুলল না।

তবে মুহাদিয়া নিজে থেকে কয়েকটা বিষয় ব্যাখ্যা করল, স্রেফ কৌতূহল মেটাবার জন্য। সাবেক হামাস সদস্য হিসাবে তার জানা আছে সামরিক ড্রেস, যোদ্ধা বন্ধু-বান্ধব, অস্ত্র, যানবাহন ইত্যাদি কোথায় পাওয়া যায়; শাহরিয়ার ভাইয়ের নির্দেশে এগুলো সংগ্রহ করেছে সে।

সেদোত ইয়াম যথেষ্ট দূরে থাকতে ওর বন্ধুরা ভ্যানে চড়ে বিদায় নিল। একটু পরেই এই ভ্যান ছেড়ে নতুন একটা গাড়ি নিয়ে হেফজি বাহ্-তে চলে যাবে তারা। এখনও শেষ হয়নি ওদের কাজ।

বিকেল পাঁচটার দিকে মুক্তাদির আলাউয়ির ফার্মহাউসে পৌঁছাল ওরা।

কাজ আছে বলে মুক্তাদিরকে থামতে বলল মুহাদিয়া, তারপর গেটের সামনে রুস্তম আর জিগলুকে নিয়ে ট্রাকের পিছন থেকে নেমে গেল।

ট্রাক নিয়ে সরাসরি গোলাঘরে ঢুকে পড়ল মুক্তাদির। ইঞ্জিন বন্ধ করল সে, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নীচে নামল রানা। কোতোওয়াল ও জামালুর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ও। 'তোমরা দুজন সোজা দালানের ভেতরে চলে যাও। ভুলেও বাইরে বেরুবে না।'

ক্যাব ঘুরে ট্রাকের পিছনদিকে চলে আসছে মুক্তাদির, জামালু বলল, 'ভেতরে চলে যাও মানে? কী বলতে চাও তুমি? তোমার হুকুম শুনতে আমরা বাধ্য নাকি?' মারমুখো হয়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে সে।

নাগালের মধ্যে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর নাভীর কাছে বেল্টে গোঁজা পিস্তলটা ঝট্ করে টেনে নিয়ে নল দিয়ে খটাস করে বাড়ি মারল তার চোয়ালে। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল জামালু, দু'হাতে মুখ ঢাকল, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'দাঁড়াও শালা, তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে,' পরস্পরের সঙ্গে চেপে রাখা দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করল সে।

ঠাণ্ডা চোখে কোতোওয়ালের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কিছু বলবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কোতোওয়াল। 'তুমিই বস্।'

টলতে টলতে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে গেল জামালু, তার পিছু নিয়ে কোতোওয়ালও। মুক্তাদিরের দিকে হাত বাড়াল রানা। 'ট্রাকের চাবিটা আমার কাছে থাকবে।'

তাড়াতাড়ি সেটা রানার হাতে তুলে দিল মুক্তাদির। 'তুমি চাও আমিও সবার সঙ্গে দালানের ভেতরে থাকি?'

'হ্যাঁ, আপাতত।'

বাইরে বেরিয়ে উঠান পেরুচ্ছে মুক্তাদির। সেদিকে একবার তাকিয়ে মাথার স্কার্ফ খুলে চুলগুলোকে মুক্ত করল শায়লা। তার পরনে এখনও সেই দেহাতী বুড়ির নোংরা কাপড়চোপড়। 'তুমি দেখা যাচ্ছে ইস্পাতের মত কঠিনও হতে পার।'

তার একটা হাত ধরে কাছে টানল রানা। 'এই মেয়ে, কেমন আছ তুমি? সত্যি কোথাও চোট পাওনি তো?'

হাসিমুখে মাথা নাড়ল শায়লা।

'লাইনের ওপর ওভাবে তোমাকে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে জান উড়ে গিয়েছিল আমার।'

'সবাই আমরা বেঁচে আছি, এরচেয়ে ভাল থাকা আর কী হতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকাল শায়লা। 'খুব ক্লান্তি বোধ করছি। ঘুমালে এক হপ্তার আগে জাগব না।'

'তোমার আসলে দরকার কড়া এক কাপ গরম কফি।'

হাসল শায়লা। 'হয়তো ঠিকই বলেছ। আর তোমার?'

'আমি পরে আসছি। এখানে আমার একটা কাজ আছে।'

শায়লার ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। 'সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না?' আসলে রানাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার।

আরও কাছে টেনে এনে তাকে চুমো খেল রানা। উপরের মাচায় স্তূপ করে রাখা খড় থেকে অলসভঙ্গিতে নেমে এল মিহি ধুলো। ওরা মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল মাচার কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে ইসহাক।

ঝাঁপ দিয়ে নীচে নামল সে, টলতে টলতে সিধে হলো, কী এক উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে। কিছু বলতে চেষ্টা করল, মুখটা শুধু খুলল ও বন্ধ হলো, কোনও আওয়াজ বেরুল না।

তার কাঁধে একটা হাত রাখল শায়লা। ‘আগে শান্ত হও তুমি, লক্ষ্মী ভাই। তারপর আস্তে-ধীরে বলো।’

বড় করে শ্বাস নিল ছেলেটা, তারপর হড়বড় করে বলল, ‘বাড়িতে একজন লোক আছে। তোমরা চলে যাবার একটু পরেই পাহাড়ি রাস্তা ধরে এসেছে।’

‘লম্বা-চওড়া? মোটা?’

মাথা ঝাঁকাল ইসহাক। ‘হ্যাঁ।’

‘মোস্তফা,’ শায়লাকে বলল রানা।

‘আমার সন্দেহ হলো লোকটা আমাকে ধরবে।’ চোখ বড় বড় করল ইসহাক। ‘চারদিকে খুঁজছে দেখে মাচায় উঠে খড়ের গাদায় লুকিয়ে ছিলাম।’

চোখে-মুখে উদ্বেগ নিয়ে রানার দিকে তাকাল শায়লা। ‘ওরা ঠিক কি করতে চাইছে বলো তো?’

‘নিশ্চয়ই ভাল কিছু নয়।’ রানার কপালে সরু দু’একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, এক মুহূর্ত পর তা মিলিয়েও গেল। ‘ঠিক আছে, সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি যাও, কিছু খাবার আর কফি বানাও।’ শায়লা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে তার কাঁধে মৃদু চাপ দিল ও। ‘চিন্তা কোরো না। কী করতে হবে আমার জানা আছে।’

কিচেন টেবিলের কিনারায় বসে কোতোওয়ালকে গালি দিল জামালু, কোতোওয়াল তার চোয়ালে আরেকটা বড় সাইজের স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দিচ্ছে।

‘তোমাকে সত্যি এক হাত দেখিয়েছে লোকটা,’ নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বলল কোতোওয়াল।

আবার অশ্রাব্য খিস্তি করল জামালু, তারপর টেবিলে রাখা

মুক্তাদিরের হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। 'ওই শালাকে যদি খুন না করি, এক বাপের ছেলে নই আমি!' হিসহিস করে বলল সে।

'কী করে খুন করবে?' জানতে চাইল কোতোওয়াল। 'অস্ত্রগুলো তো কৌশলে কেড়ে নিয়েছে।' কিচেন থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল সে, নিজের বেডরুমে যাচ্ছে। রানা কঠিন পাত্র, তাকে সহজে ঘায়েল করা যাবে না, এসব তার জানা হয়ে গেছে। তবে কোটি কোটি ডলারের হীরা আর নগদ নোট জান থাকতে আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে দেবে না সে। কিছু একটা করতেই হবে তাকে।

বেডরুমের দরজা খুলল কোতোওয়াল। ভিতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করবার জন্য ঘুরতেই এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মোস্তফাকে, হাতে পিস্তল।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে টেনশন-মুক্ত হলো মোস্তফা, ঘাম মুছল কপালের। 'আমি ভেবেছিলাম শাহরিয়ার।'

'এখনও লোকটা গোলাঘরে,' বলল কোতোওয়াল। 'ভেতরে ঢুকতে তোমার কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কোথাও খুঁজে পাইনি।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। হাবাটা সারাক্ষণ গোটা এলাকা চষে বেড়ায়।' হাত বাড়িয়ে মোস্তফার পিস্তলটা এক রকম ছিনিয়ে নিল সে। 'কোথায় পেলে?'

'কী জানি কোত্থেকে নিয়ে এসে দিল উকিল। বলল কাজে লাগতে পারে।'

'স্পেয়ার বুলেট আছে?'

'মাত্র ছয়টা,' বলে পকেট থেকে বুলেটগুলো বের করে দিল

মোস্তফা। 'কত কী পাওয়া গেল?'

'শুধু হীরার দামই হবে এক-দেড়শো কোটি ডলার,' আন্দাজে বলছে কোতোওয়াল। 'নগদ ষাট মিলিয়নের মত।'

'আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে,' ফিসফিস করল মোস্তফা। 'ওগুলো সব শাহরিয়ারের কাছে?'

'হ্যাঁ। বলছে সব নাকি ওর দাদুর হাতে তুলে দেবে।'

'কাল রাতে উকিল টমসন আমাকে ফোন করেছিল,' বলল মোস্তফা। 'বলল দাদু কোথায় আছে জানে সে। হেফজি বাহ্-এর আশপাশে কোথাও, সাগরের কাছাকাছি।'

'তার মানে হলো বুড়ো ভামটা নিশ্চয়ই কোথাও একটা বোট লুকিয়ে রেখেছে,' বলল কোতোওয়াল। 'লুঠের টাকা হাতে পেলেই পালাবে।'

'ঠিক তাই। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?'

দরজার কাছে হেঁটে এসে কবাট খুলল কোতোওয়াল, গলা চড়িয়ে জামালু আর মুক্তাদিরকে ডাকল। এক মিনিট পর এল তারা – জামালুর হাতে গ্লাস, মুক্তাদিরের হাতে বোতল।

'তুমি তা হলে পৌঁছেছ?' মোস্তফাকে দেখে বলল জামালু। 'কিন্তু এদিকের পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, বুঝলে!'

'এটা হাতে আসার পর একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি আমি,' পিস্তলটা দেখিয়ে বলল কোতোওয়াল।

'আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন,' বিড়বিড় করল মুক্তাদির আলাউয়ি।

'ক্যাটল ট্রাকের স্পেয়ার চাবিটা তুমি লুকিয়ে রেখেছ তো?' জানতে চাইল কোতোওয়াল।

ইতিমধ্যে কাপড় বদলেছে মুক্তাদির। জোব্বার পকেট থেকে

চাবিটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

চাবিটা নিয়ে জানালার সামনে চলে এল কোতোওয়াল। পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাতে শায়লাকে দেখতে পেল সে, গোলাঘর থেকে বেরিয়ে দালানের দিকে আসছে।

সদর দরজা খোলার আওয়াজ পেল ওরা। প্যাসেজ হয়ে কিচেনে গেল শায়লা, তার পায়ের শব্দ ভেসে এল। জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজার কবাটে কান পাতল কোতোওয়াল, চার-পাঁচ সেকেন্ড শুনল, তারপর ঘোড়ার চিঁহি-হি ডাক শুনে আবার ফিরে এল জানালার সামনে।

গোলাঘরের ভিতর থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে আসছে হাবাগোবা ছেলেটা, ইসহাক। আপনমনে গান গাইছে সে। ঘোড়ার লাগামটা আলগাভাবে ধরে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, গাড়ির পিছনে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে শুকনো খড়। এরকম সময়ে প্রায় রোজই গরু-ছাগল ও ভেড়ার খাবার নিয়ে পাহাড়ে যায় সে।

'তোমার ছেলের ব্যাপারটা কী বলো তো?' জানতে চাইল কোতোওয়াল। 'কোথায় ছিল ও? তাকে তো ওখানে আমি ঢুকতে দেখিনি।'

তার পাশে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুক্তাদির। 'ওর কথা বাদ দাও। ভূতের মত কোথায় না ঘুরে বেড়ায়!'

এরপর গোলাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল রানাকে। দুই মণ ওজনের একটা বস্তা কাঁধে থাকায় কুঁজো হয়ে আছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে খোলা গেটের দিকে তাকাল ও, তারপর দালানের দিকে হেঁটে এল।

'চলো, ভেতরে ঢোকার সময় ধরি তাকে,' বলল মোস্তফা।

মাথা নাড়ল কোতোওয়াল, এক হাতে পিস্তলটার ওজন অনুভব করছে। ‘গোলাগুলিতে ওই ব্যাটার হাত খুবই ভাল। সামনে থেকে তার সঙ্গে লাগতে রাজি নই আমি। সুযোগের অপেক্ষায় থাকব আমরা।’ মোস্তফার দিকে ফিরল সে। ‘তুমি এখানে থাকো। দ্বিতীয় বস্তাটা নিয়ে আসুক, তারপর তোমরা দুজন আমার সঙ্গে যাবে।’

দ্বিতীয়বার লিভিংরুমে ঢোকার সময় তাদের তিনজনকে দেখতে পেল রানা। দুটো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোতোওয়াল আর জামালু, আর টেবিলে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে মুক্তাদির। কাঁধের ভারী বস্তাটা সাবধানে দরজার একপাশে নামিয়ে রাখল ও, প্রথমটার পাশে। তারপর ধীরে ধীরে সিধে হয়ে ওদের তিনজনের দিকে পালা করে তাকাল।

পকেটে রাখা পিস্তলটা অনুভব করছে কোতোওয়াল, সেটা বের করার আত্মঘাতী একটা ঝোঁকের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তাকে। তার মনে হলো, অদৃশ্য হলেও আশ্চর্য একটা নিরাপত্তা বলয় ঘিরে রেখেছে শাহরিয়ারকে, ফলে কেউ কোনওদিন স্পর্শ করতে পারবে না ওকে।

সিধে হয়ে জ্যাকেটের বোতাম খুলল রানা। ‘তোমার ছেলে আরেকটু হলে আমার হার্টটাকে থামিয়ে দিচ্ছিল,’ মুক্তাদিরকে বলল ও। ‘গোলাঘরের ভেতর, মাচায় বসে খেলছিল সে। বলতে পার নেহাতই কপালগুণে গুলি খায়নি।’

‘শুনে খুব দুঃখ পেলাম, বাবা,’ দ্রুত বলল মুক্তাদির। ‘ফিরে আসুক, আজ আমি ওর পিঠের চামড়া তুলব।’

কিচেন থেকে শায়লার ডাক ভেসে এল। বাতাস শুঁকল রানা, বলল, ‘সেদ্ধ মটরশুঁটি, তন্দুরে সেঁকা রুটি, পনির, সেই সঙ্গে কফির গন্ধ পাচ্ছি। সবারই নিশ্চয় খিদে পেয়েছে, চলো যাই।’

‘আমার পায়নি,’ বলে হুইস্কির বোতলটার দিকে হাত বাড়াল জামালু।

এক পা এগিয়ে তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিল রানা, শেলফ-এ রেখে ঘুরল, চোখে-মুখে কোনও রকম উত্তেজনা নেই। ‘আমি না বললাম আমরা এখন খাব?’

রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জামালু। তার কাঁধে চাপড় মারল কোতোওয়াল। ‘এসো, গোফরান।’

মুক্তাদির এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, তার পিছু নিল জামালু। দোরগোড়ায় পৌঁছে থামল কোতোওয়াল, ঘুরল। ‘মাঝে মধ্যে মানুষের সঙ্গে খুব বেশি খারাপ ব্যবহার করো তুমি। কখনও ভেবে দেখেছ, তার ফল সব সময় ভাল না-ও হতে পারে?’

রানার হাসিতে শ্লেষ। ‘এভাবে চিন্তা করলে একসময় দেখবে মনের ভেতর থেকে কে যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্ররোচনা দিচ্ছে তোমাকে!’

হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল কোতোওয়ালের চেহারা, সেই সঙ্গে কী যেন একটা নিভে গেল তার চোখে। ‘তুমি জানো, লেবাননের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইজরায়েলিদের হাতে বন্দি হয়েছিলাম আমি? ছাড়া পেলাম ডাবল হার্নিয়া নিয়ে, আমার ঊরুসন্ধিতে অসংখ্য লাথি মারার ফল। তা ছাড়া, টিবিও হয়েছিল।’

‘তাতে কী?’

কর্কশ শব্দে হেসে উঠল কুদ্দুস কোতোওয়াল। ‘ইজরায়েলি বেজন্মাদের হাত থেকে যখন বেঁচেছি, তোমার হাত থেকেও আমি বাঁচব। শুধু এই কথাটা মনে রেখো।’ প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেল সে।

নিঃশব্দে হাসল রানা। প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা এসেছে, ভালই তো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্যাসেজটা দেখে নিল ও। কেউ নেই। পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে শিরদাঁড়ার কাছে গুঁজে রাখল। তারপর জ্যাকেটের বোতাম লাগিয়ে চলে এল কিচেনে।

খাবার সুস্বাদু হলেও, খেতে বসে কেউ কোনও কথা বলল না। টেবিলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে কার কী লাগবে দেখছে শায়লা। মাঝে মধ্যে রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, তার চোখে উদ্বেগ দেখতে পেল রানা।

অবশেষে চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে সিধে হলো রানা। 'চলো সবাই, লিভিংরুমে গিয়ে বসি,' বলে একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

মাথা ঝাঁকাল কোতোওয়াল। তার পিছু নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল মুক্তাদির আর জামালু।

ত্রস্ত পায়ে রানার সামনে চলে এল শায়লা। 'মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, রানা! পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি।'

'চিন্তা কোরো না।' মৃদু হাসল রানা। 'ভেবেচিন্তেই করছি সব। তুমি এখানে থাকো।'

রানাকে লিভিংরুমে ঢুকতে দেখে কেউ তারা কিছু বলল না। টেবিলের কিনারায় বসল ও। 'অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, কেউ বলতে পারে না মানুষের কখন যে কী মনে পড়ে যায়। শেষবার ট্রেন ডাকাতি করেছিলাম বছর পাঁচেক আগে, তেল আবিবে। বড় দাঁওই বলতে হবে, এক বগি ভর্তি সোনা। কিন্তু কপালে নেই!'

'কেন, কী ঘটল?' জানতে চাইল কোতোওয়াল।

মাথা নাড়ল রানা। 'কী দেখলাম সেটা বলি – সোনার বদলে বগিগুলোয় ছিল সশস্ত্র সৈন্য, টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।'

‘নিশ্চয়ই কেউ বেঈমানী করে খবরটা ফাঁস করে দিয়েছিল?’ নিজের জখম ভুলে জিজ্ঞেস করল জামালু।

‘তিনটের মধ্যে ওটাও একটা সম্ভাবনা,’ বলল রানা। ‘সন্দেহের তালিকায় ছিল স্থানীয় চাষী লোকটা, যার বাড়ি আমরা হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছিলাম। জানালার বাইরে গাছের একটা পাতা খসে পড়লেও পেশাব বেরিয়ে যাচ্ছিল ওর।’

গরম ও লালচে হয়ে উঠল মুক্তাদিরের চোখ-মুখ, তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকাল সে।

আবার শুরু করল রানা। ‘দলে ছিল মানুষ নামের বিচিত্র এক নমুনা, দুনিয়ায় এমন কোনও ক্রাইম নেই যা করেনি সে। তার পেশা ছিল বেশ্যাপাড়ার মেয়েগুলোকে পিট্টি দেয়া, তারা যাতে আরও বেশি করে খদ্দেরকে ঘরে ঢোকায়।’

হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা মুখের সামনে তোলার সময় জামালুর হাত কাঁপতে শুরু করল।

কোতোওয়াল জানতে চাইল, ‘আর তৃতীয় সম্ভাবনা?’

‘দলের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার অভিজ্ঞতা ছিল তার, একসময় নতুন রিক্রুটদের ট্রেনিং দিয়েছে।’ কপালে টোকা মারল রানা। ‘বুদ্ধিমান ক্রিমিনাল। মানে, মহা শয়তান।’

‘পথভ্রষ্ট ফেরেশতা,’ বলল কোতোওয়াল। ‘ব্যাপারটা আমার কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে। তারপর?’

‘তাদেরকে নিয়ে জঙ্গলে গেলাম আমরা, যে-কজন বেঁচে ছিলাম আর কী, তারপর গুলি করে মারলাম।’

‘তিনজনকেই?’

‘ওই পরিস্থিতিতে আর কিছু করার ছিল না।’

'ইয়া আল্লাহ!' আতঙ্কে ফিসফিস করল আধবুড়ো মুক্তাদির।

'কেন, আর কিছু করার থাকবে না কেন?' চোখ গরম করে জানতে চাইল জামালু। 'বেঈমানী করলে একজন করেছে, তোমরা বাকি দুজনকে মারলে কেন?'

'কারণ, কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তিনজনই কাপড় নষ্ট করে ফেলল,' বলল রানা। 'তারপর স্বীকার করল, তারা সবাই দায়ী।'

জামালুর হাত এখনও কাঁপছে, লক্ষ করে গ্লাসটা ধরার জন্যে তার দিকে একটু ঝুঁকল রানা। মুহূর্তের জন্য ওকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে সুযোগটা কাজে লাগাল কোতোওয়াল। পকেট থেকে পিস্তল বের করে লম্বা করল হাতটা।

'এখনই আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি। সামান্য একটু ভুল করো, সত্যি খুন হয়ে যাবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে।

টেবিলের কিনারা থেকে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়াল রানা, সাবধানে ঘুরল, হাত দুটো শরীরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রেখেছে।

গলা চড়িয়ে মোস্তফাকে ডাকল কোতোওয়াল। 'মোস্তফা, জলদি!'

প্যাসেজ থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। এক মুহূর্ত পর দোরগোড়ায় দেখা গেল মোস্তফাকে। 'কী ব্যাপার?'

'কী হে, মোস্তফা,' বলল রানা। 'কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ জানো? সারভাইভ করতে পারবে তো?'

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' মোস্তফাকে বলল কোতোওয়াল। 'তোমার কাজ ওই বস্তা দুটো পাহারা দেয়া। ভুলেও চোখের আড়াল করবে না। জামালু, ওই শালার পিস্তল!'

সাবধানে চেয়ার ছাড়ল জামালু, ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে সন্তুষ্টির নীরব হাসি। রানার সামনে দীর্ঘ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর দ্রুত সার্চ করল। ওর নাভীর কাছ থেকে, বেল্টে গোঁজা পিস্তলটা টেনে নিয়ে পিছিয়ে গেল, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে।

'এই একটাই,' বলল সে।

'তা কী করে হয়!' বলল কোতোওয়াল। 'মোস্তফা ওকে যে পিস্তলটা দিয়েছিল, সেটা কোথায় গেল?' হঠাৎ একই সঙ্গে অস্থির ও সতর্ক দেখাল তাকে। 'আরেকবার ভাল করে সার্চ করো। শালা শিয়ালের চেয়েও চালাক।'

'এখনই চালাক শিয়ালটার লেজ কেটে দেয়া হবে,' হেসে উঠে বলল জামালু। পরমুহূর্তে ধাঁই করে ঘুসি মারল রানার নাক সই করে।

ঘুসিটা আসতে দেখল রানা, ঠেকাবার চেষ্টা না করে ওটার সঙ্গে পিছিয়ে নিচ্ছে শরীরটা। দু'তিনবার হোঁচট খেয়ে পিছু হটার সময় একটা আর্মচেয়ারে বাধা পেয়ে ডিগবাজি খেল। পাশ ফেরা অবস্থায় মেঝেতে পড়ল, ওয়ালথারটা ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে হাতে।

দ্রুত একটা গুলি করল রানা। টেবিলের ছাল তুলে দিক বদল করল বুলেটটা।

চমকাল কোতোওয়াল, চেঁচিয়ে উঠল। 'বেরোও সবাই, জলদি!' ঝট্ করে ঘুরল সে, লক্ষ্যস্থির না করেই একটা গুলি করল। বুলেট কোন্‌দিকে গেল খেয়াল নেই, তবে দেখল মুক্তাদিরের মাথায় একটা বস্তা তুলে দিচ্ছে জামালু।

শরীরটাকে গড়িয়ে এক সেট সোফার পিছনে চলে এল রানা।

ও যখন কাভার নিতে ব্যস্ত, জামালুর পিঠে দ্বিতীয় বস্তাটা তুলে দিল কোতোওয়াল, তারপর তার পিছু নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল প্যাসেজে।

সিধে হলো রানা, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গুলি করল। ওর পিস্তলের বুলেট গোলাঘরের ভিতর তাড়িয়ে নিয়ে গেল কোতোওয়ালকে।

ইতিমধ্যে ক্যাটল ট্রাকের পিছনে বস্তা দুটো তোলা হয়ে গেছে। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল মুক্তাদির। 'ট্রাক ছাড়ো!' খেঁকিয়ে উঠল কোতোওয়াল, উঠে বসল তার পাশের সিটে। সগর্জনে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এল ট্রাক, সোজা গেটের দিকে ছুটছে।

উঠানে বেরিয়ে এসে আরও দুটো গুলি করল রানা। দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে মাকড়সার জাল হয়ে গেল ক্যাটল ট্রাকের উইন্ডস্ক্রিন।

আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল মুক্তাদির। একটুর জন্য গেটের সঙ্গে ধাক্কা খেল না ট্রাকটা। রাস্তায় উঠে স্পিড বাড়িয়ে দিল সে। তার পাশে বসা কোতোওয়াল পিছন দিকে তাকিয়ে আছে, রানাকে ছুটে গেটের বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে হেসে উঠল, বলল, 'যা ভাগ, বুদ্ধু কাঁহিকে!'

এক কী দেড় মিনিট পর সিটে সিধে হয়ে বসে পিস্তলটা পকেটে ঢোকাচ্ছে কোতোওয়াল, পাহাড়ের কাঁধে চোখ পড়তেই তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তাদের দিকে ছুটে আসছে একটা পুলিশ কার। সেটার পিছনে এক লাইনে আরও অন্তত ছয়টা গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মুক্তাদির।

স্পিড কমাল পুলিশ কার। সরু রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে

দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ব্রেক! শালা হারামীর বাচ্চা, ব্রেক!' দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল কোতোওয়াল।

মুক্তাদির যেন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। নীচে পা ঠুকল সে, কিন্তু ব্রেক পেডালের বদলে একসেলারেটরে লাগল পা। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে আরও জোরে ছুটল ট্রাক। ওটার অফসাইড-এর চাকা খাদের কিনারায় চলে এল, বৃষ্টিভেজা ঘাস ছাড়িয়ে শূন্যে ঝুলে পড়ছে, হাতে বনবন করে ঘুরছে হুইলটা।

জানালা দিয়ে দেড়শো ফুট নীচে তাকিয়ে পাহাড়ী নদী ও রাশি রাশি বোল্ডার দেখতে পেল কোতোওয়াল। দরজার হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে, ট্রাকটা খসে পড়তে যাচ্ছে দেখে লাফ দিল। তার পিছু নিতে যাচ্ছিল মুক্তাদির, কিন্তু হঠাৎ তার মুখের উপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

ডিগবাজি খেতে খেতে ঢাল বেয়ে বিশ ফুট নেমে গেল কোতোওয়াল, থামল একটা কাঁটাঝোপের ভিতরে। টলতে টলতে সিধে হচ্ছে, দেখতে পেল তার পঞ্চাশ ফুট নীচে পাথুরে শেলফে আছড়ে পড়ল ক্যাটল ট্রাক। সেখান থেকে শূন্যে লাফ দিল, স্লো মোশনে পাক খাচ্ছে। ওটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল জামালু, হাত-পা অনবরত ঝাপটাচ্ছে।

বিকট শব্দে উপুড় হয়ে নদীর মেঝেতে পড়ল ট্রাকটা, তার উপর ল্যান্ড করল জামালু। সঙ্গে সঙ্গে বোমার মত বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক। আকাশের দিকে লাফ দিল কমলা রঙের অগ্নিশিখা।

ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে কোতোওয়াল। ভয়ানক শক খেয়েছে সে, ডান চোখের উপরের একটা ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে

ভিজে যাচ্ছে গাল। তবে বেঁচে থাকার আকুতিটা এখনও তার প্রবল। রাস্তা পেরুবার সময় কয়েকজন লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ঘাড় ফেরাল সে। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ছুটে আসছে তার দিকে। হাত লম্বা করে গুলি করল সে, ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের একজন, তারপর কাত হয়ে কিনারা থেকে পড়ে গেল খাদে। বাকি সবাই কাভার নেওয়ার জন্য যে যেদিকে পারে ছুটল।

অগভীর একটা নালা ধরে পাহাড়ের কাঁধ ঘুরল কোতোওয়াল, উপত্যকায় নেমে এসে শহরের পথ ধরল।

পনেরো

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সবই দেখতে পেল রানা – ক্যাটল ট্রাক খাদের তলায় পড়ে চুরমার হয়ে গেল, আগুন ধরল পেট্রল ট্যাংকে, ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠে এসে পুলিশ মারল কোতোওয়াল।

পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজিকেও চিনতে পারল রানা, খাদের নীচে পড়া পুলিশ কনেস্টবলের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছেন।

এরপর আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, এক ছুটে ফার্মহাউসে ফিরে এল রানা। উঠানে ঢোকার সময় দেখল দালানের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শায়লা।

'কী হলো? কীসের আওয়াজ শুনলাম?'

‘সময় নেই, পরে শুনো। হাতের কাছে কাপড়চোপড় থাকলে নাও, তারপর চলো কেটে পড়ি। টয়োটার চাবি এখনও আমার কাছে, মনে আছে?’

গোলাঘর থেকে টয়োটা নিয়ে বেরিয়ে আসছে রানা, দেখল গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভেড়ার পশম দিয়ে তৈরি জ্যাকেটটা গায়ে চড়াচ্ছে শায়লা। স্পিড কমল গাড়ির, সামনের দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে উঠে রানার পাশে বসল সে। রাস্তায় উঠে এসে বাম দিকে ঘুরে গেল টয়োটা, উপত্যকার মাথা লক্ষ্য করে ছুটল।

ওর বাহুতে হাত রাখল শায়লা। ‘কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল ধরে জেটিতে,’ বলল রানা। ‘ওখানে ইসহাক আছে। আর আছে দাদুর লঞ্চটা।’

‘মানে? কী বলছ? দাদুর লঞ্চ এখানে আসবে কীভাবে?’

‘মুহাদিয়ার যোদ্ধা বন্ধুদের কথা মনে আছে না? হেফজি বাহ্ থেকে তারাই নিয়ে এসেছে ওটাকে।’

‘ওরা লঞ্চ নিয়ে এসেছে! কিন্তু... মুহাদিয়া, রুস্তম আর জিগলু তা হলে কোথায়?’

হাসল রানা। ‘ওরা তিনজন ডলার ও হীরা ভর্তি বস্তা দুটো পাহারা দিচ্ছে। আশা করি ইতিমধ্যে লঞ্চে তোলা হয়ে গেছে ওগুলো।’

অসহায় দেখাল শায়লাকে। ‘আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না! পরিষ্কার দেখলাম বস্তাগুলো কোতোওয়ালরা নিয়ে গেল।’

‘ওগুলোয় ডলারের সাইজে কাটা সাদা কাগজের বান্ডিল ভরা ছিল,’ বলল রানা। ‘শহর থেকে মুহাদিয়ার আনা বস্তায় কাল রাতে ভরে রেখেছিলাম আমরা।’

‘এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না…’

‘ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যে পাহাড়ে গেল ইসহাক, তুমি দেখোনি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল শায়লা। ‘কই, না! আমি বোধহয় তখন কিচেনে ছিলাম।’

‘হ্যাঁ, ঠিক। তখনই খড়ের ভেতরে লুকিয়ে আসল বস্তাগুলো নিয়ে গেছে ও।’

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল শায়লা, তারপর জানতে চাইল, ‘বাকি সবার কী অবস্থা? কী ঘটল ওখানে?’

‘চারদিকে গিজগিজ করছে পুলিশ। ট্রাকটা রাস্তা থেকে খাদের নীচে পড়ে গেছে।’

শায়লার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ‘আর আমার চাচা?’

‘নীচে পড়ার পর,’ ম্লান সুরে বলল রানা, ‘আগুন ধরে যায় ওটায়।’

ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরিয়ে নিল শায়লা। সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে তার কবজিটা ধরল রানা।

পুলিশ কনস্টেবলের লাশ ঢাল থেকে রাস্তায় তোলার নির্দেশ দিয়ে খাদের একেবারে নীচে নেমে এলেন পুলিশ সুপার, সঙ্গে রয়েছে সার্জেন্ট নেতানেয়াহু, মোসাদ এজেন্ট মিরাজ তারিকি ও কয়েকজন কনস্টেবল।

প্রথমে সামনে পড়ল জামালুর লাশ।

‘কেউ আমরা চিনি?’ জানতে চাইলেন পুলিশ সুপার।

কথা না বলে মাথা নাড়ল সবাই।

ভিজে ঘাসে পড়ে রয়েছে আরেকটা লাশ। ‘এটাকে চেনা চেনা

লাগছে,’ বললেন পুলিশ সুপার।

‘আল মোস্তফা, খান আল আসকার-এ বছর দুই-তিন ছিল,’ মনে করিয়ে দিল সার্জেন্ট।

‘আর যে লোকটা আমাদের মোকাম্মেল হায়দারকে গুলি করে মেরে রেখে গেল, সে কে?’ জানতে চাইলেন সুপার।

‘কাছ থেকে দেখলে হয়তো চিনতে পারব,’ বলল নেতানেয়াহু। ‘চুল দেখে মনে হলো লালচে।’

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বখতিয়ার খিলজি। তা হলে, ভাবলেন তিনি, পালিয়ে যাওয়া লোকটা শাহরিয়ার নন। ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত ট্রাকটার দিকে তাকালেন। দুটো বস্তায় ভরা কাগজের বান্ডিলগুলো পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে একটা লোকও, ক্যাবে বসে ট্রাক চালাচ্ছিল সে।

‘একটা ডলারও উদ্ধার করা গেল না,’ সুপারের পাশ থেকে বলল সার্জেন্ট। ‘হীরাগুলো নিশ্চয়ই পোড়েনি। তবে ট্রাকে ওগুলো ছিল কি না তাই বা কে জানে!’

‘ঠিক আছে, এখানে আর আমাদের দেখার কিছু নেই,’ বললেন পুলিশ সুপার। ‘সার্জেন্ট, আগুন নিভিয়ে তল্লাশি চালাবার ব্যবস্থা করুন, দেখুন হীরাগুলো পাওয়া যায় কি না। মিস্টার তারিকি, চলুন, আমরা ওপরে উঠি।’

রাস্তায় উঠে এসে আরেক সার্জেন্টের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইলেন বখতিয়ার খিলজি। ‘ফার্মহাউসে কাউকে পেলেন?’

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট মঙ্গনিহান। ‘বোঝা যায় তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে সবাই। ভেতরে গোলাগুলি হয়েছে, সার।’

‘বলেন কী!’

‘জী, সার। একটা গাড়ি, সম্ভবত টয়োটা, কয়লাখনির দিকে

যেতে দেখেছি। ভাল করে সার্চ করে দেখতে হবে, ওদিক দিয়ে বোধহয় পালাবার কোনও পথ আছে।'

'আচ্ছা,' এই প্রথম মুখ খুলল মোসাদ এজেন্ট তারিকি। 'উকিল টমসনকে এখানে নিয়ে এসে জেরা করলে হয় না? আমরা হয়তো তার কাছ থেকে কিছু তথ্য পেতে পারি।'

'গুড আইডিয়া,' বললেন পুলিশ সুপার। 'সার্জেন্ট মঙ্গনিহান, থানায় রেডিও মেসেজ পাঠান, এখনই একটা পেট্রল কারে তুলে এখানে পাঠিয়ে দিক তাকে।'

পরিত্যক্ত খনির ভিতর ঢুকে একটা খাদের কিনারায় টয়োটা থামাল রানা। 'এখানেই নামতে হবে,' শায়লাকে বলল ও।

জায়গাটা যথেষ্ট ঢালু, দুজন মিলে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে কিনারা থেকে খাদের নীচে ফেলে দিল ওরা। তারপর সরু খালের পাড় ধরে এগোল। কিছুদূর যাওয়ার পর গুহাটার দেখা পাওয়া গেল। বাইরে থেকে দেখে গুহা মনে হলেও, ওরা জানে এটা আসলে ইসহাকের আবিষ্কার করা একটা টানেল। বেশ বড় একটা ভেলা অনেক আগেই বানিয়েছে ইসহাক, রানার কথায় ছোট আরেকটা ভেলা বানিয়ে এখানে রেখে গেছে সে।

সেই ভেলায় চড়েই তিন মাইল লম্বা অন্ধকার আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলটা পার হয়ে এল ওরা। সাগরে বেরুবার খানিক আগে টর্চ জ্বালল রানা। সামনে পাথরের চওড়া কারনিস দেখা গেল। ভেলা ছেড়ে ধাপ বেয়ে উঠল ওরা। বেশ লম্বা কারনিস, শেষ মাথায় ছোট একটা জেটি। মাস্তুলে নিঃসঙ্গ একটা আলো জ্বেলে রেখে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে লঞ্চটা।

লঞ্চ থেকে টর্চ জ্বেলে সংকেত দিল কেউ, সম্ভবত মুহাদিয়া।

রানা সাড়া দিতে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'চলে আসুন, মাসুদ ভাই। এদিকের সব খবর ভাল।'

কথাটা আক্ষরিক অর্থে বলেনি মুহাদিয়া। সব খবর ভাল নয়। যেমন, বিকেল চারটে থেকে সাগরে জোরেশোরে টহল দিতে শুরু করেছে ইজরায়েলি কোস্ট গার্ড। মুহাদিয়ার যোদ্ধা বন্ধুরা খানিক পর পর রিপোর্ট করছে, হেফজি বাহ্-এর জলপথ নিরাপদ বলে মনে হলেই সবুজ সংকেত পাঠাবে তারা।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। এই ফাঁকে ইসহাকের নিয়ে আসা বস্তা দুটো খুলে পরীক্ষা করল রানা। সুযোগ পেয়ে প্রথমবারের মত হীরাগুলোও একবার দেখে নিল ও। চামড়ার দুটো হ্যান্ডব্যাগে রাখা হয়েছে ওগুলো। মুহাদিয়ার আন্দাজ ঠিকই আছে, তিন কেজির মত ওজন হবে। দেখেই বুঝতে পারল রানা, খুবই উন্নতমানের হীরা।

'মাঝারি আকারের একটা হীরার দাম হবে, কম করে ধরলেও, পঞ্চাশ হাজার ডলারের কম নয়,' বলল রানা। 'মজুরি নয়, দানও না – মাইন্ড ইট – তোমাদের প্রত্যেককে আমি একটা করে হীরা পুরস্কার দিচ্ছি।'

মুহাদিয়াকে ইতস্তত করতে দেখা গেল। 'মাসুদ ভাই, কিছু মনে করবেন না, দাদুর অনুমতি ছাড়া...'

রানা অভয় দিয়ে বলল, 'দাদুকে যদি কিছু বলতে হয় তো আমি বলব, ঠিক আছে?'

'কিন্তু প্রত্যেককে দেয়ার কী দরকার,' বলল মুহাদিয়া। 'আমি বা আমার বন্ধুরা তো কিছু পাবার আশায় কাজটা করিনি।'

'তা হলে আমাকে কিছু বলতে হয়, মুহাদিয়া,' বলল রানা। 'তুমি, রুস্তম, জিগলু আর তোমার বন্ধুরা কেউ আমাকে চিনতে না,

অথচ দাদুর কথায় জান বাজি রেখে আমার সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে গেলে। আমি মনে করি, মঙ্গলের জন্যে যুদ্ধ করার, প্রয়োজনে আত্মদান করার এই মহত্ত্বকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেয়া দরকার। পুরস্কারটা সেই স্বীকৃতি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এটা তোমরা অর্জন করেছ।'

এরপর আর কেউ হীরা নিতে আপত্তি করল না।

দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারার হিসাবে পুরস্কৃত করা হলো হাসিখুশি, সরল ইসহাক আলাউয়িকেও। অনাবিল আনন্দে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে উঠল প্রতিবন্ধী ছেলেটা, তারপর সেটা শায়লার হাতে গুঁজে দিল, বলল, 'এটা আমি আমার আপুমণিকে দিলাম। বিয়ের উপহার।'

হেসে উঠল সবাই।

সবচেয়ে সুন্দর দেখে তিনটে হীরা দিল রানা শায়লাকে।

'এভাবে যে দানবীর সাজছ, পিএলও-র ভাগে কম হয়ে যাচ্ছে না?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল সে।

রানার জবাব: 'আমি তো কোনও মজুরি নিইনি, শায়লা। এই যে খুশি মনে সবাইকে পুরস্কার দিচ্ছি, এটাই আমার মজুরি।'

শায়লা উপলব্ধি করল, এরপর আর কথা চলে না।

সন্ধ্যার আগেই ওদের অপেক্ষার অবসান হলো। মুহাদিয়ার বন্ধুরা মোবাইল ফোনে খবর দিল, কোস্ট গার্ড-এর তৎপরতা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা হলো আর কোনও জলযানকে সার্চ করছে না তারা, থামাচ্ছেও না।

সময় নষ্ট না করে লঞ্চ ছেড়ে দিল রুস্তম। হঠাৎ কোত্থেকে গাঢ় কুয়াশা নেমে এসেছে, খুব সাবধানে এগোচ্ছে সে।

হেফজি বাহ্ ফার্মহাউস।

'দাদু কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন?' শায়লাকে পাশ কাটিয়ে লিভিংরুমে ঢুকে জানতে চাইল রানা।

ইজি চেয়ারে বসে আছেন খাদেমুল দাউদ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। হীরা ভর্তি ব্যাগ দুটো টেবিলে রেখে তাঁর পালস দেখল রানা।

এই সময় চোখ মেললেন দাদু। রানাকে চিনতে পারছেন বলে মনে হলো না। 'তুমি কি আমার দাদু, মাসুদ রানা?'

'জী।'

খক খক করে কাশতে শুরু করলেন দাউদ। 'হ্যাঁ, চিনতে পারছি। আসলে হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তোমরা কি··· তুমি কি কাজটা···'

হ্যান্ডব্যাগ দুটো দেখাল রানা। 'ওগুলোয় তিন কেজি হীরা আছে। লঞ্চে আছে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিলিয়ন ডলার। আপনার সুটকেস গুছানো হয়েছে?'

চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলেন দাদু। 'হ্যাঁ, ওই তো···'

ঠিক এই সময় পিস্তল হাতে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল কুদ্দুস কোতোওয়াল।

ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কোতোওয়ালকে। তার পিস্তল ধরা হাতটা সামান্য কাঁপছে। 'কেউ একটু নড়ে দেখো, খুন করে ফেলব। মাথার পেছনে হাত তোলো সবাই।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে এল কোতোওয়াল। একটা হ্যান্ডব্যাগ খুলে ভিতরে কী আছে দেখল। 'জানালার বাইরে থেকে শুনলাম, আমাদেরকে তুমি বোকা বানিয়েছ, মাসুদ রানা। ডলার ভর্তি বস্তা

রেখে দিয়ে, ডামি গছিয়ে দিয়েছ। তোমার বুদ্ধি ও সাহসের সত্যিই তারিফ করতে হয়। ঠিক আছে, আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াও, রানা।'

ঘুরল রানা। মাথার উপর হাত তোলার সময় ওর জ্যাকেটটা ফাঁক হয়ে গেল, বেল্টে গোঁজা ওয়ালথারটা দেখা যাচ্ছে।

সেদিকে হাত তুলে শায়লাকে নির্দেশ দিল কোতোওয়াল। 'বাঁ হাত দিয়ে ধরে টেনে নাও পিস্তলটা, তারপর ছুঁড়ে দাও আমার দিকে।' শায়লা ইতস্তত করছে দেখে হাতের অস্ত্র উঁচু করল সে, বলল, 'সেদোত ইয়ামে পুলিশ মেরে এসেছি। বুঝতেই পারছ, আমার হারাবার কিছু নেই।'

'যা বলছে করো,' শায়লাকে নির্দেশ দিল রানা।

রানার বেল্ট থেকে পিস্তলটা টেনে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল শায়লা। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল কোতোওয়াল, একটুর জন্য নাগাল পেল না। মেঝেতে ঘষা খেয়ে টেবিলের তলায় হারিয়ে গেল সেটা।

সেদিকে এগোতে যাবে শায়লা, নিষেধ করল কোতোওয়াল। 'ধোরো না ওটা!'

হাত দুটো নিচু করল রানা। 'কী হবে এখন?'

'দাদুকে নিয়ে লঞ্চে চড়ব আমি,' বলল কোতোওয়াল। 'উকিল টমসনের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'মানে?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল শায়লা।

'কী ব্যাপার, দাদু?' রানাও প্রশ্ন করল।

খাদেমুল দাউদ চুপ করে আছেন।

'ওনার কিছু বলার মুখ নেই,' হেসে উঠে বলল কোতোওয়াল। 'কী ব্যাপার আমিই বলছি। পিএলও-র টাকা উদ্ধার করার জন্যে এই যে ট্রেন ডাকাতি, এটা ডাহা মিথ্যে কথা। আসল কথা হলো,

দাদুর ক্যানসার হয়েছে, তার চিকিৎসার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার। পিএলও-তে তার তো এখন আর কোনও গুরুত্বই নেই, এত টাকা কে দেবে তাকে? কেউ না। কাজেই··· বাকিটা বুঝতেই পারছ।'

'এর মধ্যে উকিল টমসন কোত্থেকে আসছে?' জানতে চাইল রানা।

'উকিল খোঁজ-খবর নিয়ে আসল ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তোমাকে জানিয়ে দেবে, এই ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে সে। এখন আমরা লুঠ করা ডলার ও হীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব।'

'এ-সব কি সত্যি?' দাদুর দিকে ফিরে জানতে চাইল রানা, 'কী বলছে লোকটা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন খাদেমুল দাউদ। 'ঝামেলা এড়াতে উকিলকে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি আমি। ক্যানসারের চিকিৎসা?' তিক্তকণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি। 'ডাক্তার বলে দিয়েছেন, গুণে গুণে আর নব্বইদিন বাঁচব, এর কোনও চিকিৎসা নেই।'

'তা হলে?'

'একথা সত্যি পিএলও-কে সাহায্য করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না বা নেই,' বললেন বুড়ো দাউদ। 'টাকা উদ্ধারের আসল উদ্দেশ্য হলো হামাসকে সাহায্য করা।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল কুদ্দুস কোতোওয়াল। 'আপনি আমাদের বলেছেন হামাস উগ্র মৌলবাদী সংগঠন, আপনি তাদের আদর্শে বিশ্বাসী নন···'

'আমি হামাসকে সাহায্য করতে চাই, এটা শুনলে আমাকে

কেউ সাহায্য করবে না, তাই ওসব কথা বলতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু আসল কারণ, আসল ছবি অন্যরকম। হামাস একটানা এক বছর একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতি পালন করছে। মানুষ মেরে কোনও লাভ নেই, আত্মঘাতী হওয়া স্রেফ অসভ্যতা, এটা এখন বুঝতে পারছে হামাস নেতারা। এ-ও বুঝতে পারছে যে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা শান্তিকামী, তারা ইজরায়েলিদের সঙ্গে সহাবস্থান করে বাঁচতে চায়। হামাসের এই উপলব্ধি খুব ভাল চোখে দেখছে তারা, নির্বাচনে জেতার এটাই মূল কারণ।

'কিন্তু জেতার পর কী হলো? তিক্ত হলেও এটা একটা নির্মম সত্য যে প্যালেস্টাইনের প্রায় দেড় লক্ষ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন দেয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র। তারা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। ইহুদিরা কাজ দিলে ফিলিস্তিনিরা খেতে পায়, হামাস ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ ফিলিস্তিনিদের কাজ দিচ্ছে না তারা।

'এরকম অবস্থায় আমি আমাদের নেতার দিক-নির্দেশনা অনুসারে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই। রামাল্লায় নিজ দপ্তরে বছরের পর বছর বন্দি করে রেখে ইয়াসির আরাফাতাকে যখন অপমানের চূড়ান্ত করা হচ্ছে তখনই প্রথম তিনি আমাকে এই নির্দেশনা দেন...'

'কে তাঁকে অপমান করেছিল?'

'আমেরিকা তাঁকে হুকুম দেয়ঃ তাঁর পরনের জ্যাকেটে শুধু ফিলিস্তিনি পতাকা নয়, ইজরায়েলি পতাকার প্রতিকৃতিও থাকতে হবে। এই নির্দেশ মেনে নিয়েও আমেরিকানদের প্রিয়পাত্র হতে পারেননি তিনি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়েছেন, তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমেরিকানরা নির্দেশ দিয়েছে, এসব বক্তৃতা

তাঁকে আরবী ভাষায় দিতে হবে। তা-ও দিয়েছেন তিনি। বার বার মার খেয়েও বলেছেন "ইজরায়েলিরা আমার ভাই," "ওরা আমার মিত্র!" এতভাবে অপমানিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, সন্ত্রাসের পথ ধরে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা আসবে না আমেরিকার সাহায্যেও। আমেরিকা নিজের নানাবিধ স্বার্থে সব সময় চাইবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইজরায়েলিদের বিবাদ লেগে থাকুক। মারা যাবার আগে আরাফাত বুঝতে পারেন, আমেরিকার সঙ্গে নয়, আপস করতে হবে ইজরায়েলিদের সঙ্গে। তাঁর রহস্যময় মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে বলে গেছেন, হামাস যদি কোনওদিন সহিংস নীতি বাদ দিয়ে ইজরায়েলিদের সঙ্গে শান্তি চায়, আমরা যারা অহিংস পন্থার সমর্থক তারা যেন তখন হামাসকে সাহায্য করি। রানা, এজন্যে আমি তোমাকে ডেকে এনেছি...'

'ধন্যবাদ, দাদু,' বলল রানা। 'আপনি ঠিক কাজই করছেন।'

'এধরনের রূপকথা শুনিয়ে আমার কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না!' বেসুরো কণ্ঠে হেসে উঠল কোতোওয়াল। 'ক্যানসারে না মরে তুমি বরং আমার হাতেই মারা যাও, তোমার সঙ্গে কবর হয়ে যাক হামাসকে সাহায্য করার ইচ্ছেটারও।' কথা শেষ করে, কারও বাধা দেবার আগেই পরপর দুটো গুলি করল সে।

বুলেটের ধাক্কায় দু'পা পিছিয়ে ধপ করে ইজি চেয়ারে বসে পড়লেন খাদেমুল দাউদ। গুলির শব্দ শুনে চেঁচিয়ে উঠল শায়লা, একই সময়ে টেবিলের তলা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা, ওর ডান হাত ওয়ালথারের নাগাল পেতে যাচ্ছে।

ওকে ভালভাবে দেখতে পাওয়ার জন্য লাফ দিয়ে এক পা পিছাল কোতোওয়াল, তবে দেরি হয়ে গেছে তার। রানার প্রথম গুলি তার বুকে লাগল, দ্বিতীয়টা লাগল পেটে। তার চোখ-মুখ

থেকে সমস্ত ভাব নিঃশেষে মুছে গেল। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল সে।

ব্যথায় কুঁজো হয়ে আছেন দাদু। তাঁর পাশে হাঁটু ভাঁজ করে বসল শায়লা, হাত দিয়ে ধরে মুখটা উঁচু করতে চাইছে।

চোখ মেললেন দাউদ। ব্যথায় চোখ-মুখ কোঁচকানো। 'ব্যাগ খুলে হীরাগুলো একবার দেখাও আমাকে।'

খোলা হ্যান্ডব্যাগে হাত ভরে একটা বেশ বড় হীরা বের করলেন দাদু। শায়লার দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে একটু হাসলেন। 'এটা আমার তরফ থেকে রাখো, ভাই। মনে করো তোমার বিয়ের উপহার।'

শায়লার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে। 'রানা আমাকে আগেই তিনটে দিয়েছে, দাদু...আর লাগবে না আমার।'

'প্যালেস্টাইনের জন্যে তোমার ত্যাগ, চাচাতো ভাইটির জন্যে তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সোনার হরফে লিখে রাখার যোগ্য। দিয়েছে, খুব ভাল কাজ করেছে রানা। আমি দাদুও দিচ্ছি, এর সঙ্গে আমার দোয়াও আছে যে, নিতে তোমাকে হবেই।' ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও হাসলেন বৃদ্ধ।

'কোথায় লেগেছে, দাদু?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। 'কতটা খারাপ?'

তাঁর রক্তশূন্য ফ্যাকাসে ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল। 'যতটা খারাপ হতে পারে, রানা। শোনো, মুহাদিয়াকে বললেই শেফাইম সেফ হাউসে নিয়ে যাবে তোমাদেরকে। তোমাকে আগেই বলেছি মিস্টার আরাফাতের ডায়েরিটা কোথায় আছে। তাতে তুমি শেখ বুরহানুদ্দিন হামাদানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর পাবে। সোনার বার আর ব্যাঙ্কের কাগজ-পত্র কোথায় আছে তাও তুমি জানো।

ওগুলোর সঙ্গে লুঠ করা সমস্ত ডলার আর হীরা তার হাতে তুলে দিতে হবে। তুমি শুধু মাথাটা একবার ঝাঁকাও, আমি নিশ্চিন্ত মনে মরি...'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

সেটা দেখেই চোখ বুজলেন মহৎপ্রাণ খাদেমুল দাউদ।

হঠাৎ দূর থেকে কী রকম একটা আওয়াজ ভেসে এল। ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা, ওর পিছু নিয়ে শায়লাও।

বাড়ির সদর দরজা খুলতে যাবে রানা, রাস্তা থেকে ভেসে এল পুলিশ কার-এর সাইরেন। দরজা না খুলে বাড়ির পিছন দিকে ছুটল রানা, শায়লার একটা হাত ধরে আছে। কিচেনে ঢুকে পিছনদিকের দরজাটা খুলল। 'পুলিশ চলে এসেছে। টানেল ধরে সৈকতে চলে যাও তুমি, লঞ্চে উঠে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

শায়লা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল রানা। 'যা বলছি করো। আমি দাদুকে নিয়ে আসছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো শায়লা, কিচেন থেকে বেরিয়ে গাঢ় কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

লিভিংরুমে ফিরে এসে রানা দেখল রক্তবমি করছেন দাদু। 'আপনি আমাদের সঙ্গে শেফাইম যাচ্ছেন,' ম্লান সুরে বলল ও। 'একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা...'

'শায়লাকে নিয়ে চলে যাও তুমি, রানা। অ্যান্ড দ্যাট'স মাই লাস্ট উইশ!' কাশতে কাশতে বললেন দাদু। 'আর শোনো, কোতোওয়ালের পিস্তলটা দাও আমাকে, মরার আগে যদি ধরা পড়ে যাই, কাজে লাগবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর মেঝে থেকে কুড়িয়ে কোতোওয়ালের পিস্তলটা দাদুর হাতে ধরিয়ে দিল।

লিভিংরুমে ঢুকে পুলিশ সুপার দেখলেন দুটো লাশ পড়ে আছে। কুদ্দুস কোতোওয়ালকে চিনতে না পারলেও ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে থাকা লাশটা দেখেই চিনতে পারলেন। পিএলও-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য খাদেমুল দাউদের ছবি দেখেছেন তিনি। জানেন মোসাদ তাঁকে খুঁজছে; আবার শুনেছেন, হামাসের ধর্মান্ধ একটা অংশ তাঁকে পেলে মেরে ফেলবে। তবে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন তিনি। মারা গেছেন অজ্ঞাতপরিচয় এক অপরাধীর গুলি খেয়ে।

কিচেন থেকে ফিরে এল সার্জেন্ট। 'সার, ওদিক দিয়ে কেউ একজন পালিয়েছে, আমি তার পায়ের আওয়াজ পেয়েছি।'

'বলেন কী। চলুন, ধাওয়া করে ধরি!' ছুটলেন পুলিশ সুপার।

কিচেন হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সার্জেন্ট, অবাক হয়ে বলল, 'মিস্টার মিরাজ তারিকি এখানেই তো ছিলেন, গেলেন কোথায়?'

'নিশ্চয়ই ক্রিমিনালটাকে ধাওয়া করছেন,' বললেন পুলিশ সুপার। 'চলুন আমরাও তাই করি। আপনি ডানদিকে যান, আমি এদিকটা দেখি।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত এগোলেন তিনি, হুইসেলে ফুঁ দিচ্ছেন। ঘন কুয়াশায় মিলিয়ে গেল শরীরটা।

কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছে রানা। হুইসেলের আওয়াজ ক্রমশ কাছে চলে আসছে, বুঝতে পেরে একটা ঝোপের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল ও। লুকানো টানেলটা তো খুঁজে পায়নি, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সৈকতে যাওয়ার পথটাও পাচ্ছে না।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, অপেক্ষা করছে পুলিশ কখন হতাশ হয়ে চলে যাবে। বেশ কিছুক্ষণ হলো হুইসেল বাজছে না।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর ঝোপটাকে পাশ কাটিয়ে সাবধানে এগোল। বিশ মিনিট পর সৈকতে বেরিয়ে এল ও। দুটো হেডল্যান্ডকে মাঝখানে রেখে ছুটল। পরমুহূর্তে আবার স্থির হয়ে গেল ও। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ! এদিকেই আসছে। তারপর শোনা গেল চাপা একটা নারীকণ্ঠ।

'তুমি কোথায়?'

শায়লার গলা চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'এখানে।'

ছুটে এল শায়লা, সরাসরি ধাক্কা খেল ওর বুকে। 'এসো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'তোমার দেরি দেখে ভাবলাম ধরা পড়ে গেছ...'

'পুলিশ চারদিক ঘিরে ফেলছে,' বলল রানা, শায়লাকে পাশে নিয়ে ছুটছে।

তীরে এসে রানা লঞ্চের আলো দেখতে পেল রানা। দেখল লঞ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসহাক, হাতে একটা দশ ফুটী পোল, প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করছে। 'এখন আমরা রওনা হতে পারি, মাসুদ ভাই? রুস্তম ভাইকে ইঞ্জিন চালু করতে বলব?'

'এই, না! ইঞ্জিন স্টার্ট দিলে বহুদূর থেকে শোনা যাবে,' সাবধান করল রানা। 'খাঁড়ি থেকে স্রোতের টানে ভেসে যাব আমরা।'

লঞ্চে উঠে পড়ল শায়লা। একটা মাত্র লাইন লঞ্চটাকে এখনও ডাঙার সঙ্গে আটকে রেখেছে, সেটার দিকে ছুটল রানা। লাইনটা খুলে দিতেই তীর থেকে দূরে সরে গেল লঞ্চ, স্রোতের টান পেয়ে গেছে।

উদ্বেগে কেঁপে গেল শায়লার গলা। 'জলদি, রানা!'

লাফ দিতে যাবে রানা, কুয়াশার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ওর গায়ে ধাক্কা খেলেন পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজি। সৈকতে পড়ে বালির উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে দুজন। একসময় স্থির হলো, উপরে রয়েছে রানা। প্রতিপক্ষের গলাটা দু'হাতে ধরে আছে। চাপ দিতে যাবে, এই সময় তাঁর মুখটা দেখতে পেল ও। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'উঠুন।'

অস্পষ্ট আলোয় পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। আবার চারদিকে পুলিশের হুইসেল বাজছে। হঠাৎ চাপা গলায় আঁতকে উঠল শায়লা।

সেদিকে তাকালেন পুলিশ সুপার। কুয়াশার ভিতর আবছামত দেখা যাচ্ছে লঞ্চটাকে, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, সেটার রেলিং আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নারীমূর্তি। দৃষ্টি ফিরে এল রানার মুখে। দুজনের কারও মধ্যেই পিস্তল বের করবার গরজ নেই। হঠাৎ হাসি ফুটল বখতিয়ার খিলজির মুখে।

'টাকাগুলো ঠিক কাজে ব্যয় হবে তো, আল শাহরিয়ার?'

'হ্যাঁ। প্যালেস্টাইনি মুসলমানদের জন্যে।'

বুক ভরে শ্বাস নিলেন খিলজি।

'যান, খোদার ওয়াস্তে! জলদি! সরে যাচ্ছে লঞ্চ!'

ঘুরেই সাগরে ঝাঁপ দিল রানা। লঞ্চ লক্ষ্য করে সাঁতরাচ্ছে। তারপর রেইল টপকে পোলটা নিল ইসহাকের হাত থেকে। ঘুরল ও, দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল পাড়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সুপার বখতিয়ার খিলজির দিকে, তারপর একটা হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে পানিতে ডোবাল পোলটা, লগি ঠেলে বাহনটাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরও।

লঞ্চটা কুয়াশার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন পুলিশ সুপার। অল্পক্ষণ পর মোসাদ এজেন্ট মিরাজ তারিকিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল সার্জেন্ট। 'কোথাও তাকে দেখলেন, সার?'

মাথা নাড়লেন পুলিশ সুপার। 'একটা সিগারেট হবে?'

'আমার কাছে হবে,' বলে নিজের প্যাকেট খুলে বাড়িয়ে ধরল তারিকি। লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিচ্ছে সে, এই সময় অনেকটা দূর থেকে একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার ভোঁতা শব্দ ভেসে এল।

'কিছু শুনতে পেলেন, মিস্টার খিলজি?' উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মোসাদ এজেন্ট।

মাথাটা একদিকে একটু কাত করে কান পাতলেন পুলিশ সুপার। 'খুবই অস্পষ্ট, সম্ভবত কয়েক মাইল দূরে, মনে হয় না আমাদের কোনও ব্যাপার। চলুন, সার্জেন্ট, এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা।'

লঞ্চের নীচে নেমে গেছে সবাই, ককপিটে শুধু রানা ও শায়লা। খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার পর চার্টে একবার চোখ বুলাল রানা। অনেকটা ঘুরপথ ধরে শেফাইম-এ পৌঁছবে ওরা, তাতে সময়ও লাগবে কিছু বেশি। হয়তো মাঝরাত হয়ে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে শায়লার দিকে তাকাল রানা। মুখটা ম্লান। চোখে প্রশ্ন। রানা বুঝতে পারল কী ভাবছে মেয়েটা।

'এমনিতেও মারা যেতেন দাদু,' বলল ও নরম গলায়।

এক হাতে ওকে জড়িয়ে নিজের দিকে টানল রানা। ওর কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল শায়লা। টপটপ করে লোনা পানি ঝরছে ওর চোখ থেকে। কাঁদছে শায়লা, একই সঙ্গে ভাবছে: আগে

কখনও জানা ছিল না জীবনে এত সুখও আছে।

***